১৩৫৩-র সেরা গল্প

নবেন্দু ঘোষ
সম্পাদিত

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৫
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

ভূমিকা

মানুষের জীবন জটিলতায় পরিপূর্ণ। বাঁচবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে সে সংগ্রাম করছে, নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, রক্তকে জল করছে। প্রাণধারণের জন্য জীবনের এই প্রয়াসের মাঝে মাঝে যে বিরামের মুহূর্ত্তগুলো আছে তখন মানুষ আনন্দ চায়, তার রসপিপাসু মনকে পরিতৃপ্ত করে নূতন উদ্যমের অধিকারী হতে চায়। মানুষের এই রস-পিপাসাই সাহিত্যের উৎস-স্থল এবং গল্প উপন্যাসের রচনা সম্ভব করেছে।

সভ্যতার সূচনা থেকেই প্রতি দেশে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে এবং ক্রমে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস তো সভ্যতারই ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাস। তাই প্রাচীনকালের সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাহিত্যের নানা সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য কম নয়। সভ্যতার বয়স বাড়ছে, মানুষের মনেও তার ছাপ পড়ছে। মানব-সভ্যতার শৈশবে তার মনে যে আদিম বিস্ময়, ভয় ও কৌতূহল ছিল তা আজ নেই। তখন কল্পনা ছিল নভোচারী, রঙ আর স্বপ্নের কুয়াসাই তখন গল্প উপন্যাসে প্রধান ছিল। রাজপুত্র, রাজকন্যা, দৈত্য দানা, রাক্ষস খোক্কস আর রথী-মহারথীদের অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক কাহিনীই তখন জমত ভালো। কিন্তু ক্রমে সভ্যতার রূপান্তর ঘটল। মানুষের জীবনে নানা সমস্যা এল, তার জ্ঞান বাড়ল, আত্মোপলব্ধি বাড়ল, বুদ্ধি ও সাহস বাড়ল। বিজ্ঞানের জন্ম হল। মানুষ নিজের মাঝে অফুরন্ত শক্তির খনিকে আবিষ্কার করল আর মুষ্টিমেয় একদল লোক এই শক্তিকে করায়ত্ত করল। ফলে শক্তি-মদ-মত্ততা, শোষণ, যুদ্ধ ও নির্য্যাতন অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত ও নির্য্যাতিত করল, তাকে আত্ম-সচেতন করে তুলল। মানুষ তখন নিজের মুক্তি চাইল—দুঃখ থেকে, বঞ্চনা থেকে, পরাধীনতা থেকে। কিন্তু একা তো কিছু হয় না। তাই আজ সে জাতির কথা, শ্রেণীর কথা, সমাজের কথা ভাবছে। সে আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছে যে ভালোভাবে বাঁচতে হলে আজ

অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক কাঠামোটাকে ভেঙ্গে গড়তে হবে, সমস্ত রকমের শৃঙ্খলকেই ভেঙ্গে ফেলতে হবে। যে সব স্তর ও পর্য্যায় অতিক্রম করে মানুষ আজ এই মনোভাবের অধিকারী হয়েছে সাহিত্যেও সেই সব স্তর ও পর্য্যায় অনিবার্য্যভাবে দেখা গিয়েছে। যখন জীবনে সংঘাত বা সমস্যা কম ছিল, যখন শুধু স্বপ্ন দেখার মত বিলাসের মুহূর্ত্ত ছিল তখন সাহিত্যের যে রূপ ছিল আজ তা কি করে সম্ভব? আজ সভ্যতার এক সঙ্কটকাল উপস্থিত, আজ মানুষের চারদিকে শুধু নীরন্ধ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে সে আলোক-তীর্থের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু পথ তার এখনো শেষ হয়নি। আজকের দিনের সাহিত্যে তাই স্বপ্ন ও বিলাসের বাহুল্য নেই, আছে জীবনকে সত্যরূপে গ্রহণ ও স্বীকার করার ক্রমবর্দ্ধমান সৎ-সাহস। মানুষ আজ আর শুধু রাজপুত্র রাজকন্যার কাহিনী শুনে খুশী নয়, সে আজ নিজেকে জানতে চায়, তার মত সবাইকে জানতে চায়, জানতে চায় তার অন্তরের অন্তর্লোককে, তার আনন্দ বেদনার, সুখ দুঃখের মূল ও সূক্ষ্ম রূপটিকে।

পৃথিবীর তথা বাংলা সাহিত্যের মোটামুটি এই একই ইতিহাস। যেটুকু পার্থক্য তা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণ সম্ভূত। অন্যান্য দেশের সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের বয়স খুব অল্প,—অথচ তা সত্ত্বেও তার ঐশ্বর্য্য ও পরিণতি কম হয়নি, ইতিমধ্যেই তা পৃথিবীর কাছে স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছে। ভবিষ্যতে তা যে একদিন শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানও দাবী করতে পারে, একথা আমি বিশ্বাস করি।

এই অল্পবয়স্ক বাংলা সাহিত্যে আবার ছোটগল্পই সবচেয়ে অল্পদিনের। যেমন অন্যান্য দেশের সাহিত্যে। মানুষের কাজ বেড়েছে, সময় কমেছে। তার বুদ্ধি তাকে আজ আত্মবিশ্লেষণী করে তুলেছে, যন্ত্র ও শিল্পযুগের নানা সমস্যা তার জীবনকে অজস্র জটিলতায় ভরে তুলেছে। ফলে ছোটগল্পের চাহিদা ও সৃষ্টি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সংক্ষেপে সে নিজের কথা প্রকাশ করতে শিখেছে। জীবনের সব কিছুই উপন্যাসাকারে বলা যায় না, অথচ তাও বলবার মত, শোনবার মত। ছোট্ট একবিন্দু শিশিরেও যেমন সূর্য্য প্রতিফলিত হয় তেমনি একটি ছোট্ট ঘটনার মাঝেও মানব-জীবনের

পরিপূর্ণ রূপটি ঝলসে ওঠে। একটি ছোট্ট সুখ দুঃখের কাহিনীতেই অনন্তকালের মানুষের সারাজীবনের সুখদুঃখকেই যেন অনুভব করা যায়।

সাহিত্যের এই নবীনতম শাখাটি ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করছে। মাসিকে, দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, পাক্ষিকে—অজস্র গল্প প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে কটি যে সার্থক সৃষ্টি তাই বিচার্য্য। কারণ আমার মতে, নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ছোটগল্প রচনা করাই বোধ হয় সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। এতে সংযম চাই, পরিমিতি-বোধ চাই। ছোট্ট একটি বৃত্তের মধ্যে মানুষকে ফুটিয়ে তুলে তার মানস লোকটিকে উদ্‌ঘাটন করে একটি রসোত্তীর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করা বোধ হয় গজদন্তের ওপরকার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের মতই কঠিন ব্যাপার।

যত কঠিনই হোক—বাংলা সাহিত্যে আজ ভালো ছোটগল্প রচিত হচ্ছে এবং রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই তা পৃথিবীর দরবারে পেশ করবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প আজ আরো বিস্তৃত রূপ ধারণ করেছে। বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিক, ভাষা, চরিত্র, পরিবেশ ও ঘটনার বৈচিত্র্য আজ শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্পের তুলনায় কম নয়। বর্ত্তমান কালের তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, বনফুল, মনোজ বসু, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, প্রবোধ সান্যাল, সরোজ রায় চৌধুরী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, সুশীল জানা প্রভৃতি আরো অনেকে এবং নবীনতম ননী ভৌমিক প্রভৃতি যে সব ভালো গল্প লিখেছেন তাদের বিষয়ে আমরা অনায়াসে গর্ব্ব করতে পারি—তাঁদের অনেক গল্পই প্রথম শ্রেণীর মর্য্যাদা লাভ করেছে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি প্রকাশভঙ্গী আছে, বিষয়বস্তু আহরণ করার পদ্ধতি আছে, ভাষা আছে—ফলে বৈচিত্র্যের আমদানী কম হয়নি। সে বৈচিত্র্য আরো বৃদ্ধি পাবে—কারণ আরো নূতন ও শক্তিমান লেখকেরা এসে দলে ভিড়ছেন।

বিশ্বসাহিত্যের যে রূপান্তরের কথা আগে বলেছি, বাংলা সাহিত্যেও সেই রূপান্তর দেখা দিয়েছে। এদেশের সাহিত্যিকেরাও আজ আকাশ ছেড়ে মাটিতে নেমে এসেছেন। জীবন-বোধ আজ তাঁদেরো তীব্র হয়ে

উঠেছে, তাঁরাও আজ দেশ ও সমাজের কথা ভাবছেন। সাহিত্যের উদার রূপটি যেন এতদিনেই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রাজা উজীর আর কোথাও একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারছেন না—সাহিত্যেও না। সাহিত্যিক আজ অনুভব করেছেন যে তিনিও সমাজের একজন, দেশের একজন, জাতির একজন; তিনিও আজ উপলব্ধি করেছেন যে, সুস্থ, সুখী জাতি ও সভ্যতা গড়বার দায়িত্বে তাঁর অংশ কম নয়, তাঁকেও আজ ঘাম ঝরাতে হবে, লড়তে হবে, সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। তাই সাহিত্যে আজ সর্ব্বশ্রেণীর মানুষেরা এসে ভীড় করেছে—দাঁড়িয়েছে তাদের সুখদুঃখ, ব্যথা বেদনা, অভাব ও অভিযোগের কাহিনী নিয়ে। নিজেকে জানবার, সবাইকে জানবার, দেশ ও পৃথিবীকে জানবার শ্রীক্ষেত্র হয়েছে আজকের যুগের সাহিত্য। ১৩৫৩-র সেরা গল্পেও এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান। বৈচিত্র্যময় জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে আহরণ করা হয়েছে নানাশ্রেণীর মানুষ ও তার কাহিনীকে।

দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয়বস্তু আহরণের ব্যাপারে আজকাল একটা মতভেদ দেখা দিয়েছে। রোমান্টিসিজম্ ও রিয়ালিজমের সংঘাত। একদল বলছেন বাস্তবতার নামে প্রোপ্যাগাণ্ডা শুরু হয়েছে, অন্যদল বলছেন যে স্বপ্ন দেখে দেখে মানুষ নিজেকে দুর্ব্বল করছে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি? জীবনে নানা দুর্য্যোগ দেখা দিয়েছে এবং সাহিত্যিক তার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন বলেই হয়ত অনেক সময় তাঁর রচনায় প্রচারের গন্ধ থাকতে পারে। তা থাকুক। তা বোধ হয় একরকম সুস্থতারই লক্ষণ। সাহিত্যিক আজ জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করছেন। এটা বড় সহজ কথা নয়। দুর্য্যোগের রাত কেটে যাক, ব্যক্তিজীবনে, সমাজ-জীবনে শান্তি আসুক, সাহিত্যিক তখন নিশ্চয়ই সংযত হবেন। আর রোমান্টিসিজম্—স্বপ্নবিলাস? সমগ্র জীবনকে যাঁরা স্বীকার করেন তাঁদের তো স্বপ্নকেও অস্বীকার করা উচিত নয়। জীবনে স্বপ্নেরও কি স্থান নেই? যদি মানুষের অগ্রগতির পথে তা বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তবে তাকে স্বীকার করতে দোষ কোথায়? আমি সমালোচক নই, কোনো তর্কবিতর্কের সৃষ্টি করার ইচ্ছেও আমার নেই। আমার

ব্যক্তিগত মত এই যে জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে গেলে রোমান্টিসিজম্‌ ও রিয়ালিজম—দুটিকেই স্থান দিতে হবে। মতভেদটা আসলে বোধ হয় এই দুই মতবাদের পরিমিতির ব্যাপারেই ঘটা উচিত।

এই সঙ্কলনটি যে একেবারে নিখুঁত তা নয়। আমরা সবাইকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি, নবীন ও প্রবীণদের আরো অনেকে হয়ত এর মধ্যে স্থান পেতে পারতেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ অনেকে একেবারেই লেখেননি, অনেকের রচনা অতি-দীর্ঘ হওয়ার দরুণও আমরা স্থান সঙ্কুলান করতে পারিনি। এই গ্রন্থের সব গল্পগুলিই হয়ত সার্থকতার চূড়ান্ত নিদর্শন নয়, তবু নির্ব্বাচন-ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। এর বিপক্ষে যুক্তি থাকলেও এটা নিশ্চিত যে ১৩৫৩ সালের বাংলা ছোট গল্পের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে এই গ্রন্থটি। বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যে, অন্তর্দৃষ্টিতে, বলিষ্ঠ আশাবাদে এর প্রতিটি গল্প সমুজ্জ্বল। জাতি ও সমাজের দৈন্য, দুর্দ্দশা এবং সংগ্রামাত্মক রূপ ফুটছে এর কোনো কোনোটিতে, আবার কোনোটিতে মানব-মনের নিভৃত মহাদেশটিকে উন্মোচন করা হয়েছে। গল্পগুলির দোষ ত্রুটি যাই থাক, তাতে নিরাশ হবার মত কারণ খুঁজে পাইনি আমি। এর মূল্যামূল্য পাঠক-সাধারণই বিচার করবেন। অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতিগুলোর জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি।

১৩৫৩ সাল কেটে গেছে—১৩৫৪ ও শেষ হল। আমরা এর মাঝে স্বাধীনতা পেয়েছি বটে কিন্তু হারিয়েছি অনেক। তবু আজ স্বাধীন দেশের মুক্ত আকাশ আমাদের মাথার ওপরে। পরাধীনতার দুর্দ্দিনেও যে সাহিত্য মাথা নোয়ায়নি—আজ স্বাধীনতার সুযোগ পেয়ে সেই সাহিত্য যে আরো মহৎরূপ ধারণ করবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

২০, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

নবেন্দু ঘোষ

প্রকাশকের নিবেদন

১৩৫৩র সেরা গল্প প্রকাশিত হল। ১৩৫৪র সেরা গল্প যাতে পূজার পূর্বেই ছাপা হয়ে যায়, তার আয়োজন চলছে। সুবিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঐ খণ্ড সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন।

সম্পাদক ও প্রকাশকের একান্ত ইচ্ছা, বর্ষের সবচেয়ে ভাল গল্পগুলি ছাপা হয়। এ বিষয়ে পাঠক-সাধরেণের সহযোগিতা আবশ্যক। কোন ভাল গল্প তাঁদের নজরে পড়লে তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে সম্পাদকের নামে বেঙ্গল পাবলিশার্সের ঠিকানায় পত্রযোগে জানিয়ে দেন। এতে নির্বাচনের পক্ষে সুবিধা হবে।

আর একটি বিষয় জানানো আবশ্যক। গল্প-নির্বাচনে প্রকাশকের হাত নেই, সম্পাদকই সর্বেসর্বা। অতএব ঐ সম্পর্কে প্রকাশককে কোন অনুরোধ করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

'১৩৫১-র সেরা গল্প' এই গ্রন্থখানার প্রথম বই। সেই থেকে প্রত্যেক বৎসর এক এক খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। একত্র রাখার সুবিধা হবে বলে প্রত্যেক খণ্ডের আয়তন মোটামুটি এক রকমের হচ্ছে।

বিনীত

প্রকাশক

সূচীপত্র

সারেঙ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মা নাসিমকে মেরেছে। মা মেরেছিল মারুক, কিন্তু ও মারবে কেন? ও কে?

গরু-বাছুর রাখি না রাখি, চাষ-রোপণ করি না করি, তাতে ওর কী? জমি খিল যায় তো যাবে, তাতে ওর কী মাথা-ব্যথা! ঘরের খড় বদলানো দরকার কি না-দরকার তা আমরা দেখব। ভিজতে হলে ভিজব আমরা মায়-পোয়ে। ওকে ছাতি মেলতে ডাকবে না কেউ।

না, গোলবানু বলে, এবার থেকে তত্ত্বপালন করবে গহরালি।

কে গহরালি? নাসিম ঘাড় ঝাড়া দিয়ে তেড়ে ওঠে।

মস্ত লোক। জমি আছে পাঁচ কানি। কাচারি আছে দরজায়। দায়েরী মোকদ্দমা আছে ক নম্বর।

তাতে আমাদের কী?

ওকে ধরলে জমি-জায়গা ঠিক থাকবে, খাওন-পিরনের কষ্ট থাকবে না, খড়-কুটার বদলে ঢেউ-টিনের ঘর উঠবে এক দিন।

চাই না। আমাদের এই ভাঙা ঘরই ভালো। আমরা শাক-লতা খেয়ে থাকব। তুই ওকে তাড়িয়ে দে।

শক্ত মার দিলে গহরালি। সঙ্গে সঙ্গে গোলবানুও হাত মেলাল।

বাপজান বেঁচে থাকলে এমন কেউ মারতে পারত না তাকে। মাঠে যাবার জন্যে তাকে ঠেলাঠেলি করত না। সে জাল নিয়ে বিলে-বাওড়ে বেরিয়ে পড়ত মাছ ধরতে। বাপজান বলত, হাটে তোকে কাটা-কাপড়ের দোকান করে দেব একখানা। তার চেয়ে আমাকে একটা নৌকা কিনে

দাও। বরাত নাসিম। মাটির চেয়ে দরিয়ার পানি আমার বেশি ভাল লাগে।

বাজানের নৌকো কিনে দেবার সাধ্য ছিল না। নাসিম এখনো এত বড় হয়নি যে কেরায়া নৌকো বেয়ে খেটে যাবে। তার জাল কবে ছিঁড়ে গেছে। তবু জালের টান সে ভুলতে পারে না। নদীর ধারে চুপটি করে বসে থাকে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

সে শুনেছে, মা নিকা বসবে গহরালির কাছে। এক ঘরের মানুষ হয়ে থাকবে তারা। নাসিমের আর জায়গা কোথায়? হাতনেয়, পাছ-দুয়ারে। লোকে যখন মাকে জিগ্‌গেস করবে, এ কে, তখন মা বলবে, আমার আগের পুরুষের সন্তান। কার ভাতে আছিস? যখন কেউ জিগগেস করবে নাসিমকে, সে বলবে, গহরালির ভাতে। বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে নাসিমের।

মাইল-খানেক দূরে ব্র্যাঞ্চ লাইনের ইষ্টিমার থামে। পাট-ক্ষেতের পাশে। জেটি বা ফ্লাট নেই, বাদাম গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কাছি জড়িয়ে ইষ্টিমার পার ঘেঁসে দাঁড়ায়, আশ্চর্য রকম গা বাঁচিয়ে। সটান পারের উপরেই সিঁড়ি পড়ে দু'খানা। সিঁড়ির এ-ধার থেকে ও-ধারে বাঁশের লগি ধরে দাঁড়ায় দুজন খালাসী। নামা-ওঠা করে যাত্রীরা। বাদাম গাছের তলায় বসে ছোট একটি টিনের বাক্সতে করে টিকিট বেচে ঘাট সরকার। যারা নামে তাদের থেকে টিকিট কুড়োয়, ফাঁকি দিয়ে যে আসতে পেরেছে তার সঙ্গে এক ফাঁকে কথাটা সেরে রাখে। তারপর উঠে আসে ইষ্টিমারে, হিসাব-কিতাব করতে, জাহাজের বাবুর সঙ্গে। ঘাট-সরকার নেমে না যাওয়া পর্যন্ত সিঁড়ি তোলে না। একখানা তুললেও আরেকখানা রেখে দেয়। লগি লাগে না ঘাট-সরকারের।

ডোবা দেশ, প্রায় সময়েই জল থাকে দাঁড়িয়ে। গাছের গোড়াটাই যা একটু ট্যাকা-মতন। যাত্রীরা জল ভেঙে গিয়ে গাঁয়ের রাস্তা ধরে। হাতে-ঠেলা ডোঙা আছে একখানা। মালামাল থাকলে তার শরণ নেয়। বাচ্ছা-কাচ্ছারা কাঁধে-কাঁখে করে পার হয়। ছুটুলে বউ হলে পাঁজা-কোলে করে।

'সিড়ি তোল্।' দোতলার থেকে সারেঙ হুকুম দেয়।

ঘাট-সরকার এখনো নামেনি বুঝি? না, এই নেমে গেল আঁকা-বাঁকা পায়ে। তুলে নিল শেষ সিঁড়িটা। হড়-হড়-হড়-হড় করে মোটা শিকলে বাঁধা নোঙর উঠে আসতে লাগল।

একটা লোক তাড়াতাড়িতে নামতে পারেনি বুঝি। লোক কোথায়? দশ-বারো বছরের ছেলে একটা। প্যাসেঞ্জার না কি? কে জানে? জাহাজ দেখতে উঠে এসেছিল হয়তো দুষ্টুমি করে। তবে নেমে যেতে বল পরের ঘাটে, পাতাকাটায়। শেষবেলার ভাটিতে তরতরিয়ে বেয়ে যেতে পারবে একমাল্লার নৌকোয়। আন্ধার হয়ে যাবে, তড়ে যাবে কি করে? আহা, বাপ-মা কত ভাববে না-জানি।

ছোট ইষ্টিমার, উপরের ঢালা ডেকে শুধু থার্ড ক্লাশ। সামনের দিকে ফার্ষ্ট ক্লাশের দুটো পায়রার খোপ, আর তারই সামনের খোলা কোণাচে জায়গাটুকুতে সারেঙের হুইল। নাসিম একেবারে সেখানে এসে হাজির হল।

প্রথমটা কেউ দেখেও দেখেনি। ভেবেছে কলের কায়দা দেখবার জন্যে এমনি উঠে এসেছে বুঝি। কিন্তু, না, নড়ে না ছেলেটা।

'কি চাই?' চটি পায়ে, কিস্তি টুপি মাথায়, সারেঙ হুঁকো ফুঁকছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে জিগ্‌গেস করলে।

'হুজুরের যদি চাকরের দরকার থাকে আমাকে রাখতে পারেন।'

'তোর দেশ কই?' শারেঙ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নাসিমের মুখের দিকে।

'এইখানেই হুজুর, কনকদিয়া।'

'মা বাপ আছে?'

'কেউ নাই।'

আবার কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল সারেঙ। বললে, 'কাজ করতে পারবি তুই?'

'কি-কি কাজ হুজুর?'

'রাঁধা-বাড়া, ধোয়া-মোছা, কাপড়-কাচা, বাসনমাজা—এই সব আর কি। পারবি? বেশ, লেগে যা তা হলে। মুফৎ একটা ছোকরা যদি

পাওয়া যায় তো মন্দ কি।' ছইলের লোক ইয়াদালির সঙ্গে একবার চোখ-তাকাতাকি করে: 'অন্ততঃ হুঁকোটা তো সাজতে পারবে, গা-হাত-পা টিপে দিতে পারবে তো দরকার হলে।'

ইয়াদালি বললে, 'মাইনে পাবে না কিছু ?'

'মাইনে না হাতি!' সারেঙ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠল: 'সোতের শ্যাওলা দিয়ে তরকারি রান্না করে খেতে হবে! বয়ে গেছে আমার! অমনি থাকতে চায় তো থাকবে, নইলে নামিয়ে দেব জোর করে! কি, টিকিট আছে ?'

'না, হুজুর, মাইনে চাই না আমি।'

জাহাজে যে জায়গা পেয়েছে এই নাসিমের বেশি। বাপ নয়, চাচা নয়, মুনিব নয়, মালেক নয়, উটকো বাজে লোকের যে মার খেতে হবে না মুখ বুজে, এই তার অনেক। অজানার টানে যে ভাসতে পেরেছে অকূলে এই তার মহা সুখ।

'ভালো করে কাজ-কর্ম্ম করতে পারলে জাহাজেই বহাল করব এক সময়। প্রথমেই সিঁড়ি, পরে পাটাতন, ক্রমে-ক্রমে শুখানি, শেষে একেবারে সারেঙ। কে বলতে পারে ? আগে বিনি-মাইনের চাকর, শেষকালে এই জাহাজের জমিদার।' সারেঙ তার শাদা শীর্ণ দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল।

কিন্তু প্রথম দিনই রাত্রে নাসিম মার খেল সারেঙের হাতে। বেখেয়ালে ভেঙে ফেলেছিল একখানা কাচের বাসন। আর যায় কোথা! বলা-কওয়া নেই, মুখে-মাথায় ঘাড়ে-পিঠে পড়তে লাগল চাঁটির পর চাঁটি। ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল নাসিম। বেশি গোলমাল করবে তো হাত-পা বেঁধে ফেলে দেবে কালো জলে।

ব্যথার চেয়ে আশ্চর্য লাগল বেশি নাসিমের। কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে। এই এখানকার রেওয়াজ। সবাইকেই মার খেতে হয় সারেঙের হাতে। যারা সিঁড়ি দেয়, যারা পাটাতন ধোয়, যারা আছে লস্করের কাজে, দড়িকাছির কাজে, যারা বা লাইট ঘোরায়, তাদের কাজের কুএতটু গলতি বা গাফিলতি হলেই শুরু হয় মারধোর। নিচে মেস্তুরির

এলাকা। তাকে ঘিরে কাজ করে কয়লাওয়ালা, আগুনওয়ালা, ইঞ্জিন-ওয়ালা। কিন্তু চরম শাসনের ভার সারেঙের হেপাজতে। ভুল করেছে কেউ, এক কল ঘোরাতে আরেক কল ঘুরিয়ে দিয়েছে, এক ডাণ্ডা টানতে আরেক ডাণ্ডা টেনেছে, তা হলে আর রক্ষে নেই। লাথি-চড়, জাত-বেজাতের গালাগালি, জুতাপিটি পর্যন্ত! তাতেও না শানায় চাকরি থেকে বরখাস্ত।

কেনই বা হবে না শুনি? কোম্পানি শুধু সারেঙকে চেনে, সারেঙকে বোঝে। জাহাজের জেলামেজিস্ট্রেট সে। সমস্ত দায়িত্ব তার। চলতি-পথে ইষ্টিমার যদি নৌকো ডুবিয়ে ফেলে, খেসারৎ দিতে হবে সারেঙ সাহেবকে। দুর্যোগে পড়ে খোদ ইষ্টিমার যদি ডুবে যায়, দায়ী কে? কোম্পানির সাহেবরা নয়। যত কিছু মালি-মোকদ্দমা চলতিপথের ইষ্টিমার নিয়ে, সমস্ত ফলাফল সারেঙ সাহেবের। আর যদি ঝড়-তুফান থেকে ইষ্টিমার পাড়ে ভিড়ানো যায় তার পুরস্কারও এই সারেঙ সাহেবের প্রাপ্য। মেস্তরি-খালাসীরা যতই হাঁক-ডাক দৌড়-ঝাঁপ করুক, যতই কায়দা-কেরামতি দেখাক, টাকার তোড়ার এক-আধটু ছিটেফোঁটাও কারু বরাতে জুটবে না। যত মেডেল সব সারেঙ সাহেবের গলায় ঝোলানো।

'কী হল হঠাৎ?'

ইষ্টিমার চরে ঠেকেছে। চোরা চর, কুয়াশায় ঠাহর হয়নি। চাকা বসে গেছে মাটির মধ্যে, শিগ্গির যে ছাড়ান পাবে এমন মনে হয় না। খবর পাঠাতে হবে বন্দরের ডকে, জালি-বোটে করে লোক পাঠাতে হবে কাছের যে ইষ্টিশানে টরে-টক্কা আছে। সেও এমন কিছু ধারাধারি নয়। বেশির ভাগ ইষ্টিশানই তো গাছতলা বা ক্ষেত-খোলা। কমসে-কম সাত-আট ঘণ্টা লেট আজ নিঘ্ঘাত। মধ্যিখানে যত ঘাটে যাত্রীরা ইষ্টিমারের আশায় বসে আছে তারা সমস্ত রাত আজ দূরে ধোঁয়া দেখবে আর হুইসল শুনবে।

দোষ কার?

দোষ শুখানির, দোষ সেকেণ্ড মেটের। লম্বাচওড়া জোয়ান মরদ সব, এখন আর মারতে আরাম লাগে না, নিজেরই হাতে-পায়ে চোট লাগে। কিন্তু যাবে কোথায়? এই মাসের পুরো মাইনে বরবাদ হয়ে যাবে এদের। খোরাক কিনতে হবে নিজের পয়সায়।

সারেঙ যেন এই জাহাজের ইজারাদার। মোকররি ইজারা। যত খরচ সরঞ্জাম বাবদ, মেরামত বাবদ, খালাসী-মেস্তরী মাইনে বাবদ—হিসেব করে একটা মোটা টাকা সারেঙের হাতে ধরে দেয় কোম্পানি। সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা করার মালিক এই সারেঙ। যাকে খুশি পুরো মাইনে দেয়, যাকে খুশি জরিমানা করে। যাকে খুশি খোরাক কাটে, যাকে খুশি জবাব দেয়। এর বিরুদ্ধে নালিশ নেই, সালিশ ফয়সালা নেই। ভিতরের শাসন নিয়ে কোম্পানি মাথা ঘামায় না, সে দেখে, ঘাট থেকে ঘাটে মালে-মানুষে বোঝাই হয়ে ইষ্টিমার মোটা মুনাফার মাশুল আনতে পারে কি না।

সমস্ত ইষ্টিমার তাই সারেঙের কথায় ওঠে-বসে। সব কর্ম্মচারী তার তাঁবেদার। ইষ্টিমার তো নয়, যেন সে লাটদারি পেয়েছে।

'কেঁদে কিছু লাভ হবে না।' পাশ থেকে বললে মকবুল। 'এমনি অনেক মার খেতে হবে। মার খেতে খেতে তবে প্রমোশন।'

মকবুলও প্রথম ঢোকে চাকর হয়ে। পাকের কাজে নয়, সারেঙের ধোপা-মুচির কাজে। তিন বছর পর সে সিঁড়ি পেয়েছে। সিঁড়ির পরে পাবে পাটাতন, তার পরেই দড়ি-কাছি। মার না খেলে উন্নতি নেই জাহাজে।

'সাহেবের সুদৃষ্টি না হলে কিছুই হবার নেই। দশ-বারো বছর পর সাহেবের যদি দয়া হয়, সার্টিফিকেট দেবে। পরে সেই সার্টিফিকেটের জোরে দেয়া যাবে সারেঙগিরি পরীক্ষা।' মুরব্বির মত বলে থার্ড মেট, আকসারউদ্দিন। 'সেই সার্টিফিকেট না হলে সবই ফক্কা। তাই ভারী হাতে সারেঙের পায়ে তেল মাখা চাই। তারপর পাশ করে একবার সারেঙ হয়ে নিতে পারলে পায় কে। তখন জমিদার তবিলদার সব একজন।'

'না হে না, এর মধ্যে একটু কথা আছে। যারা চাটগাঁর লোক তাদের দিকেই সাহেবের একটু টান বেশি।' গলা খাটো করে বলে বিলায়েত আলি, বয়লারের খালাসী। 'নিজের বাড়ি চাটগাঁ কি না। বলে চাটগাঁ ছাড়া সারেঙ কোথায়? কথায় আছে, সারেঙ শুঁটকি দরগা, এ তিন নিয়ে চাটগাঁ। ধান ডাকাত খাল, এ তিন নিয়ে বরিশাল। সারেঙি করা তো ডাকাতি করা নয়।'

'তোর বাড়ি কোথায় রে ছ্যামরা?' সবাই জিগ্‌গেস করে একসঙ্গে।

'এ দেশে।' হতাশ মুখে বলে নাসিম। আর সবাইরও মুখ যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

পরদিন বেদম মার খেল আবতুল। জল মাপতে গিয়ে একটা লোহার কাঠি হারিয়ে ফেলেছে।

মারের সময় কেউ ধরতে আসে না, ছাড়াতে আসে না। এ একেবারে গা-সওয়া, নিত্যিকার ব্যাপার। তবু চোখ ছাপিয়ে কান্নার কমতি নেই। নদীর জলে চোখ মুছতে মুছতে আবতুল বলে, 'মাইনের থেকে দাম আর তার সুদ তো কেটে নেবেই, তবু মেরে খামাখা জখম করবে?'

তবু প্রতিবাদ নেই, বিদ্রোহ নেই। নিজের সমর্থনে তুটো কথাও বলা যাবে না। মার ঠেকাবার জন্যে শক্ত করা যাবে না শরীরের হাড়-মাস।

নাসিম ভাবে এরা সবাই বুঝি তার মত নিরাশ্রয় মা-বাপ-মরা।

তা কেন? সবাই সিঁড়ি থেকে সুরু করে উঠতে চায় জাহাজের 'ফানিলে'। সবাই সারেঙের সার্টিফিকেট চায়। মার দিতে না দিলে ঐ হাতে সে কলম ধরবে কেন?

তাই সেদিন যখন মকবুলের সঙ্গে জল-তোলা নিয়ে ইয়ার্কি মারতে গিয়ে একটা বালতি নাসিম নদীতে ফেলে দিল তখন মার খেতে তার আর লজ্জা বোধ হল না। অপমানের জ্বালা পর্যন্ত লাগল না তার মনে। মকবুলের সঙ্গে, সমস্ত খালাসীর সঙ্গে সে দোস্তালি অনুভব করলে।

'তোর কি! মাইনে নেই, শুধু মারের উপর দিয়েই গেল।' মকবুল কান্নার মধ্যে থেকে বললে, 'আর আমার পুরো মাইনেটাই বালতির অন্দরে কেটে নেবে। পরে মাস-কাবারে বলবে, আমার থেকে আগাম নে। টাকায় তু আনা করে সুদ দিবি। জাহাজে বসেই মহাজনি করে। কেউ আমাদের দেখবার-শোনবার নেই।' বলে উপরের দিকে তাকায়। যেন উপরআলা শুনছেন এই আর্তের ফরিয়াদ।

'অন্য জাহাজে চলে যেতে পারিস্ না?'

'তুই আছিস কোন তালে? এক জাহাজ থেকে ছাড়ান নিলে আর কোনো জাহাজে ঠাঁই নেই। সারেঙদের মধ্যে সাঁট আছে। তাই তো মার খেয়েও মুখ বুজে থাকি যেন বরখাস্ত না করে। একবার বরখাস্ত করলেই বরবাদ হয়ে গেলাম। পানি ছেড়ে তখন গিয়ে হাল ধরতে হবে।'

'আর কোন জাহাজেই বা তুই যাবি?' পাশ থেকে ইয়াদালি ফোড়ন দেয়: 'সব জাহাজেই এই রেওয়াজ।'

'এমনি পালিয়ে যাওয়া যায় না?'

সবাই হেসে ওঠে। সিঁড়ি থেকে 'ফানিলে' ওঠবার সাধনায় যারা জাহাজে ঢুকেছে, তাদের কাছে এটা নেহাৎ আজগুবি শোনায়।

'আর পালিয়ে যাওয়া সোজা নয়।' গম্ভীর মুখে বলে সেকেণ্ড মেট। 'তোর নাম-ঠিকানা সাহেবের নোটবুকে টোকা আছে। পালাবি আর পুলিশে এজাহার যাবে। বলবে আমার জেবের থেকে মণিব্যাগ নিয়েছে, ঘড়ি নিয়েছে। কোম্পানি লড়বে সারেঙের হয়ে। ছিলি জাহাজে, যাবি জেলে।'

তবে এমনি করে দিন যাবে নাসিমের? এই একঘেয়ে জলের শব্দ শুনে শুনে? মাইনে নেই, খিত-ভিত নেই, এমনি করেই ভাসবে সে দিন-রাত?

'সাহেবকে খুশি করতে চেষ্টা কর, তা ছাড়া আর পথ নেই। ছাখ্‌, একবার সিঁড়ি ধরতে পারিস কি না।'

আর কী করে সে খুশি করবে! যা কাজ তার উপরে সে সাহেবের গা-হাত-পা টেপে, গোসলের আগে তেল মেখে দেয়, চুলে বিলি কাটে। পাকের সময় শুখানি সাহায্য করতে আসে বলেই তার হাড়-মাস এখনো আলাদা হয়নি। তবু মন নেই, মাইনে নেই। বরং জরিমানা বাবদ কিছু তার কাটতে পারে না বলে সাহেবের বড় আপশোষ। তাই মাঝে-মাঝে তাকে উপোস করিয়ে রাখে। সে—সে-বেলার লঙ্কা-পেঁয়াজের খরচ বাঁচায়।

চাল মুণ লঙ্কা আর পেঁয়াজ সারেঙ জোগান দেয়। আর সব যার-

যার মর্জি-মাফিক। তেল আর মশলা মাছ আর তরকারি। মাসান্তে মাইনের টাকার থেকে যার-যার চাল নুণ পেঁয়াজ-মরিচের খরচ কেটে রাখে সারেঙ। তাও তার মর্জি-মাফিক।

'যদি মন চাস সারেঙের, চুরি কর।' কে যেন বলে ফিস্‌ফিসিয়ে।

এই ইষ্টিমারের সঙ্গে মাঝে-মাঝে বার্জ বাঁধা থাকে। তাতে বস্তা-বোঝাই চাল যায়, নুণ যায়, লঙ্কা যায়। বার্জের সঙ্গে লোক থাকে। তার সঙ্গে কী বন্দোবস্ত সারেঙ-মেস্তরির, ষ্টোর-রুমে চলে আসে চাল আর লবণ, মরিচ আর পেঁয়াজের ছালা। সেই চোরাই মালের উপর আবার মুনাফা মারে।

না, আর ভাল লাগে না। কোনো আশা নেই নাসিমের। এক দিন অন্তর এক দিন একই রাস্তা দিয়ে ইষ্টিমার ঘোরাফেরা করে। যেখানে আসার সময় সন্ধ্যে বেলা সেখানে আসতে কখনো মাঝ-রাত, কখনো বা পরদিন ভোর, শুধু এইটুকুই যা বৈচিত্র্য! নইলে একঘেয়ে জলের শব্দ, যাত্রীর ভিড়, নোঙর ওঠা-নামার হড়-হড়, সিঁড়ি ও কাছি ফেলবার সময় সেই ডাক-চীৎকার। ভাল লাগে না আর। ক'দিন পর-পর ঘুরে-ঘুরে ইষ্টিমার কনকদিয়ায় ফিরে আসে। নদী এত ছোট, তার স্রোত এত দুর্ব্বল, ভাবতে পারত না নাসিম। আগে-আগে মনে হত নদী না-জানি চলে গেছে কোন সমুদ্দুরে। এই দেশ থেকে কোন দূর-বিদূরের বিদেশে।

নিরালায় অন্ধকারে নদীর দিকে চেয়ে কখনও একলাটি এসে বসে নাসিম। ঘন কালো জলে জুনিরাত ঝিলমিল করছে। আজ কনকদিয়া এসেছে মাঝ-রাতে। বাড়ি-ঘরের কথা মনে পড়ে নাসিমের। ভাবে, কোথায় তার বাড়ি-ঘর! তার বাড়ি-ঘর নেই, সেখানে ভূতের আস্তানা। মনে পড়ে মার কথা। মার মুখ। মনে করে, তার মা নেই। তার মা কবে মরে গেছে। মার মরা-মুখের মতই মনে হয় এই কালো জলের জ্যোৎস্না।

বড় চুরি না করতে পারে, ছোট ছিঁচকে চুরি কেন করতে পারবে না? দা হাতে করে ডাব বেচতে এসেছে গাঁ-গেরামের লোক সারেঙ

সাহেবের জন্যে কিনলে দুটো দশ পয়সায়। জাহাজে উঠে এসে, সিঁড়ি যখন তুলে নিয়েছে, নাসিম সারেঙের কাছ থেকে একটা একানি নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ডাঙার উপর। আর ছ' পয়সা! নাসিম জিভ উলটিয়ে মুখ ভেঙচাল। বেচনদার ছোঁড়াটা নদী থেকে কাদা তুলে ছুঁড়ে মারল নাসিমের দিকে। জাহাজ তখন সরে এসেছে, লাগল না ছিটে-ফোঁটাও। সারেঙ আর নাসিম দু'জনে একসঙ্গে হাসতে লাগল।

এমনি মাছ এসেছে বেচতে। বাঁশপাতা আর গাং-খয়রা; নাও কিছু ছল-চাতুরী করে। দুধ এসেছে হাঁড়িতে, বাঁশের চোঙায় মেপে দেবে। দাম দেব' জাহাজে উঠে। ক্ষেতের টাটকা শশা-খিরাই এনেছে ঝুড়িতে করে। ঘুসো চিংড়ি দিয়ে তরকারি হবে, না হয়, অমনি কাঁচা খাব। তোমার দাম মারা যাবে না। আমি সারেঙ সাহেবের চাকর।

এত দিনে একটা নিমা পেয়েছে নাসিম। একখানা পানি-গামছা। লুঙ্গি একখানা পাবে কবে?

চারটে পয়সা চাইল নাসিম।

এমন স্পর্ধার কথা সারেঙ তার জীবনে শোনেনি। চোখ কপালে তুলে সারেঙ বলল, 'কী বললি? পয়সা?'

কী ভীষণ হারামি কথা না জানি বলে ফেলেছে এমনি ভয়-তরাসে চোখে তাকাল নাসিম।

'কী করবি পয়সা দিয়ে?'

'চা খাব এক খুরি।'

অমনি বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় পড়ল তার গালের উপর। ঘুরে ছিটকে পড়ল নাসিম। সারেঙ গর্জে উঠল: 'এমম বেতরিবৎ। আমার কাছে কি না বিড়ি চায়! বিড়ি কিনবে! চা কিনবে! কোন দিন শুনব বোতল কিনবে! তেরিবেরি করবি তো নদীর গহিনে নিখোঁজ করে দেব।'

চোখের জলে আবার মার কথা মনে পড়ে নাসিমের। মরে গেলে মার মুখ কেমন দেখাবে তাই সে অন্ধকারে জলের দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। মার মরা-মুখের কথা ভেবে মনে সে জোর পায়। জোর

পায় এই মার সহ্য করতে। মাগো বলেও যদি সে কাঁদতে না পারে, তবে নিঃশব্দে হজম না করে উপায় কি।

তবু এই অত্যাচারিতের দল একত্র হয় না। খোদা উপরআলা ছাড়া আর কারু কাছে তাদের নালিশ নেই। মুক্তিও নেই এই জাহাজের খোল থেকে। কবে কে সিঁড়ি পাবে, কবে কে পাটাতন, দড়িকাছি, নোঙর-লাইট বা মেস্তরির ইলাকা—তারি আশায় সবাই দিন গোণে। কে কী ভাবে সারেঙের খাতির কাড়তে পারবে। সুদ দিয়ে, ঘুষ দিয়ে, চুরি করে, মার খেয়ে। চমৎকার গভর্ণমেণ্ট চালাচ্ছে সারেঙ সাহেব।

সেই রাত্রেই এক প্যাসেঞ্জারের এক জোড়া জুতো সরাল নাসিম। সারেঙ তা সটান নদীর মধ্যে ফেলে দিলে। বললে, 'বুদ্ধিকে তোর বলিহারি। আমি জুতো মসমসিয়ে বেড়াই আর আমাকে পুলিশে ধরুক।' পরদিন নাসিম জোগাড় করলে একটা টিনের স্যুটকেস। সেটাও গেল নদীর গহ্বরে। সেটার মধ্যে মোকদ্দমার নথি, পরচা-দাখিলা, ক' কেতা বেজাবেদা নকল।

কিছুতেই মনের মত হতে পারছে না নাসিম। পারবি, পারবি, আস্তে-আস্তে পারবি। সারেঙের চাউনিটা তাই যেন তাকে বলে কানে-কানে। তার অক্ষমতার জন্যে সারেঙ রাগ করলেও তাকে যে সরাসরি মারে না তাতেই নাসিম উৎসাহ খোঁজে।

কোম্পানির আলোতে তেজ নেই, বৃষ্টি নামলে তেরপল নেই, মেয়ে-পুরুষের আলাদা কামরা নেই, তবু সবাইর চোখে ঘুম আছে। এমন ভদ্র যাত্রী নেই যে তাস খেলে বা গান বা খোস-গল্প করে। চাষা-ভুষোর লাইন। বন্যার তোড়ের মত যারা খাটে, আর তাল-তাল মাংসপিণ্ড হয়ে যারা ঘুমোয়।

ঘুমের আগোছালে ট্যাঁক থেকে কার বেরিয়ে এসেছে টাকার পুঁটলি। নাসিম তা হাত-সাফাই করে তুলে নেয় আলগোছে। একবার ভাবে গুণে দেখে কত আছে। ভাবে পালিয়ে যাই পরের ইষ্টিশানে। কিন্তু কে জানে, কী অদম্য আকর্ষণে সারেঙের কাছেই নিয়ে আসে। প্রায়

মন্ত্রমুগ্ধের মত। বাঘের মুখে গরুর মত। যে শুধু মারে, যে হাসিমুখে কথা কয় না, ন্যায্য অধিকারের কাণাকড়িও দেয় না হাতে ধরে, তাকেই খুশি করতে আগ্রহ হয়। যে অনবরত চুকলি শোনে, একের থেকে অন্যকে আলাদা করে রাখে তারই মন পাবার জন্যে কাড়াকাড়ির ধূম পড়ে যায়। কে কাকে হটিয়ে দেবে, চলে তার টেক্কাটেক্কি।

'মোটে সাত টাকা সাড়ে ন' আনা।' বলে মকবুল: 'এতে কী হবে! তুকুড়ি সাত না হওয়া পর্যন্ত খেলা থাকে না, বলে আমাদের সারেঙ সাহেব।'

তবু কাপড়-চোপড়ের চেয়ে নগদ টাকা ভাল। সবচেয়ে ভাল, যদি হয় কিছু জেওর, সোনা-রূপা। দাম কত আজকাল! কাগজের টাকা তার কাছে রদ্দি, ওঁচা।

একখানা নতুন লুঙ্গি হয়েছে এত দিনে। এবার একটা হাফ-সার্ট।

কিন্তু গয়না কোথায় চাষার বউ ঝিয়ারীদের? বড়-জোর নাকে আংটি-চুংটি, হাতে কাচের ঝুরো চুড়ি। সোনাদানা নেই কোথাও।

না, আছে। নতুন বউ যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। গলায় সোনার হাসনা, হাতে বটফুল। পায়ে রূপোর খাড়ু আঙুলে গুজরী। ফলসা রঙের শাড়ি পরে ঘোমটা টেনে ঘুমিয়ে আছে এক পাশে। বরযাত্রীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিক্-ওদিক্। কে কোথায় চেনবার উপায় নেই। নিফাঁক ভিড় আজ জাহাজে। তবু এরি মধ্যে ফাঁক খুজছে নাসিম।

নতুন বউর গলার কাছে নাসিম হাত রাখল, নরম তার গলার কাছটা। আঙুল কাঁপল না নাসিমের। একটানে ছিঁড়ে ফেলল হাসনা।

'চোর! চোর!' ভিড় ঠেলে ক'পা এগুতে না এগুতেই নাসিমকে ধরে ফেলল যাত্রীরা। তারপর সবাই তাকে মার লাগাল। প্রচণ্ড মার! যে এসে জিগগেস করছে কী হয়েছে সেও পরক্ষণে মার লাগাচ্ছে। বামাল সরাতে পারেনি চোর, বউর বিছানার গোড়াতেই ফেলে এসেছে। তাতে কি? মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছে তো। হার তো ছিনিয়ে নিয়েছিল গলা থেকে। মার, মার, চাঁদা তুলে মার!

'বাবাগো—' নাসিম চীৎকার করে উঠল।

আচকান গায়ে, কিস্তি টুপি মাথায়, চটি পায়ে সারেঙ এসে হাজির। বলে, 'কী হয়েছে? কে মারছে আমার ছেলেকে?' ছেলে! সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সারেঙ সাহেবের ছেলে। কে বললে, 'ও আপনার চাকর ছিল তো জানতাম।'

'চাকর! মিথ্যে কথা। ও আমার বিয়ার ঘরের ছেলে। আমার মা-হারা সন্তান। ওকে মারে কে?'

'ও গয়না চুরি করেছে নতুন দুলহিনের। গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে হাসনা।'

'মিথ্যে কথা। হতেই পারে না। চল, আমি নিজে পুছ করিগে বিবিকে।'

সারেঙ এগিয়ে এল নতুন বউর নজদিগে। বললে, 'আপনার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছে কেউ?'

পরদার বিবি ঢাকা-মুখে গলা খাটো করে বললে, 'না! ঘুমের বেহোঁসে গলা থেকে খসে পড়েছে বিছানায়!'

লতাপড়ি ইষ্টিশান দেখা যায় কাছাকাছি; বরের পার্টি নামবে এইখানে। জাহাজ ঢিমে হয়ে এল। নোঙর নামতে লাগল হড়হড় করে।

কাছির বাঁধ পড়ল গাছের সঙ্গে।

'সিঁড়ি দে। সিঁড়ি দে।' উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল সারেঙ: 'নাসিম কই? নাসিমকে ডাক। সে আজ থেকে সিঁড়ি ধরবে।'

খালাসীদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে গেল। নাসিমের দীক্ষা হল এতদিনে, এত অল্প দিনে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েই কপাল ফিরল তার। আর যারা ধরা পড়েনি তারা এখনো নাকানিচুবুনি খাচ্ছে। সিঁড়ি থেকে পাটাতনে প্রমোশন পাচ্ছে না। আর এ আজ সিঁড়ি, কাল পাটাতনে, পরশু শুকানি, পরে একেবারে সারেঙ কাপ্তেন, জাহাজ-নাখোদা।

'ধর, ধর, ও ছেলেমানুষ ও একা কেন পারবে? তোরা সবাই মিলে ওকে সাহায্য কর।' উপর থেকে জোরালো গলায় হুকুম হাঁকে সারেঙ।

সার্চ-লাইটের আলোয় নাসিমের জলে-ভরা চোখ দুটি চকচক করে ওঠে।

নতুন বউ নেমে যাবে লতাবাড়ি। পায়ে গুজরি বাজিয়ে আসছে।

আলো পড়েছে অনেক দূর। গাছ-গাছালির মাথায়। সিঁড়ি দিয়ে লগি ধরেছে নাসিম। তুলহিনকে বলছে, 'টলে পড়ে যাবেন। লগি ধরুন।'

'না', লগি না ধরেই টলতে লাগল নতুন বউ।

পিছন থেকে কে ধাক্কা মারল নাসিমকে। চমকে চেয়ে দেখে, সেই লোকটা, ভিড়ের মধ্যে সবচেয়ে যে তাকে বেশি মেরেছে। আলোতে চিনল তাকে এতক্ষণে। গহরালি।

আলো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে গোলবানু। ঘন করে ঘোমটা টেনে দিয়েছে। গায়ের চাদরটা বোরখার মত করে চাপিয়ে দিয়েছে গায়ের উপর। ঘাটে অনেক বিরানা পুরুষের আনাগোনা।

ধরাধরি করে সিঁড়ি তুলতে লাগল নাসিম, একের পর আরেক চিলতে। পায়ের কাছেকার ঘোলাটে জলের ছায়ায় দেখতে লাগল তার মায়ের মরা-মুখ। আর উপরে দাঁড়িয়ে সারেঙ তাকে দরাজ গলায় বাহবা দিচ্ছে। উড়ছে তার শাদা আচকান, শাদা দাড়ি। দিনরাত্র করে যে স্বপ্ন যেন তার মত চেহারা।

কামধেনু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

—ওহি যে আঁতঠো,—উঠো গরুকা হ্যায়, না? ফাঁসীর আসামী নাথু প্রশ্ন করলে ওয়ার্ডারকে। বাঙালী পটুয়ার ছেলে নাথুর হিন্দী এর চেয়ে আর কত ভাল হবে?

—কেয়া? বিস্ময়ে এবং তীব্র বিরক্তিতে দোবেজী ওয়ার্ডারের মুখের ভাব অদ্ভুত হয়ে উঠল। 'গরুকা আঁত' অর্থাৎ ,গরুর অন্ত্র কথাটা শুনবা মাত্র তার অন্তর থেকে দেহের সর্বাঙ্গ যেন অস্পৃশ্য বস্তুর ছোঁয়াচ অনুভব করলে।

নাথু কিন্তু গ্রাহ্য করলেনা। ফাঁসীর আসামী ওয়ার্ডারের বিরক্তিকে গ্রাহ্য করবে কেন? ওয়ার্ডার তাকে সেলে পুরে লোহার গরাদে দেওয়া দরজাটা বন্ধ করছিল; ভিতরের দিকে গরাদে ধরে নাথু ওয়ার্ডারের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কথাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে;—ওহি যো—যে ঠো হামারা গলায় পরায়কে ঝুলায় দেগা—উঠো-তো আঁত হ্যায়, তা-উঠো গরুকে আঁত হ্যায়, না আর কিছু কা হ্যায়?

অর্থাৎ ফাঁসীর আসামীর গলায় যে দড়িটা পরিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়—নাথুর ধারণা, সেটা কোন জানোয়ারের অন্ত্র থেকে তৈরী, তার প্রশ্ন হ'ল—সে অন্ত্রটা গরুর অথবা অন্য কোন জানোয়ারের। দোবে দীর্ঘ দিন বাংলার জেলখানায় ওয়ার্ডারের কাজ করছে, এ ধরণের উদ্ভট হিন্দী বুঝতে সে অনায়াসেই পারে।

দোবেজী মুখ ঘুরিয়ে বার দুয়েক থুথু ফেলে বললে—আরে না না, আঁত-টাঁত না আছেরে—ডুরি,—ডুরি আছে। বহুত ফাইন ডুরি—মোম—

বাধা দিয়ে নাথু বললে—ছুরি ? দড়ি ? এই দড়ি ?

—হাঁ—হাঁ। দড়ি দড়ি—। নাথুর মুখের দিকে চেয়ে সে থেমে গেল।

দুটো গরাদে শীর্ণ হাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে নাথু আকাশের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছে, মুখের দুপাশের চোয়ালের হাড় দুটো অসম্ভব রকমের উঁচু হয়ে উঠেছে, স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে জীর্ণ শরীরে সকল শক্তি প্রয়োগ করে সে দাঁতে দাঁতে চেপে ধরেছে।

দোবে প্রধান লোক। ফাঁসীর আসামীদের সম্পর্কে বহু বিচিত্র গল্প সে শুনেছে, নিজেও চোখে দেখেছে—এগারটা ফাঁসীর আসামী; নাথুকে নিয়ে হবে বারোটা। এগারোটার অভিজ্ঞতাই তার যথেষ্ট, অর্থাৎ নাথু সম্বন্ধে আর তার কোন কৌতূহল নাই।

দরজায় তালা লাগিয়ে বার কয়েক ঝাঁকি দিয়ে টেনে দেখে—লালমারা জুতোর শব্দ তুলে সে চলে গেল।

* * *

ফাঁসীর দড়িতে ঝুলে পাটাতনের নীচে অন্ধকার গর্তের মধ্যে শরীরের সকল স্নায়বিক আক্ষেপ শেষ হয়ে গেলে নাথুর দেহ স্থির হয়ে যাবে, চোখে দৃষ্টি থাকবে না, আরও বিকৃতি হবে অনেক; সে দৃশ্য চোখে না দেখাই ভাল। কিন্তু এই মুহূর্তে মনহীন অথচ জীবন্ত নাথুর চেহারা দেখে শিল্পীর লোভ হবে ছবি আঁকতে, যোগপন্থী সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে ভাববে—খুনী লোকটা পেলে কোন পুণ্যে এই বস্তু! নাথুর দেহ থেকে মন বেরিয়ে চলে গিয়েছে। বাইরের প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে মনোলোকের গভীরে অন্ধকার অবচেতনে প্রবেশ করেছে—এ কথা বললে তর্ক তুলব না, কিন্তু সবিনয়ে বলব—আমার বিশ্বাস সেলের মধ্যে আবদ্ধ নাথুর মন ইট কাঠ লোহার স্থূল কঠিন নিশ্ছিদ্র অবস্থানকে অতিক্রম করে লালমাটির পাকা শড়ক ধরে চলে যাচ্ছে—এ আমি দেখতে পাচ্ছি।

"লালমাটির শড়কের দুপাশে ঘন সারিবদ্ধ গাছ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় গ্রাম, বাজার, পাকাবাড়ী দালান-কোঠা, গ্রাম শেষে আসে মাঠ; মাঠের

বুক চিরে মেটে রাস্তা, তেমনি একটি মেটে রাস্তা ধরে চলেছে তার মন। মেটে রাস্তার আশে পাশে ছোট ছোট গ্রাম, খড়ো-বাড়ী, বাঁশবন, ডোবা, আম-কাঁঠাল শিরীষ গাছের বাগান ঘেরা মজা দীঘি, মধ্যে মধ্যে আকাশ ছোঁয়া অশ্বথ গাছ, বিরাট ছাতার মত বট গাছ, সারিবন্দী তালগাছ, পড়ো ভিটাতে খেজুর গাছ, বড় বড় গাছের তলায় চাপ বেঁধে ধাবুরি মানে বনতুলসীর জঙ্গল, নয়নতারা ফুলের গাছ, কালুকাঁটার বন, ম্যালেরিয়া গাছের জঙ্গল, চলে গিয়েছে গ্রামের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছগুলোর এক একটার মাথায় আলোকলতা, তলায় ছোট গাছের জঙ্গলের মধ্যে লতিয়ে বেড়ায় বিছিতি-লতা। এ সব হল' চাষী-সদ্‌গোপের গ্রাম। সে গ্রাম পার হয়ে ওই মেটে পথ থেকে মন তার পথ ধরে—আঁকা বাঁকা আল পথে পথে। মাঠের মধ্যে, ছোট একটা 'কাঁদর' অর্থাৎ ছোট গেঁয়ো নদী বা বড় নালা; সে নালার দুধারে ঘন অর্জ্জুন গাছের জঙ্গল; নালার উপরে বাঁশের সাঁকো। সে সাঁকো পেরিয়ে ছোট একখানি গ্রাম, কুড়ি পঁচিশ ঘর পটুয়ার বাস। লোকে সকালে দুর্গা দুর্গা হরি হরি বলে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে মুখে হাতে জল দিয়ে আল্লাতায়লাকে ডাকে, রসুল আল্লাকে স্মরণ করে। কেউ গৌরাঙ্গের নাম নিয়ে খঞ্জনী পট নিয়ে গ্রামান্তরে বার হয়, কেউ শুধু খঞ্জনী নিয়ে শিবদুর্গার নাম নিয়ে বার হয়, কেউ গো-মাতা সুরভির নাম নিয়ে বার হয়।

"সুরভি মঙ্গল গান গোধন মহিমা
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে দিতে নারে সীমা।
লোম কূপে কূপে মায়ের দেবতারই বাস।
যে সেবে গো-মাতা তার পূরে সর্ব আশ।"

তালে তালে হাতের মন্দিরা বাজে ঠুন্‌-ঠন্‌ ঠুনু-নুন্‌; ঠুন্‌-ঠুন ঠুনু-নুন্‌; ঠুনু-নুন্‌, ঠুনু-নুন্‌; ঠুনু-ঠুনু ঠুনু-নুন!

'নবলক্ষ গাভীর পাল ছিল এক গৃহস্থের। ঘরের কর্তা বুড়ো সকালে গোয়ালের দরজায় প্রণাম করে দরজা খুলত। বড় বউ করত গোয়াল পরিষ্কার। বড় ছেলে দিত খেতে। মেজ ছেলে দুইত দুধ। ছোট

ছেলে নিয়ে যেত মাঠে। নবলক্ষ গাভী খুঁটে খুঁটে কচি ঘাস খেত, সে চারিদিকে পাহারা দিয়ে ফিরত; কোথায় আসছে সাপ, কোথায় উঁকি মারছে 'হুড়ার'। তার হাতে থাকত লাঠী—কোমরে গোঁজা থাকত বাঁশী। সন্ধ্যায় নবলক্ষ গাভী এসে দাঁড়াত গোয়ালের সামনে। এবার সেবার পালা পড়ত বাড়ীর বুড়ী গিন্নীর—ছেলেদের মায়ের; প্রতিটি গাইয়ের ক্ষুরে জল দিত, শিঙে তেল দিত, কপালে দিত হলুদ আর সিন্দুর। তাদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে মা সুরভি পাঠিয়ে দিলেন নিজের মেয়ে নন্দিনীর এক মেয়েকে। 'কামধেনু।'

দেখলেই মনে হয় আশ্বিন মাসের আকাশের সাদা মেঘের মত নরম আর সাদা ওই বকনা বাছুরটি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, গায়ে হাত দিলে মনে হয় কোন কচি দেবকন্যার অঙ্গে বা হাত পড়ল। হাতের নীচে কামধেনুর অঙ্গখানি শিউরে শিউরে ওঠে; পায়ের ক্ষুর পরিষ্কার করতে বসলে মাথার চুল চেটে আশীর্ব্বাদ করে, ঘামেভরা পিঠ চেটে আদর করে। সাধারণ গরু পিঠ চাটে ঘামের নোনতা আস্বাদের জন্য; কামধেনুর সম্পর্কে ওকথা বলা চলে না। নইলে সে যখন যুবতী হয়ে ওঠে, সর্বাঙ্গ ভরে ওঠে পুষ্টিতে, চিকনতর লোমে, গলার গলকম্বল প্রশস্ত হয়ে ঝুলে প'ড়ে, মন মোহিত ক'রে দুলতে থাকে, পিছন দিকটি ক্রমশ ভারী হয়ে উঠে থমকে থমকে চলে অথচ সন্তান প্রসবের কোন লক্ষণ দেখা যায় না;—গৃহস্থ যখন বন্ধ্যা গাই বলে বিরক্ত হয়ে ওঠে তখন একদিন বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে কামধেনুর মহিমা প্রকাশ পায়। সন্তান প্রসব করে না অথচ প্রবালের মত রক্তিম আভায় এবং একরাশি পদ্মফুলের মত পেলবতায় অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে তার স্তনভাণ্ড স্ফীত হয়ে ওঠে; পাকা বিম্বফলের মত পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে স্তনবৃন্তগুলি; প্রথমে বিন্দু বিন্দু দুধ দেখা দেয় স্তনবৃন্তের মুখে; তারপর ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে মাটিতে; কামধেনু সাড়া দেয়, ডাকতে থাকে; যেমন সন্তানবতী গাভীর স্তনে দুধ জমে উঠলে সে সন্তানকে ডাকে তেমনি ভাবে ডাকে কামধেনু, ডাকে গৃহস্থকে, বলে আমার সুধায় তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটুক, তোর সন্তান দুধে ভাতে থাকুক—; নে পাত্র এনে আমার

সুধা সংগ্রহ করে নে। এতেও যদি গৃহস্থ বুঝতে না পারে তবে কামধেনু তখন বসে পড়ে; স্তনের উপর দেহের চাপ দিয়ে অনর্গল সুধা ক্ষরিত করে দেখিয়ে দেয়।

বহু পুরুষের পুণ্য ফল, বহু জন্মের সৎকর্মের সৌভাগ্য। পটুয়ার ঘরে 'কামধেনু' একদিন ঠিক এইভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন। পুরুষানুক্রমে তারা 'সুরভি মঙ্গল' গান গেয়ে গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে গো-মাতার মহিমা প্রচার করে আসছে; কত পুরুষ তার সঠিক হিসেব নাই, তবে বাপের বাপ কর্তাবাপকে বুড়ো অবস্থাতেও দেখেছিল নাথু, তারই, তারই কাছে তার গান শিক্ষার হাতে খড়ি, বাপের সঙ্গে এক সঙ্গে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, তার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করেছে; নিজেও এই গান গাইছে। বহু পুরুষের সেবার পুণ্যফলের হিসেব, জমা-খরচের অঙ্কের মত ওর প্রমাণ প্রয়োগ লাগে না, কিন্তু বহু জন্মের সৎ-কর্মের ভাগ্যের কোন লিখিত পঠিত দলিল নাই, আর গাছের চারা দেখে যেমন মাটির তলার অদেখা বীজটির আকার প্রকার গুণাগুণ অনুমান করতে কষ্ট হয় না, তেমনি ধারায় কামধেনুর আবির্ভাবে পূর্বজন্মের সুকৃতিকেও সহজেই মেনে নিয়েছিল নাথু। এ জন্মের পুণ্যও আছে। নইলে এই বৃদ্ধ বয়সে এ ভাগ্য হল কি করে?

নিজেদের ঘরের গাইয়েরই বাছুর। সাদা ধবধবে রঙ; অত্যন্ত শান্ত, বাড়ীর লোকের গা চেটে চেটে পাশে পাশে ফিরত। সে যখন বড় হয়ে সন্তান প্রসব করলে না, তখন সকলে বিরক্ত হয়ে উঠছিল—সেই সময় ঘটল এই ঘটনা। পটুয়া পাড়ার সকলে ভিড় করে দেখতে এল। শুধু পটুয়াপাড়া নয়, গ্রামগ্রামান্তরের চাষী সদগোপেরা এল, গোয়ালপাড়ার ঘোষেরা এল, বিপ্রচক্র গ্রামের ভটচাজ এলেন। সকলে একবাক্যে স্বীকার করে গেল, হ্যাঁ, নাথুর পূর্বপুরুষের সেবা আর নাথুর জন্মজন্মান্তরের সৎকর্মে তিলার্ধ সন্দেহের অবকাশ নাই। এবং এতেও কোন সংশয় নাই যে এইবার নাথুর সংসার ধনে ধান্যে সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

নাথুও তাতে সন্দেহ করলে না—সে আশা করেই বসে রইল।

তার লক্ষণও যেন দেখা দিল। কামধেনুর দুধের জন্য লোক আসতে আরম্ভ করলে। আগে দেশে ছিল এক আনা সের দুধ—টাকায় ষোল সের, এখন আক্রাগণ্ডার বাজারে টাকায় আট সের—একসের দুধের দু আনা দাম। নাথু কামধেনুর দুধের দাম স্থির করলে চার আনা সের। লোকে আপত্তি করলে না। এই আপত্তি না করাটাই তার কাছে সৌভাগ্য সমাগমের প্রথম লক্ষণ বলে মনে হ'ল। কিন্তু কামধেনু সমস্ত দিনে দুধ দেয় এক সের, প্রচুর সেবা করেও পাঁচ পোয়ার বেশী দুধ উঠল না। তখন চার আনাকে সে তুললে আট এানায়। লোকে তাতেও আপত্তি করলে না। দৈনিক বারো আনা পয়সা কামধেনুর আশীর্বাদ। তা' ছাড়া মধ্যে মধ্যে আরো উপার্জন হয় আকস্মিকভাবে। নাথু যায় ভিক্ষায়। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, একহাতে মন্দিরা, একহাতে সরু বাঁশের তেলে-পাকানো লালরঙের দেড়হাত লম্বা লাঠি, মাথায় গামছার পাগড়ী, গায়ে ঢিলে ঢালা বেমানান রকমের একটা ভিক্ষেয় পাওয়া জামা।

সুরভিমঙ্গল গান করে ভিক্ষে পায় চাল। গো চিকিৎসা করে পায় দুআনা-চারআনা বকশিশ। কোথাও কারো বাড়ীতে গরুর অসুখের কথা শুনলে নিজেই গিয়ে উপস্থিত হয়। এই নিয়ম, এই ওস্তাদের আজ্ঞা, পিতৃপুরুষের এই আচার। অবোলা জীব—তার জন্যে ডাকবে কে? সাক্ষাৎ ভগবতী—তার সেবার জন্যে আহ্বানের প্রয়োজন আছে না কি?

প্রথমেই গরুর গায়ে হাত দেয়। স্পর্শ মাত্র শরীরে তার শিহরণ খেলে যায় কিনা পরীক্ষা করে। তারপর জিভ দেখে, মাড়ি দেখে, ঘা দেখা দিয়েছে কিনা পরীক্ষা করে। কানের ডগা মুঠোয় চেপে ধ'রে পরীক্ষা করে। পায়ের ক্ষুর দেখে।

তারপর ভিক্ষার ঝুলির ভিতর থেকে বার করে ছোট একটি ঝুলি। হরেক রকম শিকড়, জড়ি, বুটির মধ্য থেকে বেছে ওষুধ দেয়।

বাদ্লার অর্থাৎ জ্বরের ওষুধ, ঘুঁটুকের ওষুধ, 'খুঁড়িয়া'র ওষুধ। 'গুটি' অর্থাৎ বসন্ত হলে মুখ ম্লান করে ব'লে—মা, শীতলার পূজা করান

মা, পুষ্প বেঁধে দিন গোয়ালের চালের বাতায়, চরণামেত্ত খাইয়ে দেন সব মা ভগবতীকে। মায়ের রোষ, এর আর ওসুদ কোথা বলুন ?

ওষুদের দাম জিজ্ঞাসা করলে জিভ কেটে বলে—ও কথা বলবেন না, ওষুদের দাম নিতি নাই। তারপর হেসে বলে—দামই বা কি বলেন ? নদীর ধারে খোদাতায়লা শ্রীহরি করেছে গাছের 'সিরৃজন' (সৃজন) তারই শিকড় আর পাতা। কতক তো আবার ঘরের পাদাড়ে, (পাশে পিছনে)। তুলে নিয়ে আসি। বড়িগুলান বানাতে এক পয়সার গোলমরিচ কি আনাটাকের সিদ্ধি—কি দু পয়সার অন্য কিছু লাগে; তা গেরস্তর দুয়োরে গোধনমঙ্গল গান করে তো ভিক্ষে পাই। পেট ভরেও তো দুচার আনা বাঁচে মাসে। তবে—

হাত দুটি জোড় করে বলে—তবে যদি বক্‌শিশ করেন—দুহাত পেতে নোব, নাম করতে করতে বাড়ী যাব।

—কি বকশিশ নেবে বল ? কি হলে খুশী হও ?

—'গেরস্তের হাত ঝাড়লে তাই আমাদের কাছে পর্বত। যা দেবেন তাতেই খুশী। না দেবেন—তাতেও খুশী, গোমাতার সেবা করলাম—সেই পুণ্যিতে পারে যাব; আমার ছেলে পুলে ভাল থাকবে—মা-সুরভির আশীর্ব্বাদে।

ছেলেপুলে নাই নাথুর, তবু ওই কথাগুলি গড়গড় ক'রে বলে যায়, পিতৃপুরুষের কথা, নিজের ছেলেপুলে নাই বলে কি সে কথার খানিকটা বাদ দিয়ে অঙ্গহীন করতে পারে ?

এক এক গৃহস্থ বাড়ীতে—বিশেষ করে ভদ্র গ্রামের গৃহস্থ বাড়ীতে—গরুর ব্যাধি লেগেই থাকে। তাদের বলে, আপনারা বাবুলোক—সদ্‌জাতি—গরুর সেবা আপনাদের রাখালের হাতে। মা ভগবতী অবহেলা সইতে লারেন বাবু। ভাল করে যত্ন লিবেন। নিজে হাতে সেবা না-করেন—নিজে দাঁড়িয়ে চোখে দেখবেন হুজুর।

দেখি তো বাপু। নিজে দুবেলাই দাঁড়িয়ে দেখি।

—তবে ? চিন্তিত হয় নাথু। চিন্তা ক'রে বলে—তবে গোয়ালের দোষ হয়ে থাকবে।

বাড়ীর প্রৌঢ়া গৃহিণী—গৃহস্বামীর মা এবার আগিয়ে আসেন।—দোষ হয়েছে কি না তুমি বলতে পার?

—জানি বৈকি মা। এ যে আমার পিতি-পুরুষের কুলকমম। গুণে বলতে পারি।

—আমার চল্লিশটা গরু। বড় বড় বলদ। দেড়শো-দুশো এক একটার দাম।

—আহা—মা—তুমি ভাগ্যবতী!

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে প্রৌঢ়া বলেন—সে সব তো পুরনো কথা বাবা। আজ পাঁচটিতে ঠেকেছে।

নাথুর মাথা ঘন-ঘন নড়তে থাকে সমবেদনায়, আক্ষেপে,—আহা-হা, আহা-হা! আহা-হা মা। সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের পিছনে জিভ টেনে টেনে—আক্ষেপ ব্যঞ্জক শব্দ তোলে—চুক্ চুক্ চুক্ চুক্।

—একটা একটা রোগ হচ্ছে—মরছে। রোগ হলে, ভালও তো হয়; কিন্তু আমার ঘরে—রোগ হলে গরু বাঁচে না।

—আহা-মা! প্রৌঢ় নাথু হলুদ চোখ তুলে তাকায় প্রৌঢ়ার দিকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

—দুধোল গাই একটা সেদিন আমার ধড়ফড় ক'রে মরে গেল। দেখ তো গুনে—গোয়ালের কি দোষ হ'ল।

—গোয়ালের আঙিনায় চলেন মা।

গোয়ালের আঙিনায় বসে—ভিক্ষার ঝুলি থেকে বার করে লাল খেরুয়ার তৈরী ছোট থলিটি। থলিটি খুলে বার করে এক টুকরো খড়ি। হাত দিয়ে সামনের খানিকটা জায়গায় ধুলো পরিষ্কার ক'রে নেয়, তার পর বারবার ফুঁ দিয়ে ধূলো উড়িয়ে সরিয়ে দেয়—তারপর নিজের মাথার গামছা নিয়ে খুঁট দিয়ে পরিষ্কার করে। পরিষ্কার জায়গাটার উপর খড়ি দিয়ে তিনটি সমান্তরাল রেখা টানে। তার সামনে নিজের বাঁ হাত পেতে—বিড় বিড় ক'রে কত কিছু বলে যায়। বিড় বিড় মন্ত্র শেষ করে বেশ চিৎকার ক'রে বলে—দোহাই মা কাঁউরের কামিক্ষে!

দোহাই তেত্রিশ কোটী দেবতার! দোহাই রসুলে আল্লার। দোহাই মুনি ঋষির! দোহাই পীর গাজীর!

"—যদি কিছু থাকে তো বলিস।
না যদি হয় তো—ডাইনে বাঁয়ে চলিস।"

হাত তার চলতে থাকে মাটির উপরে। ডাইনে যায় না—বাঁয়ে যায় না—সমান্তরাল রেখা তিনটির মাঝখানে গিয়ে—থেমে যেন চেপে বসে যায়।

নাথু মুখ তুলে প্রৌঢ়ার দিকে চেয়ে বলে—আছে মা, দোষ আছে।

—কি দোষ?

চুপ ক'রে থাকে নাথু।

—কি দোষ বল?

চোখ বুঁজে নাথু বলে—বহুকালের পুরনো গোয়াল মা আপনার, অনেক গরুর রোগের বিষ জমে আছে মা অনেক কালের গোবর চোনা জমে আছে; তা ছাড়া—মানুষেও দোষ করে—মদ এনে লুকিয়ে রাখে—মাংস এনে খায়, অভয় দেন তো বলি মা—ব্যভিচার হয় বলেও সন্দ হয় মা!

অভিযোগের কোনটাই অসম্ভব নয়। গোবরচোনা সত্যিই জমে আসছে—দীর্ঘকাল ধ'রে। আগে কৃষাণেরা চাষের আগে গোয়ালের মাটি কেটে তুলে নিত, সার হিসেবে ব্যবহার করত জমিতে, আজকাল সে কষ্ট তারা করে না। বাউড়ি ডোম রাখাল মাহিন্দারে—বাবুদের গোয়ালের মধ্যে বেআইনি চোলাই মদ লুকিয়ে রাখে—পুলিশের ভয়ে; সেখানে বসে মাছ মাংসের সঙ্গে মদও খায়। আর ব্যভিচারও হয়। বাড়ীর কর্ম্মচারী থেকে মাহিন্দার পর্য্যন্ত তাতে লিপ্ত। স্বৈরিণী হরিজন কন্যার অভাব নাই; গোয়ালের মত নির্জন অন্তরালও নাই। অভিযোগগুলি অবহেলিত গোপন সত্য। অথচ পাপ—তাতে সন্দেহ নাই। মায়ের মুখ থমথমে হয়ে উঠে। তিনি ছেলেকে বলেন—শুনলে তো? প্রতিবিধান কর এ সবের। নইলে শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীর লক্ষ্মীও বিদায় নেবেন।

—আহা মা, তুমি পুণ্যাত্মা। দিব্যবুদ্ধি তোমার! নাথু মুগ্ধ হয়ে যায় প্রৌঢ়ার কথা শুনে।

প্রৌঢ়া এবার নাথুকে বলেন—এর উপায় বলতে পার?

—পারি মা। সাতটি তুলসী পাতা, সাতটি বেল পাতা, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, গো-রক্ষনাথ শিবের আশীর্বাদী, আর সর্বজয়া—বেনের দোকানে পাবেন মা সর্বজয়া, এই এক সঙ্গে ক'রে পুঁতে দেবেন গোয়ালে। আর গোয়ালের মাটি তুলে দেন; দেওয়ালগুলি নিকিয়ে দেন। আবার মা সুরভির দয়া হবে। নবলক্ষ পালে গোয়াল আপনার ভরে যাবে।

—কিন্তু গোরক্ষনাথের আশীর্বাদী কোথায় পাব? সে তো অনেকদূর।

—আমি দিব মা। আমার কত্তাবাপ গিয়েছিল। সেই আশীর্বাদী তিনপুরুষ ধরে আমাদের আছে মা। বাবা গোরক্ষনাথের নাম নিয়ে নতুন বেলপাতা তাতে দিয়ে দিয়ে রাখি। এক ফোঁটা গঙ্গা জল পরশ করলে পাপ যায়। এক কলসী জলে দিলে—সেও গঙ্গাজল হয়ে উঠে—বলতে বলতেই সে ঝুলি খুলে একটি শুকনো বেলপাতা বার করে আলগোছে মায়ের হাতে ফেলে দেয়।

মা খুশী হয়ে নাথুকে দেন একখানা পুরানো কাপড়, একটা জামা, আট আনা পয়সা, এবং আঁচল ভরে চাল, তার সঙ্গে মুড়ি আর নাড়ু।

নাথুর কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকে না। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—মঙ্গল হবে মা, কল্যাণ হবে মা, ধর্মের সংসার তোমার, তোমার পুণ্যে—যে পাপ বাইরে থেকে আসুক, আগুনের মুখে তুলোর মত—খড়ের মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মা!

মা হাসেন, পরিতৃপ্তিতে স্নিগ্ধ মিষ্ট হাসি।

নাথু বলে—আপনি গোয়ালের মাটি কাটান, দেওয়াল নিকান—তারপর একদিন আমার মা সুরভিকে এনে আপনার গোয়ালে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে পবিত্র করিয়ে দিব, সুরভির গোবরে চোনায় সব দোষ কেটে যাবে মা। আমার বাড়ীতে কামধেনু আছেন মা।

—কানধেনু? প্রৌঢ়ার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

—হ্যাঁ মা, কামধেনু।

নাথু সগৌরবে কামধেনুর বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে।—"আশিন মাসের সাদা নরম মেঘের মত বরণ, তেমনি কোমল আমার মায়ের অঙ্গ। 'পলা' জানেন মা? জানবেন বই কি—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—হীরা মণি মুক্তা প্রবাল—এ সবই তো মায়ের ভাণ্ডারে আছে—। তেমনি বরণ আমার কামধেনুর 'পালানের' (স্তনের) মাখনের মত নরম—মোলাম।

বলেই যায় নাথু। বলেই যায়। থামতে চায় না, মনে হয় বলা হ'ল না।

মা বলেন—তুমি ভাগ্যবান বাবা। এনো-একদিন, নিয়ে এসো। মায়ের পূজো করব আমি।

তারপর হঠাৎ বললে—'বসোয়া' নিয়ে হিন্দুস্থানীরা বেড়ায়। তুমি তোমার কামধেনু নিয়ে বেড়াও না কেন বাবা? গেরস্তের মঙ্গল হয়। তোমারও মায়ের কৃপায় রোজগার হয়।

রাজার ঘরের মেয়ে—রাজার ঘরের রাণী—রাজার মা—রাজবুদ্ধি। মায়ের বুদ্ধি আর মা সুরভির মাহাত্ম্য! নাথুর সংসার পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কামধেনুর শিঙ দুটিতে সে পিতলের খাপ পরিয়ে দিলে। গলায় ঝুলিয়ে দিলে চার পাঁচ সারি লাল সবুজ হলুদ কাল পাথরের মালা; তার সঙ্গে ঘুঙুর, ঘণ্টা; পিঠে চাপিয়ে দিলে ছাপানো কাপড়ে কড়ি গেঁথে—সুন্দর দোলাই। মাকে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরত। পরীক্ষা দেখাত কামধেনুর বাঁট টিপে দুধ বার ক'রে। বেলা দুপহর পর্য্যন্ত গেরস্তের দোরে ঘুরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের কোন দিঘীর ঘাটে এসে বসে নিজে মুড়ি চিবুতো; কামধেনুর সামনে বিছিয়ে দিত একখানি গামছা, তাতে ঢেলে দিত ভিক্ষার চালের কিছু চাল, কামধেনু চালগুলি খেয়ে ঘাটে জল খেতো, তারপর উঠে এসে নাথুর পিঠ চাটতো—মাথার চুল চাটতো।

* * *

—আহা মা, তুমি পুণ্যাত্মা। দিব্যবুদ্ধি তোমার! নাথু মুগ্ধ হয়ে যায় প্রৌঢ়ার কথা শুনে।

প্রৌঢ়া এবার নাথুকে বলেন—এর উপায় বলতে পার?

—পারি মা। সাতটি তুলসী পাতা, সাতটি বেল পাতা, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, গো-রক্ষনাথ শিবের আশীর্বাদী, আর সর্বজয়া—বেনের দোকানে পাবেন মা সর্বজয়া, এই এক সঙ্গে ক'রে পুঁতে দেবেন গোয়ালে। আর গোয়ালের মাটি তুলে দেন; দেওয়ালগুলি নিকিয়ে দেন। আবার মা সুরভির দয়া হবে। নবলক্ষ পালে গোয়াল আপনার ভরে যাবে।

—কিন্তু গোরক্ষনাথের আশীর্বাদী কোথায় পাব? সে তো অনেকদূর।

—আমি দিব মা। আমার কত্তাবাপ গিয়েছিল। সেই আশীর্বাদী তিনপুরুষ ধরে আমাদের আছে মা। বাবা গোরক্ষনাথের নাম নিয়ে নতুন বেলপাতা তাতে দিয়ে দিয়ে রাখি। এক ফোঁটা গঙ্গা জল পরশ করলে পাপ যায়। এক কলসী জলে দিলে—সেও গঙ্গাজল হয়ে উঠে—ব'লতে বলতেই সে ঝুলি খুলে একটি শুকনো বেলপাতা বার করে আলগোছে মায়ের হাতে ফেলে দেয়।

মা খুশী হয়ে নাথুকে দেন একখানা পুরানো কাপড়, একটা জামা, আট আনা পয়সা, এবং আঁচল ভরে চাল, তার সঙ্গে মুড়ি আর নাড়ু।

নাথুর কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকে না। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—মঙ্গল হবে মা, কল্যাণ হবে মা, ধর্মের সংসার তোমার, তোমার পুণ্যে—যে পাপ বাইরে থেকে আসুক, আগুনের মুখে তুলোর মত—খড়ের মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মা!

মা হাসেন, পরিতৃপ্তিতে স্নিগ্ধ মিষ্ট হাসি।

নাথু বলে—আপনি গোয়ালের মাটি কাটান, দেওয়াল নিকান—তারপর একদিন আমার মা সুরভিকে এনে আপনার গোয়ালে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে পবিত্র করিয়ে দিব, সুরভির গোবরে চোনায় সব দোষ কেটে যাবে মা। আমার বাড়ীতে কামধেনু আছেন মা।

—কানধেনু? প্রৌঢ়ার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

—হ্যাঁ মা, কামধেনু।

নাথু সগৌরবে কামধেনুর বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে।—"আশিন মাসের সাদা নরম মেঘের মত বরণ, তেমনি কোমল আমার মায়ের অঙ্গ। 'পলা' জানেন মা? জানবেন বই কি—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—হীরা মণি মুক্তা প্রবাল—এ সবই তো মায়ের ভাণ্ডারে আছে—। তেমনি বরণ আমার কামধেনুর 'পালানের' (স্তনের) মাখনের মত নরম—মোলাম।

বলেই যায় নাথু। বলেই যায়। থামতে চায় না, মনে হয় বলা হ'ল না।

মা বলেন—তুমি ভাগ্যবান বাবা। এনো-একদিন, নিয়ে এসো। মায়ের পুজো করব আমি।

তারপর হঠাৎ বললে—'বসোয়া' নিয়ে হিন্দুস্থানীরা বেড়ায়। তুমি তোমার কামধেনু নিয়ে বেড়াও না কেন বাবা? গেরস্তের মঙ্গল হয়। তোমারও মায়ের কৃপায় রোজগার হয়।

রাজার ঘরের মেয়ে—রাজার ঘরের রাণী—রাজার মা—রাজবুদ্ধি। মায়ের বুদ্ধি আর মা সুরভির মাহাত্ম্য! নাথুর সংসার পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কামধেনুর শিঙ দুটিতে সে পিতলের খাপ পরিয়ে দিলে। গলায় ঝুলিয়ে দিলে চার পাঁচ সারি লাল সবুজ হলুদ কাল পাথরের মালা; তার সঙ্গে ঘুঙুর, ঘণ্টা; পিঠে চাপিয়ে দিলে ছাপানো কাপড়ে কড়ি গেঁথে—সুন্দর দোলাই। মাকে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরত। পরীক্ষা দেখাত কামধেনুর বাঁট টিপে দুধ বার ক'রে। বেলা দুপহর পর্য্যন্ত গেরস্তের দোরে ঘুরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের কোন দিঘীর ঘাটে এসে বসে নিজে মুড়ি চিবুতো; কামধেনুর সামনে বিছিয়ে দিত একখানি গামছা, তাতে ঢেলে দিত ভিক্ষার চালের কিছু চাল, কামধেনু চালগুলি খেয়ে ঘাটে জল খেতো, তারপর উঠে এসে নাথুর পিঠ চাটতো—মাথার চুল চাটতো।

হঠাৎ কি যে হ'ল! জানেন খোদাতায়লা, জানেন ভগবান গোলকপতি হরি, জানেন পয়গম্বর, জানেন মুনি ঋষিরা, সাধু মহাত্মারা। তাইবা কেন? নাথুও জানে। জানবে না কেন? পাপ। পাপে ভরে গেল দুনিয়া। পাপের ভারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটতে লাগল। মহামারণ চলতে লাগল—তার আর বিরাম নাই। সে বছর বানে দেশ গেল ডুবে হেজে। ফিরে বছরে শীতকালে-মাঘ মাসের পয়লা পৃথিবী উঠল কেঁপে, ভূমিকম্প। নাথু গিয়েছিল মা সুরভিকে নিয়ে গ্রামান্তরে। দুপুর বেলা দুনিয়া টলতে লাগল—বাড়ী দুলছে—বড় বড় গাছ দুলছে, দিঘীর জল এপার থেকে ঢেউ তুলে ওপারে ছুটছে—ওপার থেকে হুড় হুড় করে এপারে আসছে, আছাড় খেয়ে পড়েছে। মাটির ভেতর থেকে শব্দ উঠছে—যেন দশ বিশটা রেল ইঞ্জিন ছুটে আসছে, সে ইঞ্জিনে 'ডেরাইবর' নাই। মা সুরভি বসে পড়ল মাটির উপর, নাথু উল্টে পড়ে গেল। বসুমতী স্থির হলেন; নাথু বাড়ী এল। বাড়ী ঘরের চিহ্ন নাই,—পড়ে আছে শুধু ভাঙা দেওয়াল—আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়া চাল। কোথায় স্ত্রী—কোথায় ছেলেরা—কোন সন্ধান মিলল না। তিন দিন লাগল মাটি সরাতে; তখন মিলল সন্ধান; পচা গন্ধ বেরিয়েছে তখন।

তারপর বছর এল আরও ভয়ঙ্কর বছর। পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে হ'ল কাঠ—তেতে হ'ল আগুন, আকাশ গেল রণ-কুয়াশায় ভরে—মেঘ গেল উড়ে, বাতাস হয়ে উঠল আবিল, নদী গেল শুকিয়ে, পুকুরে দীঘিতে জেগে উঠল পাঁক—শুকিয়ে শুকিয়ে তাও ফেটে হ'ল চৌচির। মাটি জল বাতাস দূরের কথা, নাথুর কামধেনুর দুধ গেল শুকিয়ে। একটা গ্রামে ঘুরলে চাল কাপড়ের বোঝা নাথুর পক্ষে ভারী হয়ে উঠত···তিনটে গ্রামে ঘুরেও নাথুর ঝুলির অর্ধেকের উপর খালি থাকতে আরম্ভ করল।

সেই বছর।

নাথুর পরীক্ষা। নাথুর সামনে এসে দাঁড়াল—জগদীশ পটুয়ার বিশ বছরের যুবতী মেয়ে ফুলমণি। ভূমিকম্পে স্ত্রী-পুত্র ভরা সংসার

মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে জীয়স্তে যেমন খোদাতায়লার মর্জিতে ভগবানের কোপে কবরে গেল—তখন আর সংসার সে করবে না বলেই সংকল্প করেছিল। কিন্তু ফুলমণি এল—মুনিঋষিদের সামনে স্বর্গের অপ্সরারা ঘাড় বেঁকিয়ে, গালে একটি আঙুল রেখে, একটু হেসে যেমন ভাবে এসে দাঁড়াত, তেমনি ভাবে এসে দাঁড়াল। ফুলমণির স্বামী হাঁপানীর রোগী, তার উপর এই দুর্ভিক্ষের বছর সে পেটের জ্বালায় ফুলমণিকে একশো টাকা আর পাঁচমণ চাল নিয়ে হেফাজদ্দি সেখ পাইকারকে বেচবার ফন্দী করছিল—কিন্তু ফন্দির ফাঁস এড়িয়ে ফুলমণি পালিয়ে এসেছে বাপের বাড়ী। কুৎসিত কদাকার হেফাজদ্দির তুলনা দিয়ে পটুয়ার মেয়ে ফুলমণি বলেছে—ওর চেয়ে যমদূতেরা কাত্তিক।

—তার মানে?

বাঁকা চোখে চেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে ফুলমণি বললে—পটুয়ার ছেলে ছড়া-পাঁচালি গান কর, এর মানে যদি না বুঝ তবে আমার নয়—তোমার মরণ ভাল।

ফুলমণির এমন রূপ কিছু ছিল না, যা ছিল তাও হাঁপানীর রোগী স্বামীর হাতে পড়ে বিশেষ ক'রে এই বছরে একেবারেই গিয়েছে। তবে ফুলমণির রূপে যে দুটি ছিল অপরূপ সে দুটি এতেও যাবার নয়—যায়ও নাই। ভাসা-ভাসা ডবডবে চোখ আর পাতলা বাঁকানো দুটি ঠোঁট। বিশেষ ক'রে চোখ। দেখলে মনে হয় মেয়েটার চোখে যেন কিসের ঘোর লেগে রয়েছে; চোখের দিকে তাকালে ওই ঘোরের ছোঁয়াচ লেগে যায়।

সেলের গরাদে ধরে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল নাথু। এতক্ষণে সে নড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে এ-পাশ ও-পাশ দেখলে একবার; তারপর পিছন ফিরে সেলের ভিতরটা একবার ভাল করে দেখলে। সমস্ত ঘরটা একবার ঘুরলে। আবার এসে সে গরাদে ধরে দাঁড়াল। তারপর হাঁকতে লাগল—সিপাহী জী—সিপাহী জী,—সিপাহী জী!

—কেয়া?

হঠাৎ কি যে হ'ল! জানেন খোদাতায়লা, জানেন ভগবান গোলক-পতি হরি, জানেন পয়গম্বর, জানেন মুনি ঋষিরা, সাধু মহাত্মারা। তাইবা কেন? নাথুও জানে। জানবে না কেন? পাপ। পাপে ভরে গেল দুনিয়া। পাপের ভারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটতে লাগল। মহামারণ চলতে লাগল—তার আর বিরাম নাই। সে বছর বানে দেশ গেল ডুবে হেজে। ফিরে বছরে শীতকালে-মাঘ মাসের পয়লা পৃথিবী উঠল কেঁপে, ভূমিকম্প। নাথু গিয়েছিল মা সুরভিকে নিয়ে গ্রামান্তরে। দুপুর বেলা দুনিয়া টলতে লাগল—বাড়ী দুলছে—বড় বড় গাছ দুলছে, দিঘীর জল এপার থেকে ঢেউ তুলে ওপারে ছুটছে—ওপার থেকে হুড় হুড় করে এপারে আসছে, আছাড় খেয়ে পড়েছে। মাটির ভেতর থেকে শব্দ উঠছে—যেন দশ বিশটা রেল ইঞ্জিন ছুটে আসছে, সে ইঞ্জিনে 'ডেরাইবর' নাই। মা সুরভি বলে পড়ল মাটির উপর, নাথু উল্টে পড়ে গেল। বসুমতী স্থির হলেন; নাথু বাড়ী এল। বাড়ী ঘরের চিহ্ন নাই,—পড়ে আছে শুধু ভাঙা দেওয়াল—আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়া চাল। কোথায় স্ত্রী—কোথায় ছেলেরা—কোন সন্ধান মিলল না। তিন দিন লাগল মাটি সরাতে; তখন মিলল সন্ধান; পচা গন্ধ বেরিয়েছে তখন।

তারপর বছর এল আরও ভয়ঙ্কর বছর। পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে হ'ল কাঠ—তেতে হ'ল আগুন, আকাশ গেল রণ-কুয়াশায় ভরে—মেঘ গেল উড়ে, বাতাস হয়ে উঠল আবিল, নদী গেল শুকিয়ে, পুকুরে দীঘিতে জেগে উঠল পাঁক—শুকিয়ে শুকিয়ে তাও ফেটে হ'ল চৌচির। মাটি জল বাতাস দূরের কথা, নাথুর কামধেনুর দুধ গেল শুকিয়ে। একটা গ্রামে ঘুরলে চাল কাপড়ের বোঝা নাথুর পক্ষে ভারী হয়ে উঠত···তিনটে গ্রামে ঘুরেও নাথুর ঝুলির অর্ধেকের উপর খালি থাকতে আরম্ভ করল।

সেই বছর।

নাথুর পরীক্ষা। নাথুর সামনে এসে দাঁড়াল—জগদীশ পটুয়ার বিশ বছরের যুবতী মেয়ে ফুলমণি। ভূমিকম্পে স্ত্রী-পুত্র ভরা সংসার

মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে জীয়ন্তে যেমন খোদাতায়লার মর্জিতে ভগবানের কোপে কবরে গেল—তখন আর সংসার সে করবে না বলেই সংকল্প করেছিল। কিন্তু ফুলমণি এল—মুনিঋষিদের সামনে স্বর্গের অপ্সরারা ঘাড় বেঁকিয়ে, গালে একটি আঙুল রেখে, একটু হেসে যেমন ভাবে এসে দাঁড়াত, তেমনি ভাবে এসে দাঁড়াল। ফুলমণির স্বামী হাঁপানীর রোগী, তার উপর এই দুর্ভিক্ষের বছর সে পেটের জ্বালায় ফুলমণিকে একশো টাকা আর পাঁচমণ চাল নিয়ে হেফাজদ্দি সেখ পাইকারকে বেচবার ফন্দী করছিল—কিন্তু ফন্দির ফাঁস এড়িয়ে ফুলমণি পালিয়ে এসেছে বাপের বাড়ী। কুৎসিত কদাকার হেফাজদ্দির তুলনা দিয়ে পটুয়ার মেয়ে ফুলমণি বলেছে—ওর চেয়ে যমদূতেরা কাত্তিক।

—তার মানে ?

বাঁকা চোখে চেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে ফুলমণি বললে—পটুয়ার ছেলে ছড়া-পাঁচালি গান কর, এর মানে যদি না বুঝ তবে আমার নয়—তোমার মরণ ভাল।

ফুলমণির এমন রূপ কিছু ছিল না, যা ছিল তাও হাঁপানীর রোগী স্বামীর হাতে পড়ে বিশেষ ক'রে এই বছরে একেবারেই গিয়েছে। তবে ফুলমণির রূপে যে দুটি ছিল অপরূপ সে দুটি এতেও যাবার নয়—যায়ও নাই। ভাসা-ভাসা ডবডবে চোখ আর পাতলা বাঁকানো দুটি ঠোঁট। বিশেষ ক'রে চোখ। দেখলে মনে হয় মেয়েটার চোখে যেন কিসের ঘোর লেগে রয়েছে ; চোখের দিকে তাকালে ওই ঘোরের ছোঁয়াচ লেগে যায়।

সেলের গরাদে ধরে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল নাথু। এতক্ষণে সে নড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে এ-পাশ ও-পাশ দেখলে একবার ; তারপর পিছন ফিরে সেলের ভিতরটা একবার ভাল করে দেখলে। সমস্ত ঘরটা একবার ঘুরলে। আবার এসে সে গরাদে ধরে দাঁড়াল। তারপর হাঁকতে লাগল—সিপাহী জী—সিপাহী জী,—সিপাহী জী !

—কেয়া ?

—কয়লা—কয়লা, একটুকরো পোড়া কয়লা।

—কয়লা? কয়লা কেয়া হোগা?

—ছবি আঁকেগা—ছবি।

—আরে! কেয়া তুম পাগলা হো গিয়া? যাও, যাও, বইঠো আরাম করো, নিদ যাও।

চলে গেল ওয়ার্ডার।

—সিপাহীজী—এ সিপাহীজী—! এ সিপাহীজী—ইঃ। এ—হো—সিপাহীজী—হোঃ! এ—!

ওয়ার্ডারটা ফিরে এসে একটুকরো পোড়া কয়লা ছুঁড়ে দিয়ে গেল। নাথু সাগ্রহে কুড়িয়ে নিয়ে একটা কোণে বসে ছবি আঁকতে আরম্ভ করলে। চোখ আঁকতে লাগল। 'সুরভিমঙ্গল' গান গেয়ে ভিক্ষে করে দিন কাটালেও নাথু পটুয়ার ছেলে। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত—নাথু চিত্রকর। জাতিতে পটুয়া—ধর্মে ইসলাম। তুলি একেবারে না-ধরা নয়। ছবি আঁকার খেয়ালটাও তার পাগলামী নয়। সে পাগল হয়ে যায় নি, ফুলমণির চোখ দুটো মনে পড়ে বুকে তার নেশা জেগে উঠেছে। খেয়াল হয়েছে—য'দিন বাঁচবে—ফুলমণির চোখ দুটো বসে বসে দেখবে। বড় বড় ডবডবে দুটো চোখ!

"ওই চোখের সে কি নেশা! পটুয়ার ছেলে নাথু, ছড়া—মঙ্গলগান অনেক জানে। ফুলমণির চোখের কথা বলতে গেলে একটি কথা তার জিভের ডগায় আপনি এসে পড়ে;—'মুনিজনের-মনভুলানো'। কথা বলতে বলতে ফুলমণির চোখের পাতা ঢলে' নেমে আসত, চোখ দুটি হ'ত তখন আধখানা চাঁদের মত; অঘোরে ঘুমোলে ফুলমণির চোখ হ'ত যেন রমজানের চাঁদের ফালি। আর তার দুই পাতলা বাঁকা ঠোঁট—মনে হ'ত অহরহই যেন মুচকে হাসছে, যে হাসির মানে ঠিক বুঝা যায় না—শুধু আন্দাজ করা যায়। ফুলমণির চোখ দেখে যে নেশা লাগে—সে নেশার ঘোরে—মিঠে হাওয়ার আমেজ লাগিয়ে দেয় ওই বাঁকানো পাতলা ঠোঁটের মিহি মুচকি হাসি।

মুনি-ঋষির তপস্যা যায়, রাজার রাজ্যনাশ হয়, মোহিনীর মোহে শিব ছোটেন পাগলের মত ; স্বর্গের দেবতার অভিশাপ ভিন্ন এ নেশার ঘোর কাটে না। নাথু তো ছার মানুষ। আপসোস নাই, খেদ নাই, মোহিনী মায়ায় ভুলেছিল নাথু !

সকালে উঠে খোদাতায়লা রসুলে আল্লার নাম নিচ্ছিল, দয়াময় হরিকে ডাকছিল—"ছিষ্টি (সৃষ্টি) রক্ষা কর, মেঘ দাও—জল হোক—দুনিয়া ঠাণ্ডা হউক, চাষবাস হোক, শুকনো মাটিতে দুর্বো গজাক, মানুষ বাঁচুক,—গরু-বাছুর বাঁচুক, আমার মা সুরভি ঘাস খেয়ে বাঁচুক।

কামধেনুর পাঁজরা বেরিয়েছে, বাঁটে আর দুধ নাই। ভিক্ষেয় গিয়ে চাল যা মেলে—তার দুমুঠোতে কামধেনুর পেঠ ভরে না—বাকী দু-মুঠোয় নাথুর পেটেরও জ্বালা ঘোচে না। যে দিন যায় সে—সেই ভালো মায়ের বাড়ী—সেদিন সেখানে কিছু মেলে। দু-আঁটি খড়, কিছু ভুষি, কিছু চাল—খেতে পায় তার সুরভি, সেও আঁচল ভ'রে মুড়ি পায়, সেরখানেক চালও মেলে। ভাগ্যবানের সংসার, রাজা জমিদারের বাড়ী, মা-লক্ষ্মীর অচলা বাস সেখানে, দুনিয়ার অভাব সেখানে ঢুকতে পায় না। নদী শুকিয়েছে, নালা শুকিয়েছে, পুকুর শুকিয়েছে, ডোবা ফেটে কাঠ হয়েছে তাই-বলে গঙ্গায় কি জলের অভাব ? না—সাগর সমুদ্রে চড়া পড়েছে ? কিন্তু এক বাড়ীতে নিত্য তো যাওয়া যায় না। বসে বসেই ভাবছিল নাথু। হঠাৎ এল ওই সর্বনাশী। ফুলমণি এল—হাতে একমুঠো কাঁচা ঘাসপাতা।

সুরভির মুখে ঘাসের মুঠোটি ধরে দিয়ে, দুহাতে তার গলা জড়িয়ে মুখের পাশে মুখ রেখে সুরভিকে বললে—মাঠে গেলাম সাঁয়ো ঘাস তুলতে, সাঁয়ো ঘাস পেলাম না, তোমার জন্মে নিয়ে এলাম খুঁটেখুঁটে এই ঘাস মুঠাটি। খাও তুমি। মধ্যে মধ্যে চোখের পাতা যখন সে তুলছিল তখন নাথুর চোখের উপর পড়ছিল তার দৃষ্টি, যখন চোখের পাতা নামছিল তখন সে চোখে লাগছিল আধখানা চাঁদের নেশা।

মোহিনী মায়া।

নাথু ভুলে গেল—আল্লাওয়ালা পয়গম্বর দয়াময় হরির কাছে কি বলছিল সে সব কথা। পেটে, ভুখের আগুনের দাহ যেন আর বুঝতে পারলে না; সে উঠে গিয়ে ধরলে ফুলমণির হাত।

ফুলমণি উঠে হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়াল, একটু হেসে ঘাড় বেঁকিয়ে তেরচা চোখে চেয়ে বললে—ছি!' ছি!' পাতলা ঠোঁটে তার সেই মিহি হাসির আমেজ।

নাথু বললে—আমাকে নিকা করবে? বল?

ফুলমণি বললে—সেই 'হেঁপো' (হাঁপানী রোগী) রুগী আসছে হেফাজদিকে নিয়ে। এক শো টাকা আর পাঁচ মন চাল আমার দাম। পারবে দিতে?

বলে সে চলে গেল।

মুনির তপস্যা যায়, রাজার রাজত্ব যায়, সে কি তাদের লোকসান মনে হয়? যদি হবে তবে তারা মাতে কেন? নাথুর আপসোস নাই সে কামধেনুকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে ভালো-মায়ের বাড়ীর উঠানে।—অমার মা-সুরভিকে কিনবেন মা?

—বেচবে তুমি? মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

—বেচব মা। মায়ের আমার দশা দেখেন। আমার পেট দেখুন পিঠে গিয়ে ঠেকেছে। আর—বলতে লজ্জা হ'ল নাথুর। বলতে পারলে না ফুলমণির কথা।

—আমি তো দু একবার আগে বলেছি তোমাকে। তখন তো রাজী হও নি। তা বেশ, দিতে যদি চাও—যদি মনে কোন দুঃখ না রেখে দিতে পার—তবেই আমি নিতে পারি।

—এই মা সুরভির গায়ে হাত দিয়ে বলছি মা—'হিয়ে খোলসায় দিব আমি। সেবার আমাকে আড়াই শো টাকা দিতে চেয়েছিলেন—সেই দাম দিবেন।

—সে বাজারে এ বাজারে তফাৎ আছে বাবা। দুর্ভিক্ষের বাজারে দশটাকার জিনিষটা পাঁচ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

স্তব্ধ হয়ে রইল নাথু। একশো টাকা—পাঁচমণ চাল—দু'য়ে হবে

একশো পঞ্চাশ। আড়াই শো টাকার অর্ধেক কত? দুশোর অর্ধেক একশো—পঞ্চাশের অর্ধেক—

মা বললেন—আচ্ছা তাই পাবে তুমি। যখন বলেছি নিজে মুখে তখন তাই দোব। কিন্তু দেখো বাবা, মনে কোন দুঃখ রেখো না।

—না-না-না না। কুনও দুঃখ করব না। কখুনও না। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি মা, না-না-না।

মায়ের ছেলে ইংরিজী পড়া বাবু। তিনি বললেন—খেপছ' না কি? আ-ড়া-ই-শো-টাকা?

—কামধেনু টাকা পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না বাবা।

—কামধেনু? সে আবার কি? ও সব বাজে কথা।

—না-না ওকথা বলতে নেই। জান কি—সন্তান প্রসব না ক'রে গরুটি দুগ্ধবতী হয়েছে।

হেসে বাবুটি যে কথা বলেছিলেন সে কথা আজও কানের কাছে বাজে নাথুর—"ও রবম হয়; ওকে বলে-প্রকৃতির খেয়াল। খবরের কাগজে পড়নি—জোয়ান ছেলে হঠাৎ মেয়ে হয়ে গেল মেয়ে দেখতে দেখতে বেটা ছেলে হয়ে গেল। কিন্তু তারা তো শিখণ্ডী নয়। অর্জুনও নয়।

মা রাগ করে নিজের বাক্স থেকে টাকা বার করে দিয়েছিলেন নাথুকে।

টাকা নিয়ে নাথু বাড়ী ফিরল।

পথে কি কেঁদেছিল?

মনে পড়ে না।

জেলখানায় বসে নাথু ফুলমণির চোখের ছবি আঁকতে আঁকতে কখন ছবি আঁকা ছেড়ে স্থির হয়ে বসে দেওয়ালের দিকে চেয়েছিল। দেওয়াল ভেদ করে, শহর-পথ-মাঠ-ঘাট পেরিয়ে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ সে আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। বিস্মিত হয়ে ভাবছিল সে—কই কান্নার কথা তো মনে পড়ছে না?

মনে পড়ছে বড় বড় ডবডবে দুটি চোখ।

খুব জোরে হেঁটে বাড়ী ফিরেছিল সে।

কোন আপসোস হয় নি তার। ফুলমণিকে নিকা ক'রে সারারাত তাকে নিয়ে জেগেছিল। আপসোস হ'ল মাসখানেক পর! ফুলমণির নেশাটা যেন কমে এসেছে তখন। মাসখানেক পর সে ভালো-মা'য়ের বাড়ীতে এসে দাঁড়াল। ঠুন-ঠুন করে মন্দিরায় আওয়াজ তুললে।

—মা সুরভি মঙ্গল করবেন মা! বাড়ীর বাছাদের দুধে ভাতে রাখবেন। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে। —আহা—। —আহা সুরভি মঙ্গল গান—গোধন মহিমা—। মা গো! গোধন মহিমা—!

মা বললেন—এস, ভাল আছ?

কেঁদে ফেললে নাথু। না মা ভাল নাই।

—কি হ'ল?

—কি হবে মা? পাতকীর জীবনে সুখ থাকে মা?

চুপ করে থাকেন মা। একটু থেমে চোখ মুছে নাথু আবার আরম্ভ করে গান। "ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে দিতে নারে সীমা।" গান শেষ ক'রে ভিক্ষা নিয়ে নাথু বলে—একবার মা-সুরভিকে যে দেখব মা!

—দেখবে বই কি। যাও দেখ। তুমি তো জান সব।

সুরভিকে দেখে নাথু যেন কেমন হয়ে গেল। একমাসেই গায়ে ভ'রে উঠেছে সুরভি। সাদা রোঁয়াগুলি যেন চিক্‌চিক্ করছে রোদের ছটা পেয়ে। কাঙালের ঘরের মেয়ে বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়ে যেমন রূপে জৌলুষে ফেটে পড়ে, তেমনি চেহারা হয়েছে সুরভির। সুরভি ফিরে তাকালে নাথুর দিকে।

সে চোখ দেখে নাথু ভুলে গেল ফুলমণির চোখ।

তার ইচ্ছে হ'ল বুক ফাটিয়ে কাঁদে।

ইচ্ছে হল দড়িটা খুলে সুরভিকে নিয়ে ছুটে পালায়।

হঠাৎ নিজেই সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল। জনহীন মাঠের পথে এসে সে কাঁদলে—খুব জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদলে।

বাড়ী গিয়ে সেদিন ঝগড়া হ'ল ফুলমণির সঙ্গে।

রাত্রে ঘুম হ'ল না। মাঝরাত্রে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়াল। রাত্রের অন্ধকারে গিয়ে নিঃসাড়ে গোয়ালের দরজা খুললে—কিন্তু—। ভয়ে সে ঘেমে উঠল। ফিরে গিয়ে বসল নিজের দাওয়ার উপর। শেষ রাত্রে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন আবার গেল। সেদিন রাত্রে সে মাঠের ধার পর্যন্ত এসে ফিরে গেল।

আবার গেল পরদিন। ভালো-মায়ের বাড়ীর ঝি বললে—ওমা এ যে এবার নিত্যি আসতে লাগল গো!

মা ধমক দিলেন। নাথু লজ্জায় ম'রে গেল। সেদিন সে সুরভিকে দেখে ফিরে মাঠে পুকুর পাড়ে গাছতলায় গামছার খুঁট খুলে মুড়ি বার ক'রে বসে রইল সামনের দিকে চেয়ে। অনেকক্ষণ পরে একমুঠো মুড়ি মুখে পুরে না চিবিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। বহুক্ষণ ধরে মুড়ি খাওয়া শেষ করে,—ঝোলার ভিতর থেকে লাল খেরুয়ার থলিটি বার করলে। নাড়লে চাড়লে। তারপর বাড়ী ফিরল। পথে কাঁদর অর্থাৎ সেই ছোট নদীটির ধারের ঘাটে এসে থমকে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ভেবে সে নদী পার না হয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকল। ঘন জঙ্গল, কত রকমের গাছ। কত রকমের লতা। খুঁজতে লাগল নাথু একটা কিছু।

পটুয়াদের পটের শেষ অংশে আছে ধর্মরাজের দরবার। চিত্রগুপ্ত হিসাব রাখেন পাপ পুণ্যের। রথে চড়ে পুণ্যাত্মা যায় স্বর্গে। ফুল ফলে ভরা বাগান, কুলে কুলে ভরা নদী, মণি মাণিক্যে সাজানো বাড়ীঘর। পাপীরা যায় নরকে। আবছা অন্ধকার। নানা ভয়াবহ দৃশ্য। তার মধ্যে আছে একটি জলভরা কুণ্ড। প্রথমটার জল স্থির। দ্বিতীয়টার সে জলে ঢেউ উঠেছে—নীচে থেকে যেন কিছু ঠেলে উঠেছে। তৃতীয়টায় দেখা যায় জলের উপরে মাথা তুলে উঠেছে সাপ, লিক-লিক করছে তার জিভ। নাথুর মনে হ'ল ঠিক তাই। ঠিক তাই।

গো চিকিৎসক নাথু। ওষুধও চেনে বিষও চেনে। জঙ্গলে খুঁজছিল

সে বিষ। মারাত্মক বিষ। এক পা এগোয় থমকে দাঁড়ায়, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে খোঁজে। ওটা কি? হাঁ। এই যে। জঙ্গল থেকে বেরুল সে সন্ধ্যের মুখে।

ফুলমণির ডবডবে ঢলঢলে চোখে পাতলা বাঁকা ঠোঁটে সেদিন অনেক চুমা খেয়েছিল নাথু। কোন আপসোস হয় নাই তার। এক বিন্দু না।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল নাথু। পাগলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে কয়লাটা। আর সে স্মরণ করতে পারছে না। ভয়ঙ্কর স্মৃতি। উঠে দাঁড়িয়ে গরাদেটা ধরে গরুর মত শব্দ করতে লাগল। প্রায়শ্চিত্তরত গো-হত্যাকারীর মত!

ডিগ্রীর—অর্থাৎ সেলের পাশে পাশে যে ওয়ার্ডার রাউণ্ড দিচ্ছিল—সে ছুটে এল। ওদিক থেকে চীফ ওয়ার্ডার—যার চার্জে তখন জেলখানা—সেও হন্তদন্ত হয়ে এল।—কেয়া হুয়া হ্যায়? কেয়া?

নাথু অকস্মাৎ হাম্বা-হাম্বা করে গরুর ডাক ডাকতে আরম্ভ করেছে। চোখ দুটো রাঙা লাল।

সেলের দরজা খুলে চীফওয়ার্ডার বললে—পানি লে আও। পানি। ঢাল—মাথায় ঢাল।

ফাঁসীর আসামী। আজই হুকুম হয়েছে, এখন দুদিন অনেক রকম করবে ও। মাথায় জল ঢাল। দরকার হলে কুয়ো তলায় নিয়ে যা। জেল হাসপাতালের ডাক্তারকে খবর দে।

মুখের কাছে মুখ এনে নাথু বললে—যে কয়েদীটি তার মাথায় জল ঢালছিল—তাকেই বললে—পঁচিশ টাকা দোব, কাল রাত্রে বাবুদের যে গাইটা মরেছে তার চামড়া খানা ছাড়িয়ে আমাকে দিবি।

কয়েদী বিরক্ত হয়ে বললে—কি বলছ যা' তা?

বাবুদের গাঁয়ের ভাগাড় তো তোর। ওই চামড়াটি আমার চাই।

ওয়ার্ডার এগিয়ে এল। ধমক দিলে—এই!

কম্পাউণ্ডার মেজার গ্লাসে ওষুধ নিয়ে এসে ঢুকল।

দীর্ঘ ঘুমের পর সকালে শান্ত দৃষ্টিতে সেলের দরজার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে উঠে বসল নাথু। এ্যয়, খোদা তায়ালা, রসুলে আল্লা। লা-এলাহা ইল্লাল্লা! হে ভগবান—হে গোবিন্দ! মাফ করো! আমার সকল পাপ, সকল গোনাহ মাফির মঞ্জুর হোক! আমার ফাঁসী হোক। মা সুরভিকে আমি বিষ দিয়ে মেরেছি! কেউ সন্দেহ করে নাই, করবার উপায় ছিল না, গভীর রাত্রে গিয়ে সুরভির ডাবায় বিষ রেখে এসেছিল। নিজে দুদিন যায় নি। তার জন্যে আমার ফাঁসী হোক। এ ছাড়া আর কোন পাপ নাথু করে নাই। মুচিদের কাছে সুরভির চামড়াখানি সে কিনেছিল।—কিনেছিল—তার ইচ্ছা ছিল ওই চামড়াখানি দিয়ে ঘর থেকে সে চলে যাবে। ফকির সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

এল হেফাজদি পাইকার। চামড়ার কারবার করে, মুচিদের কাছে খবর পেয়ে এল। চামড়া কিনেছিস?

হ্যাঁ।

ব্যবসা করছিস নাকি? আমার সঙ্গে কারবার কর। কিনে রাখবি চামড়া—আমি আসব মাঝে মাঝে। আমার ঘোড়া আছে।

হেসেছিল নাথু। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে হেফাজদিকে বলেছিল—শুধু মরা চামড়া কিনবে-না-হাড়-মাস চামড়ার-সব—মানে জ্যান্ত কিনবে? ফুলমণিকে চাই?

দিবি?

হ্যাঁ।

কত?

দু—শো।

তাই।

রাত্রে এস, গাড়ি কিম্বা ডুলি নিয়ে।

ফুলমণিকে বেচে সেই টাকায় তার চামড়ার ব্যবসা। ফুলমণির পাপ। ফুলমণির জন্মে সে মহাপাপ করেছে। সকল পাপের মূল ফুলমণি। কিন্তু তবু—ফুলমণির জন্মে সে কাঁদে। কতদিন কেঁদেছে।

বেশ চলছিল। টাকা পয়সা অনেক হয়েছিল তার। দেশ গ্রাম ছেড়ে বাজারে বড় রেলজংসনে আস্তানা গড়েছিল। ডাঁই করে রাখত চামড়া। চালান দিত এখানে ওখানে। শান্ত-শিষ্ট-মানুষ। রোজ সকালে উঠে বলত'—আমার গোনাহ মাফির মঞ্জুর হোক আল্লা! পাপ খণ্ডন কর ভগবান। ধীরে ধীরে সব সে ভুলেও আসছিল।

হঠাৎ। হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে গেল।

একটা শীর্ণ লোক একগাছা দড়ি হাতে এসে দাঁড়িয়ে গরুর মত ডাকতে লাগল—হাম্বা—এ্যা-ম-বা! গরু-মারা! গোহত্যাকারী! লোকটা গোহত্যা করেছে,—তাই ওই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে—মানুষের ভাষার বদলে—গরুর ভাষায়—মানুষের কাছে নিজের পাপের স্বীকারোক্তি জানিয়ে—সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। সুরভি মঙ্গল গান ছিল নাথুর একদিনের পেশা। সে জানে সব জানে।

লোকটা গরুর ডাক ডেকে দোরে দাঁড়াতেই, নাথু চমকে উঠল।

লোকটা আবার ডাকলে—এ্যা-ম্-বা—!

স্থান কাল পাত্র সব গোলমাল হয়ে গেল নাথুর। মুহূর্তে পাগল হয়ে গেল সে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার উপর। বহুকষ্টে লোক জনে মিলে নাথুকে টেনে তুললে। লোকটার বুকের উপর বসে দুই হাতে সে তার গলাটা নির্মম ভাবে চেপে ধরেছিল; লোকটার জিভ বেরিয়ে এসেছে, চোখ দুটো হয়ে উঠেছে দুটো রক্তের ড্যালা। মরে গিয়েছে লোকটা।

ফাঁসিতে তার দুঃখ নাই। গোহত্যাকারীকে মেরে ফাঁসি যেতে কোন আক্ষেপ নাই তার। তবে ফাঁসিটা গরুর দাঁতে হলেই তার আর কোন ক্ষেদ থাকত না।

লা ইলাহা ইল্লাল্লা—রুসুল আল্লা মহম্মদ, হে ভগবান, মা সুরভি—তোমাদের মরজি সব।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সে এপাশ ওপাশ চেয়ে কালকের কয়লাটা তুলে নিল। কি করবে সে এ ক'দিন? কি নিয়ে থাকবে? কাল দুটো চোখ এঁকেছিল। সে দুটোর দিকে তাকিয়ে আজ সে চমকে উঠল! ফুলমণির চোখ ত হয় নাই। এ যে গরুর চোখ হয়েছে। সুরভির চোখ! তা বেশ হয়েছে। ওরই পাশে আজ ফুলমণির ডবডবে ঢলঢলে চোখ দুটি সে আঁকবে। ও চোখের নেশা বেঁচে থাকতে ছাড়তে পারবে না নাথু।

ধান-কানা

ননী ভৌমিক

তেরশ পঞ্চাশ গেল। ধানকাটার সময় লোক পাওয়া যায় নি। এমন কি পশ্চিম থেকে পূর্ণিয়া কাটিহার থেকেও লোক এল না। দেশের চারিদিকে রাস্তাঘাট হচ্ছে, ফৌজে কুলী খেটে মজুরী মিলছে ছাপান নোটে—তাই টান পড়ল লোকের। একান্ন সালও গেল। কিন্তু তৃতীয় বছরে, ধানকাটার সময় লোক এল আবার। সৈন্যদের জন্যে রাস্তা তৈরীর প্রয়োজন এখন নেই আর। এরোড্রমের জমিতে কুলীর দরকার নেই। আসামের জঙ্গল থেকে লড়াই-খালাস মজুররা ফিরে এসেছে ম্যালেরিয়া নিয়ে।

ধানকাটার সময় বড়ো বড়ো জোতদারের খালানে এসে জুটল বেহারী জোত-মজুররা। কুটোকাটা নিয়ে আগুন জ্বালাল শীত এড়াতে। গাছের তলে রান্না ক'রে খেয়ে দেয়ে কালিপড়া মাটির হাঁড়ি পাতিল বেঁধে রাখল আমগাছের ডালে।

আর কাজ পেল সবাই—ধানকাটার কাজ।

বেহারী লোকজনের সঙ্গে কোথা থেকে ফিরে এল আঁধারু উত্তরবঙ্গে তার এই নিজের জেলাতেই। একটা ছেঁড়া ঝুলিঝুলি কোট গায়ে দিয়েছে ও; গায়ের আন্দাজে কোটটা বড়ো—পিঠ আর ঘাড়ের জায়গাটা ছিঁড়ে গিয়ে আরো খানিকটা বড় দেখাচ্ছে। কোটের নিচে ময়লা চাদর গায়ে জড়ানো; তারই একটা ভাঁজ তল থেকে তুলে এনে কান আর মাথা ঢেকেছে! যে কাপড়টুকু নেংটি করে পরেছে তা কোটের লম্বা ঝুল পেরিয়ে উরুর নিচে নামেনি। শীতে আর ধুলোয় হাতে পায়ে একটা ফাটা ফাটা

ভাব এসেছে, গায়ের স্বাভাবিক বাদামী রঙটা মিশ কালো হ'য়ে গেছে সেখানে।

উত্তর বঙ্গের 'পোলিয়া' জাতের মানুষ। সাঁওতাল নয়, তা বোঝা যাবে শুধু ওর অপরিচ্ছন্ন বেশভূষায়; মুখের রঙটা হাতপায়ের মতো অতো কালো নয়; বাঁকা ভাবে বসান লম্বা ধাঁচের চোখ; ঠোঁটের ওপর পাঁশুটে রঙের অল্প একটু মোচ।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা মেরামৎ করার কাজে জনচারেক বুড়ো জোয়ান বেহারী মজুর জোগাড় করা গেছে বহু কষ্টে। আরো লোক চাই। তাই বেশি করেই মজুরী কবুল করেন ঠিকাদার বাবু। একহাতে সাইকেল আর এক হাতে আঁধারুকে চেপে ধরে টেনে নিয়ে এলেন হাফ প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোকটি—নে, খেটে দে; কোদাল চালিয়ে হাট পর্য্যন্ত এই রাস্তাটা ঠিক করে দে বাপু।

আঁধারু তবু দাঁড়িয়ে থাকে। সারারাত গাছতলায় প'ড়ে থেকে শীত করেছে বলে এখনো অমনি কাঠের মতো অনড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, না আদপে লোকটা একটা জরদ্গব বোঝা যায় না।

কি, খাটবি কি খাটবি না—সাইকেল হাতে করে ঠিকাদার বাবু মরীয়া হ'য়ে জিজ্ঞেস করেন।

কেনে খাটিম না? তবে কতো দিগার সেইটা ক'হে দাও—

পিঠের ওপর লাঠিতে বাঁধা লম্বাটে পোঁটলাটা নড়িয়ে আঁধরু একটু কুঁজো হ'য়ে দাঁড়ায়।

ঐ ঐ একটাকা। কজন হ'লি পাঁচজন? রাস্তাটা আধাআধি শেষ ক'রে ফেলতে হবে কিন্তু। সন্ধে বেলা এসে মিটিয়ে দেব—

কাজ সুরু করবার আগে অন্য চারজন বেহারী মজুর অলস হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার প্রতিবাদ করল।

নাই হোবে বাবু—অতোখানি রাস্তা ঠিক নাই হোবে—

হবে, হবে—ঠিকাদার বাবু সাইকেলে চেপে চলে যান।

লাঠির ডগায় বাঁধা পোঁটলাটা থেকে আঁধারু একটা কোদাল বার করে। ছেঁড়া কোটটা খুলে নেয়।

হবে গো লাগাও—অসন্তুষ্ট ভাবে বিড়বিড় করে বকতে বকতে ঠিক হ'য়ে নেয় অন্য কয়েকজনও।

তারপর কোদাল চালায় ঝপ্‌ঝপ্ করে; মাটি তুলে দেয় রাস্তায়। কেন না পুরো একটাকা করে মজুরী কম নয়।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা সোজা চলে গেছে সেতাবগঞ্জের ঘাটে।

দুপাশে শুয়ে-পড়া পাকা ধানখেতের ওপর রোদ্দুর পড়েছে। শালিখ আর চড়ুই পাখির ঝাঁক তার ভেতর ঠোকর মারছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সরষে ক্ষেতে শুকিয়ে এসেছে হল্‌দে ফুলগুলো। খেঁসারী কলাইয়ের শুকনো ঝাড়গুলো আলগা বাতাসে খস্ খস্ করে নড়ে উঠছে। চারিদিককার খানিকটা মেটে বাদামী শুকনো আবহাওয়ায় তামাকের চারাগুলো হঠাৎ বড়ো বেশি সবুজ দেখায়।

মনের ভেতর একটা শক্ত জায়গা উঁচু হ'য়ে ওঠে। কোদাল চালান থামিয়ে গল্প করতে ইচ্ছে করে।

রানিয়াগঞ্জ থানার দিকে ধানী জমিতে আখচাষ দেয় মানুষ; বলে, ধান গাড়লে পেটে খাবো; আখ দিলে পয়সা আসবে—আঁধারু ধান খেতের দিকে তাকিয়ে বলে।

আধবুড়ো শক্ত চেহরার বেহারী মানুষটা অন্যকথা ভাবে: লড়াই শেষ হ'ল তো বহুৎ মানুষ ফিরছে ঘরে। ভাবছে, কি ধানকাটার জন্যে লোক লাগবে তো এক-এক করে এদিকে এসে যাচ্ছে সবাই।

আনিয়াগঞ্জ থানার দুই নম্বর রিউনিয়ন দুগ্‌াপুর; ওতি হামার বাড়ি—

আঁধারু বলে।

হাটের পথে খালি গরুর গাড়ীগুলো সারি বেঁধে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। পাতলা শাদা ধুলো উড়ে উড়ে গিয়ে জমছে দু'পাশের আসাম লতার গায়ে। ধুলো খেয়ে খেয়ে পাতা-ঝোঁপের ওপরটা পাংশুটে হ'য়ে গেছে, তলের দিকটা এখনও মেটে সবুজ। বেঁটে বেঁটে ঘোড়ায় চেপে মাঝে মাঝে খালি বস্তা বেঁধে নিয়ে লাল সবুজ আলোয়ান গায়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে পাইকাররা। একটা নেউল দুর দুর করে রাস্তা থেকে নেমে ছুটে পালল।

কাঁচা পাতায় তামাক মুড়ে আগুন ধরিয়ে বেহারী লোকটা কড়া ধোঁয়া টানে।

আঁধারু বললে—দুটো ধান কাটা হয়ে গেল তো এই আর একটা ধান কাটা এল!

প্রায় একই রকম চিন্তা করে আধবুড়ো লোকটা—আমার ঐ ব্যাটা দেশে ফিরতে বড়ো নারাজ। বলে, যেখানে কাজ সেখানে যাবো; নয়ত আথকলে কাজ নেবো।

আচমকা প্রশ্ন করে আঁধারু। বিষণ্ণ ভাবে বলে—দেশে জমি আছে তোমার?

চট করে উত্তর দেয় না আধবুড়ো লোকটা। কড়া ধোঁয়া টেনে গলার শিরা ফুলে ওঠে। বার কয়েক থুথু ফেলে অন্য দিকে তাকায়। তারপর বলে—না, জমি নেই। কিন্তু একটা নিয়ম আছে কি জমিদারের ক্ষেতে খাটলে ফসলের একটা ভাগ পাওয়া যায়। তো সেটাও জমি চাষ করাই তো হ'ল?

তারপর আর গল্প করতে ইচ্ছা করে না। অকারণে ভার হয়ে আসে বুকের ভেতরটা। পরিশ্রম করলে এই যন্ত্রণা-বোধটা টের পাওয়া যাবে না।

কোদাল চালাতে চালাতে এক সময় কোমরে হাত দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ায় আঁধারু—এই কোদাল চালাও, এর খাটুনীটা একরকম। আবার ধান কাটো, তো সে খাটুনীটা অন্যরকম!

অন্যরকম—নিজের মধ্যে ডুবে থেকে সায় দেয় লোকটা।

বিকেল বেলা হাফপ্যাণ্ট পরা লোকটা এল। মাটি চাপান রাস্তাটা দেখে সন্তুষ্ট হয় নি, এই ভাবটা প্রকাশ করার চেষ্টা করল নানারকমে। তারপর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বললে—কালকে এরচেয়েও ভাল করে কাজ করতে হবে।

কিন্তু পরের দিন সকালে ছেঁড়া কোটটা গা থেকে খুললো না আঁধারু। চ্যাপ্টা পুঁটলিটায় কোদালটা ঢুকিয়ে নিয়ে লাঠি সমেত ঘাড়ে করে হাঁটতে সুরু করল রাস্তা দিয়ে—না, খাটবেনা ও।

কিন্তু মজুরীটা খানিক বেশী ছিল কি ছিল না?

থাকুক—হঠাৎ ঝগড়া করার ঝোঁক আসে আঁধারুর। রাস্তার উপর ফিরে দাঁড়িয়ে হাত টান করে চিৎকার করে—মানুষটা কহছে কি খাটি যাও বারে। নাই খাটিম। পল্টনে কেমন মাটি কাটিনম কি নাই কাটিনম সেইটা কহো। তো ফিরি আসিনম্ কেনে সেইটা কহো—

আধবুড়ো লোকটা ঝগড়া করে না। কেমন একটু ঈর্ষাভরা চোখে তাকিয়ে থাকে; কিন্তু কি করবে আঁধারু সেইটা ব'লে যাক?—কেনে, ধান কাটিম্!

মাটি কাটার চেয়ে ধান কাটতে ভালো লাগবে। ভোর রাতের শীতে ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে হিমে ভেজা ধানের গোছায় হাত দিয়ে অস্পষ্ট সুখ পাওয়া যাবে। আর তা শীতের জন্য নয়—অন্য কি একটা আশ্চর্য স্পর্শের জন্যে।

সব ধান কাটা হয়নি এখনও। একটা চওড়া নীচু কাঁদরের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোভীর মত তাকায় আঁধারু—ধান তো এলায় কাটিবা' বাকি আছে?

আছে—ধান কাটতে কাটতেই নিচু হ'য়ে একটা লোক উত্তর দেয়।

ঘাড় থেকে লাঠিতে বাঁধা লম্বাটে পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে লোভীর মতো নিঃশব্দে হাসে আঁধারু—ধান কাটার জন্যে একটা দুটো লোক তাহলে দরকার হতে পারে?

লোকটার মুখ কঠিন হ'য়ে আসে—কালি জোতদারের সাত বিঘে জমি 'আধি' করছি আমি। তো খাওয়া-পরা দিয়ে একটা মানুষ রাখলে আমার খালানে ক'বিশ ধান উঠবে?

কিন্তু ধরো এতো বড় গাঁ—তো কোন লোক বুড়ো হয়ে গেছে, কি অসুখে পড়েছে, কি একলা সমস্ত ধান কেটে তুলতে পারবে না—অনেক জমি আছে তার—তেমন কোনো লোকের তো দুটো চারটে পাইট দরকার হতে পারে?

আধিয়ারটার চোখ হঠাৎ নরম হয়ে আসে। বিলাপের মতো ক'রে বলে—হামার গাঁওত্ নাই। হামার গাঁওত্ তেমন চাষী নাই একটাও।

না, এ গাঁয়ে কাজ মিলবে না। তবু ভালো লাগে। তামাকের

ক্ষেত থেকে একদলা মাটি তুলে নিয়ে আঁধারু পরখ করে ঝানু চাষীর মতো। তামাকের চারাগুলো লক্ষ্য করে উঁচু হয়ে ব'সে: তেমন তাজা হয়নি। সারি সারি চারার মাঝে আলগা চাষ দিতে হয়েছে নতুন করে।

এই মাঘ মাসে একটা বৃষ্টি হ'লে এতদিন এতটা বড়ো হয়ে যেত চারাগুলো—গোড়ালির ওপর হাত দিয়ে আয়তন বোঝাতে হয়।

ঘাড় বেঁকিয়ে হুকো টানতে টানতে ক্ষেতের মালিক সায় দেয়—উঠত!

আলগা চাষের মাটিটা-আঙুল দিয়ে নাড়ে আঁধারু—এই চাষটা দেয়া হয়েছে তো গাছ ঠিক হ'য়ে যাবে এবার—

মাঘ মাসে এখনও বৃষ্টি হ'ল না! অস্পষ্ট আশংকায় মন্তব্য করে মানুষটা।

অদ্ভুত ভালো সেই আশংকা। সারা বছর ধরে একটা মৃদু মাটির স্বপ্ন। আমন উঠে গেলে রবিশস্য। 'ভাদই' উঠে গেলে পাট। পাট উঠে গেলে সরষে—প্রত্যেকটি ফসলে ছড়িয়ে আছে নতুন ফোটা অঙ্কুরের মতো প্রত্যাশিত বিস্ময়।

পোঁটলাটা ঘাড়ে করে আবার উঠে দাঁড়ায় আঁধারু, তবু চলে যেতে পারে না। নিকোনো তক্‌তকে খালানে মড়াই বাঁধা হয়েছে। উঁচু উঁচু মড়াইয়ের ওপর, শীষ সমেত পাকা ধান সাজিয়ে দেয়া হয়েছে মুকুটের মতো। নোলক পরা, বুকে কাপড় জড়ানো চাষীবউ ধানের গোছা আছাড় মেরে মেরে ঝাড়াই করছে। গুঁড়ো গুঁড়ো খড় উড়ে পড়েছে তার সারা গায়ে।

কিন্তু মেয়েটিকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে না।

—তোমার খামারেই আমি থাকব আজ রাতটা?

—ভালো কথা।

সন্ধে বেলা ধানকাটার শেষে পেট পুরে খেতে হবে। মোটা মোটা লাল লাল ভাত মটর শাকের ঝোলের সঙ্গে দলাপাকিয়ে খেয়ে তৃপ্ত দেখায় সবাইকে। তাই খালানে এসে কাঁথা জড়িয়ে বসে। পাটশলা পুড়িয়ে আগুন জ্বালায়। হাত পা সেঁকে, আর গল্প করে।

দূর থেকে আরও একটা গাঁয়ের মাদলের শব্দ ভেসে আসে, সাঁওতালী মাদল।

খুব নাচগান লাগিয়েছে ওরা—

কালি জোতদার খবর পেয়ে গিয়েছিল। তো ওরা তীর-ধনুক নিয়ে ধান আগলে বসে রইল। ফিরে এসেছে কালি জোতদার—কিছু বলে নি—

ওই গাঁয়ের সাঁওতাল আধিয়াররা ধান কেটে নিজেদের খালানে তুলেছে; জোতদারকে সাফ বলে দিয়েছে যে ধান ওরা নিজেরাই ভাগ করবে। সুদ দেবে না, আবোয়াব দেবে না—তারই গল্প। অমনি সাহস আর খানিকটা বোকামি যাদের নেই, তারা মুগ্ধ হ'য়ে শোনে।

কালি জোতদার ছাড়বে না। থানা পুলিশ করবে। সে নাকি দেখেছে, কালি জোতদার কোর্টে বোতাম লাগিয়ে নতুন কেনা লাল-সাদা টাট্টু ঘোড়াটায় চেপে থানা ব'লে রওনা দিয়েছে—

সারা বছর ধরে ধান গাছ বড় করে তুলে, সেই ধান ফলানোর গল্প। নতুন জ্বালানী চাপিয়ে ফুঁ দেয় আগুনে; লাল আভায় চিক্ চিক্ করে চোখ।

সাঁওতালরা বিষ মাখিয়ে রেখেছে তীরের ফলায়—

কি ভেবে আঁধারু জিজ্ঞেস করে—আইনটা তাহ'লে কার পক্ষে?

জোতদারের পক্ষে। মোকদ্দমায় ডিগ্রি হবে ওর। কিন্তু সাঁওতালরা তবু বলে, নাই ছাড়বো ধান—

কে একজন কীর্ত্তনের গান ধরে। অন্য সবাই চুপ করে যায়। চুপ ক'রেও কিন্তু ভাবে ধান কেটে তোলার কথাই। ইংরেজী জানা উকিল আমলারা যে সব গোপন শক্তির কথা জানে—সেই আইনের কথা। অনেকক্ষণ গানের পর একজন বুড়ো চাষী বিষণ্ণভাবে মাথা ঝাঁকায়—গোটা গাঁকেই উচ্ছেদ করবে কালি জোতদার। নোতুন লোককে আধি দেবে—

ঘুম আসে না। বিচালি বিছিয়ে খালানে শুয়ে রইল আঁধারু। ধান খেতে আর নিচু জায়গায় ভিজে কাপড়ের মতো পুরু কুয়াসা জমেছে।

সকাল বেলা উঠে আঁধারু চলে যাবে অন্য জায়গায় কাজের সন্ধানে। অন্য লোকেরা যাবে ধান কাটতে। আগুন জালিয়ে নেংটি-পরা মনুষগুলো রাত আরো একটু ফর্সা হওয়ার অপেক্ষা করে।

আমার পাঁচ বিঘা জমি ছিল, তো বিচে দিলাম। অকালে দুটো ছাওয়াল মরে গেল, তো বিচে দিলাম—আঁধারু উৎসুক ভাবে জানাল, কেউ উত্তর দিল না।

বিচে দিলে জমি ফিরিবা নয়?—উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করে আঁধারু। যা জিজ্ঞেসা করেছে তা ছাড়াও হয়তো, আরো কি জানতে চায়।

ফিরিবা' নয়—বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দেয় বুড়ো চাষীটা।

এক টুকরো জমি। সারা বছর কেটে তাতে ফসল ফলানো। সেই রক্ষা করার জন্য রক্তাক্ত লড়াই—একটা ঝাপসা স্বপ্ন আবৃত ক'রে ফেলেছে আঁধারুকে। অসুস্থের মত ধান কাটার কাজ খুঁজে বেড়ায় গাঁ-ছাড়া মানুষটা।

—ধান তো এলায় কাটিবা বাকি আছে?

পনের বিশটে মৌজে পেরিয়ে একটা গাঁয়ে ধান কাটা হয়নি এখনও। ক্ষেতে ক্ষেতে শুয়ে আছে পাকা সোনা হলুদ ধান। গরু বাছুর পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে।

—আছে না? আগৎ কাটিবা দিছে জমিদার? লম্বা পাকানো চেহারা একজন বুড়ো চাষী পাল্টা প্রশ্ন করল আঁধারুকে।

তাই সেখানে থেকে গেল আঁধারু। ধান কাটল ভোর রাত্রি থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত। ছোট ছোট ন্যাংটা ছেলেরা থালায় করে ভাত নিয়ে এল মাঠে। মেয়েরা কাটা ধানগাছের শীষ মাথায় বয়ে নিয়ে গেল খামারে। দুপুরে বাঁশের কঞ্চি পুতে ছেঁড়া কাপড় টাঙ্গিয়ে সেই ছায়ায় শুইয়ে রেখে দিল কোলের ছেলেদের।

অস্পষ্টভাবে মাথা ঝিম ঝিম করে আঁধারুর। ধান কাটতে কাটতে কেমন একটা গোঁ এসে গেছে ওর—নিহত খরগোসের বুক আচড়ে রক্ত খাওয়া সুরু করলে খটাসের সমস্ত শরীর যেমন টান টান হয়ে ওঠে

তেমনি। শক্ত দুই পা ফাঁক করে নিচু হয়ে আলগা ধানের গোছা টেনে ধরছে বাঁহাতে—ঘসা লেগে গরম হ'য়ে উঠেছে কাস্তে।

—ছ'বিশ ধান পাকা!

—ছ বিশ!

সন্ধেবেলা আগুন জ্বালিয়ে গান গল্প। আঁধারু বলে—আনিয়াগঞ্জ থানার দুই লম্বর রিউনিয়ন দুগ্‌গাপুর—উতি আমার বাড়ী।

থালায় করে পান সুপুরি আর চুণ নিয়ে আসে মণ্ডলের ব্যাটার বউ। বাঁশের ছোট চৌকিটা টেনে রসিকতা করে আঁধারুর সঙ্গে—খাটে বসি খাও ভাত!

রসিকতা করে হাসে আর সারাদিন খাটুনির পর ক্লান্ত দেখায় না চাষী বৌ-কে!

গল্প করতে করতে আঁধারু বলে—আমার কাছে দু'কুড়ি তিন কুড়ি টাকা আছে। তা সেতাবগঞ্জ হাটে গরু বিক্রি হচ্ছে কি দরে?

—সাত কুড়ি আট কুড়ি।

কি রকম নিভে যায় আঁধারু, কথা বলে না। অন্যেরা গল্প করে।

—এখন তো ধান কাটা হয়ে যাচ্ছে; চাষীরা বলবে যাই গরু কিনি এক জোড়া; গিরস্তি করতে হবে না?

—তো গরুর দাম সাত কুড়ি, আট কুড়ি। পশ্চিমা গরু, চাই দেশী গরু।

—ধানের দর নামি গিছে।

—নামি গিছে তো চাষী মরিল্; উঠবি তো খাবি জোতদার!

—তো চাষী মরিল্!

গল্প শেষ করে শুয়ে পড়ে দু চারজন। পাটকাটির আগুন পুড়ে যায় ঝপ ঝপ করে। শাদা হালকা ছাই উড়ে যায় ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

শোবার আগে একটু ইতস্তত করে আবার জিজ্ঞেস করে আঁধারু —কিন্তু শস্তা হ'তে পারে? এই হাট তার আগের হাটেই গিয়েছিল লোকটা। এই হাটে হয়ত শস্তা হতে পারে।

—কি ?

—শস্তা হবার নয়, শক্ত ভাবে মাথা ঝাঁকায় লোকটা।

বিচালির ভেতর খুঁশে খুঁশে শুয়ে থেকে ঘুম আসে না। একটা 'খোকর' গায়ে দিয়ে হঠাৎ এক তরফা বকতে স্থরু করে আঁধারু—পাঁচ বিঘা জমি আছিল হামার। পালি আসিনম্ কিন্তু জমিটা বিচিলম্ নাই। কেনে ? না জমি বিচি দাও তো ফিরৎ নাই। তাই বন্ধক থুছি জমি। এলায় তো ফির গিরস্তি করা লাগিবে……

মিথ্যে বকে চলে আঁধারু আপন মনে।

সপ্তাহখানেক ধরে ধান কেটেছে আঁধারু। মুখের ওপর থেকে দিনমজুরদের স্বাভাবিক খড়ি খড়ি ভাবটা কেটে গিয়ে কেমন একটা শ্যাওলার মতো মসৃণতা এসেছে। বাঁকাভাবে বসানো চোখ দুটোতে ধানের কোনের মতো একটা স্বপ্ন শক্ত হয়ে উঠেছে কেমনধারা।

আমার পাওনা মিটিয়ে দাও—তেমনি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে আঁধারু বললে হঠাৎ।

কিন্তু ধান ঝাড়াই হল না, মাড়াই হল না এখন চলে গেলে চলবে কেন ?

ধান দিয়ে দাও, নয়তো টাকা মিটিয়ে দাও, ঝোঁক ধরল আঁধারু, কেনে, হামার গিরস্তি করা লাগে কি না লাগে ? তু'বছর রাস্তা কটিনম্ কি না কাটিনম্ ? তো ফিরি আসিনম্ কেনে সেইটা কহো—

অবুঝ লোকটা তার পাওনা ধান যা পারল আদায় করে বেচে দিয়ে গেল জোতদারের গোলায়। নিজের তৈরী মিথ্যাকেই কখন বিশ্বাস করে ফেলেছে।

—কুণ্ঠে যাছো বা-রে ?

পিঠে ছেলে বেঁধে ইউনিয়ন বোর্ডের ভাঙা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাষী বৌটা ডাকল আঁধারুকে। মুখে তেল মেখেছে, খাড়ে কাচা কাপড় পড়েছে। হাটে বেগুন বেচতে যেতে মেয়েটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছে আঁধারুকে দেখে।

—চলি যাছ কেনে ?

[illegible] খুশী হয়ে উঠে আঁধারু। কৈফিয়ৎ দেবার মতো করে বলে হার‍্যামার‍্যা চারো পাক দেখি ঠিক করিনম্ কি গরু এলায় কিনিম্ না !

ত্রাণকর্তা

নবেন্দু ঘোষ

দুঃসংবাদটা এ পাড়াতেও পৌঁছেচে। দাঙ্গার দুঃসংবাদ।

থম্ থম্ করছে রাস্তাঘাট। লোকজনের চলাচল নেই, নেড়ী কুকুরগুলো পর্য্যন্ত আজ অদৃশ্য। কেবল গলির মুখে মুখে দুঃসাহসী ছেলে ছোক্‌রারা সিগারেট টানতে টানতে জটলা পাকাচ্ছে।

ও পাড়ায় আগুন জ্বলছে, রক্তের ধারাতে কাটা মাথাগুলো ছিট্‌কে পড়েছে, ষোড়শী কুমারীদের স্তন কর্ত্তিত হচ্ছে, সুকুমার শিশুরা সিমেন্টের মেঝেতে আছ্‌ড়ে পড়ছে, নরকের ঘোর-কালো অন্ধকারে আজ ও পাড়ায় শয়তানের অভিষেক হচ্ছে। সে সংবাদ ভেসে এসেছে এ পাড়ায়, মৃদু বাতাসের ধমনী বেয়ে সেই সব ভয়াবহ ঘটনাবলী এখন পল্লবিত হয়ে এ পাড়ায় এসে থেমেছে।

সবাই চোখে অন্ধকার দেখছে। কোথা থেকে যেন দুরন্ত ভয়ের বন্যা এসে তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ভয়, অব্যক্ত ভয়। ভয়ে বুকের মাঝে দুর দুর করে উঠ্‌ছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখের জ্যোতি স্তিমিত হয়ে আসছে। ভয়, নিদারুণ ভয়। ভয়ে বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে, হাত পা অসাড় হয়ে পড়ছে, ভীড় করে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে। ভয়, কুৎসিত ভয়। ভয়ে সংসার বিস্বাদ মনে হচ্ছে, পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, হার্ট ফেল করে মরে যাবার সাধ হচ্ছে।

মেয়েরা সব চুপ্ চাপ্ কাজ করে যাচ্ছে। আজ আর বেশী পদ নয়, শুধু ভাতে ভাত, ব্যস্। কেবল ছেলেমেয়েগুলো বোঝে না বেশী কিছু। মাঝে মাঝে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে, দুরদার করে সশব্দে

সিঁড়ি দিয়ে চলাফেরা করে, নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি করে। কিন্তু সহসা প্রহরীর মত বয়স্কেরা গর্জ্জে ওঠে, বলে, "চুপ্-চেঁচাবি তো থাপ্পড় মেরে মাথা উড়িয়ে দেব—"

অথচ নিজেদের মাথা বাঁচাবার মত কোনো আশাই খুঁজে পাচ্ছে না তারা।

দরজা বন্ধ করে যেখানে সেখানে পরামর্শ চলছে। কি করা যায়, কি করা যায়? শুধু দুঃসংবাদ নয়, দারুণ দুঃসংবাদ এসেছে যে আজ রাতেই নাকি ও পাড়ার ওরা এসে এ পাড়া আক্রমণ করবে। মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমেছে সে খবর পেয়ে। কি করা যায়, কি করে বাঁচা যায়?

এপাড়ার নেতৃস্থানীয় ব্যারিষ্টার মিঃ বোসের বাড়ী তখন আলোড়িত।

ছেলে অরুণ চুপি চুপি বেরিয়ে যাবার ফিকিরে ছিল। ঘরের মধ্যে বসে থাকা কি পোষায় বেশীক্ষণ?

কিন্তু মিঃ বোস আজ চারদিকে নজর রেখেছেন, কার সাধ্য যে তাঁর লঙ্কাপুরীতে কেউ প্রবেশ করবে বা সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে।

"কোথায় যাচ্ছ তুমি?" তিনি গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

"এমনি—একটু দেখ্তে।"

"এম্নি! কোনো দরকার নেই। তোমার কি জানা নেই যে কি হচ্ছে এই সহরের বুকে!—যাও, ঘরে গিয়ে বোস।"

অরুণ ফিরে গেল ঘরে।

কিন্তু মেয়েরা বিপদে ফেলল মিঃ বোসকে।

মেয়ে রুবী এসে সামনে দাঁড়াল। দুশ্চিন্তায় তার ডাগর ডাগর চোখের নীচে কালো ছায়া পড়েছে, কোঁকড়ানো চুলের অরণ্যে নেমেছে বিশৃঙ্খলা, দুধে-আল্তার দেহবর্ণে দেখা যাচ্ছে একটা পাণ্ডুর প্রলেপ। তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে, ভয় এসে বাসা বেঁধেছে তার মনে। সিনেমা, পার্টি আর পিক্নিকে যাওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে, পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে গিয়ে মধুপানের ভ্রমরীবৃত্তি আজ হঠাৎ যেন কর্পূরের মত উড়ে গিয়েছে রুবীর মন থেকে।

"বাবা—"

"কি বলছ ?"

"মেশোমশাইয়ের বাড়ীতে আমাদের পৌছে দাও।—"

মানে ভবানীপুর। যেখানে হিন্দুরা আছে সংখ্যায় অগণন, যেখানে এখনো হয়ত ক্রেপ্‌ সিল্কের সাড়ীটা পরে, বেণী দুলিয়ে ঘুরে বেড়ান যায়।

মিঃ বোস মাথা নাড়লেন অসহায়ভাবে, "মেশোমশায়ের বাড়ী! এখন—! অসম্ভব। রাস্তা দিয়ে না যাচ্ছে একটা লোক, না চলছে একটা গাড়ী। ঘন ঘন এলাকা পার হতে হবে, মড়া আর রক্তের মাঝখান দিয়ে গাড়ী চালাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা অতর্কিত আক্রমণ— যা বাঁচাবার জন্য তোমরা ভবানীপুর যেতে চাইচ সেই প্রাণই যাবে মাঝ পথে। অসম্ভব—বাজে কথা না বলে ঘরে গিয়ে বসে থাকোগে রুবী—"

কিন্তু কি করে বসে থাকে রুবী? ওর ভয় করছে। মাঝেমাঝে কোলাহল ভেসে আসছে দূর থেকে। বিশ্রী কোলাহল। কাল রাতে পূবদিকের আকাশে রক্তবর্ণ আলোক-সমারোহ দেখেছে সে। কানে এসেছে নানা পাশবিকতার বীভৎস কাহিনী। আর সব কিছু ছাপ রেখে গেছে মস্তিষ্কের কোটরে—দপ্‌দপ্‌ করে উঠ্‌ছে সেই সব নানা কথার বোঝা। তার দুধে-আল্‌তার দেহবর্ণের নীচে যে পাৎলা পাৎলা নীলচে শিরাগুলি লাফাচ্ছে তাদের দেখলেই তার বিক্ষুব্ধ, ভয়ার্ত্ত মনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

অরুণ আর রুবীকে ধমক দিলে চলবে। কিন্তু মিসেস বোস? দেহভারে আনত বিপজ্জনক দেহটাকে নিয়ে যাঁর মনটা সারাক্ষণ তিক্ত হয়ে আছে তাঁর মনে এই দাঙ্গার দুঃসংবাদ যে আরো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরকের সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে আর কারো সন্দেহ থাকলেও মিঃ বোসের নেই।

তাই মিসেস বোস এসে যখন সামনে দাঁড়ালেন তখন মিঃ বোস সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে মিসেসকে ধমক দিতে গেলে উল্‌টো ধমকই খেতে হবে তাঁকে।

"শুনছ—আমি আর পারছি না—এই suspense—এই danger—এ অসহ্য—"

"কিন্তু কি করি—Tell me, what am I to do dear !" মিঃ বোস ক্ষীণকণ্ঠে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন।

"কিছু একটা কর—for Heaven's sake, চুপ্ করে বসে থেকো না—"

"চুপ করে আমি বসে নেই। আমি ভাবছি। তাছাড়া দুটো রাইফেল আছে, পাঁচশ' কার্তুজ আছে, দারোয়ান বেয়াড়া, চাকর আর ড্রাইভার আছে—তোমার অত ভয় পাবার কি আছে ?"

মিসেস বোস সোফার উপর কাৎ হয়ে পড়লেন, তাঁর দুটো চোখের নীলাভ তারায় একটু স্ফুলিঙ্গ-দীপ্তি হঠাৎ ঝিক্‌মিক্ করে উঠল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি বললেন, "তোমার ও ফিরিস্তি থামাও, please—হাজার হাজার লোকের সামনে কাগজের মত উড়ে যাবে তোমার সমস্ত জারিজুরি—পাঁচশ কার্তুজ দিয়ে কি তুমি সবাইকেই রুখতে পারবে ? তুমি কি অক্ষয় তূণের অধিকারী ? না না বাপু, আমার সাহসে কুলোচ্ছে না—যে কোনো মুহূর্ত্তে আমি হয়ত faint করতে পারি—"

ঠক্ ঠক্ ঠক্। দরজায় কারা যেন করাঘাত করছে।

"হুজোর"—দারোয়ানের হাঁক শোনা গেল।

"কৌন্ হ্যায় তেওয়ারী ?"

"মহল্লাকা বাবুলোগ্—ভেট্ মাংতা হ্যায়।"

"বৈঠাও। শোনো, তোমরা উত্তেজিত হয়ো না। দেখা যাক্ না কি হয়। বাড়ীতে এখন ডিফেন্স কমিটির মিটিং বসবে। এত বড় পাড়া, কত লোক আছে এখানে আর তারা প্রত্যেকেই লড়াই করবে। তবে ? Don't get nervous my dear. যদি সেরকম মুহূর্ত্ত আসে তবে তো risk নেবই—গাড়ী তো সব সময়েই তৈরী থাকবে—"

অভিজাত ও ভদ্রপাড়ার শেষে ও ওপাড়া আর এপাড়ার মাঝখানে একদল লোক থাকে যারা এপাড়ার সঙ্গেই নিজেদের যুক্ত মনে করে। তারা জাতে ডোম। ছোট ছোট পায়রার খুপ্‌রীর মত তাদের বস্তীর ঘরগুলো, কোনো মতে মাথা গুঁজে জীবনের বোঝাটাকে বয়ে বেড়ায়

তারা। রাস্তায় ঝাড়ু দেয়, জল ঢালে, নালি, নর্দ্দমা আর পায়খানা পরিষ্কার করে, ম্যানহোলে নেমে ময়লা তোলে, করপোরেশনের গাড়ীতে চড়ে আবর্জ্জনা সংগ্রহ করে আনে। মাটীর বাসা আর কলাইকরা থালায় তারা কাঁকর-মেশানো ময়লা চালের ভাত খায়, লাল কেরোসিনের টিম্‌টিমে আলোতে বসে রাতের বেলায় মত্ত কোলাহল করে। এপাড়ার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত মনে করলেও ভদ্র ও অভিজাতদের কাছে কিন্তু ওরা এপাড়ার লজ্জা।

ওপাড়ার সামনে এপাড়ার সীমান্ত রচনা করে যারা আছে তারা সংখ্যায় শ'দুই হবে। আর এই শ'দুই লোক উঠ্‌তে বসতে যার কথা শোনে সেই সর্ব্বশক্তিমানের নাম ঝগরু। সে যদি তার লোকদের দিনকে রাত বলতে বলে তা হলেও তারা অম্লান বদনে তাই বলবে—এমনি প্রভাব ঝগরুর। ঝগরু তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একছত্র নেতা, সর্দ্দার।

ঝগরুর অনুচরেরা এসে বসে ছিল তার কাছে। ওপাড়ায় কাল রাত যা ঘটেছে তার ছিটেফোঁটা তারা দেখতে পেয়েছিল, শুনছে সব কিছুই, দু'একজন যারা ভয়ার্ত্ত খরগোশের মত কোনো মতে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল ওপাড়ার ব্যূহ থেকে তাদের তারা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতেও সহায়তা করেছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে—আজ কি হবে? আজ বাতাসে যে গুজব ভাসছে তা যদি সত্য হয়ে দাঁড়ায় তবে তারা কি করবে?

পেঁয়াজী আর তাড়ির ভাঁড় নিয়ে বেশ জমিয়ে তুলেছিল ঝগরু। তার আসবারুণ চোখের অতি সূক্ষ্ম শিরাগুলো তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ঝিরঝিরে মৃদু বাতাসে দেহটা যেন ফাঁপা বেলুনের মত উড়ে যেতে চাইছে; বৌ সুরতিয়ার গুরু নিতম্বের দিকে তাকিয়ে উগ্র ধরণের একটা রসিকতার জন্য মনটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে। এমনি সময় ও অবস্থায় ওরা এসে ভীড় করে এই বাজে খবরটা দেওয়ায় ঝগড়ুর মেজাজ ভারী চটে উঠল।

বিরক্তির সুরে সে বলল, "আরে যা যা—ভাগ্। যো হোনেকা হোগা উলোগ হাম্‌লা করেগা তো ক্যা হায়?"

রংলাল বলল, "লেকিন্ কুছ তো করনা হোগা—"

ঝগরু ধমক দিল, একটা হাত নেড়ে বলল, "নশাকো খারাপ কর দিয়া তেলোগ্। আবে, ইস্‌মে শোচনে কা কোন্‌সা বাত হ্যায়? আয়গা তো লড়াই করোগে। অওর ক্যা? আস্‌লি বাত শুনো—সবকোই তৈয়ার রহো হাতিয়ার লেকে—যব ডঙ্কা বজেগা তব কুদ্ পরোগে—ব্যস্।"

"লেকিন্ সর্দ্দার—"

"ভাগ্ শালেসব—লবনি লেকে বৈঠা হ্যায়—থোরা মজা চিখে দে—যা অব্ তোহনি সব ঘরে যা—"

সবাই চলে গেল।

পেঁয়াজী চিবোতে চিবোতে ভাঁড়ে চুমুক দিতে লাগল ঝগরু। ধীরে ধীরে উগ্র একটা অনুভূতি ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত ডাক ছাড়তে লাগল তার কানের মধ্যে, নিঃশ্বাসটা ঘন হয়ে উঠল, চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে উঠল আর দৃষ্টিটা হয়ে এল ঝাপ্‌সা। নেশা হলো ঝগ্‌রুর। নেশার ঘোরে সুরতিয়াকে দেখে অবাক হয়ে যায় সে। সুরতিয়া হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর রূপসী হয়ে উঠেছে, দুর্লভা রাজকন্যার মত অপরূপ মনে হচ্ছে তাকে।

"সুরতিয়া—এগে—"

"কি হো?"

"ইধার আ—আনা—"

"উঁ—হুঁ—"

"থোরা তাড়ি পিব?"

"না—ন' পিবুয়া হাম্।"

নেশার ঘোরে হঠাৎ রাগ হল ঝগরুর, একরোখা হয়ে উঠল সে সুরতিয়ার কথা শুনে।

"আইব কি না—বোল হারামজাদী—"

"না—হাম ন' আইবুয়া—হামার কাম ছে"—

"তব মজা দেখ লে—"

উঠল ঝগরু। শিশুর মত অসমান পদক্ষেপে সে সুরতিয়ার কাছে গিয়ে তাকে জাপটে ধরল, দু'হাতে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল।

চীৎকার করে উঠল সুরতিয়া—"মর্ যাম্—সব হাড্ডি টুট্ যাই হামার—"

বৌকে বুকে টেনে নিয়ে হা হা করে হেসে উঠল ঝগরু, "ডর হোতা হ্যায়—ডরো মতি রে ছৌড়ি—লে, গোদিমে বৈঠ্—"

কিন্তু নেশা জমেছে ঝগরুর—সে পারবে কেন সুরতিয়ার মত সবলা নারীকে আটকে রাখতে? হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল সুরতিয়া।

বেলা দশটা এগারটা—অন্য দিনের মত স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে আজ হয়ত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত ঝগরু। কিন্তু আজ যখন দাঙ্গার অজুহাতে কাজ নেই তখন একটু ফুর্ত্তি না করে পারে না সে।

নিজের মনে হাসে ঝগরু—"ভাগ গৈল্—ছৌড়ী ভাগ গৈল্—"

সে ভাবে। একটা কিছু করতে হবে। তাড়ি শেষ হয়েছে, নেশা জমেছে, সুরতিয়াও পালাল। কিন্তু একটা কিছু করতে হবে তো? কি করা যায়, কি?

হঠাৎ এককোন থেকে পুরানো ঢোলটা টেনে নিয়ে প্রাণপণে বাজাতে লাগল ঝগরু। সে গান গাইবে। সে গান শুনে যেই ঘাবড়াক, ঝগরু দমবে না। তার গানের সখ চেপেছে সুতরাং সে গাইবেই।

দমাদম্ ঢোলে ঘা দিয়ে দিয়ে গাইতে সুরু করল ঝগরু। দুর্ব্বোধ্য গানের কথার মধ্যে মাত্র একটি লাইনকেই বুঝতে পারল শ্রোতারা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ একটা লাইনই সে বারংবার গাইতে লাগল।

"ছাপ্পর পর্ কৌয়া নাচে বগ্ বগুলা,
হাঁ হাঁ, বগ্ বগুলা—"

সে কি সুর! সে কি তান ও বিস্তার! সে কি অপূর্ব্ব দরদী কণ্ঠস্বর! সমস্ত ডোমপাড়া সচেতন হয়ে উঠল যে ঝগরু গাইছে। ঝগরুর নেশা হয়েছে।

সশ্রদ্ধ স্বরে তারা বলাবলি করতে লাগল, "সর্দ্দার গাওত হ্যায়জী—গাওত হ্যায়।"

ডিফেন্স কমিটির মিটিং বসেছে মিঃ বোসের বাড়ীতে। সভাপতি হয়েছেন তিনিই।

পাড়ার প্রায় বড় মাথারাই এসে জড় হয়েছেন। প্রবীন অধ্যাপক নিবারণ মুখুজ্জে, উকীল হরদাস মিত্র, ডাক্তার সন্তোষ দত্ত (এম, বি, এফ, আর সি, এস) এবং লৌহ ব্যবসায়ী সুকুমার রায়। আর এসেছে সরস্বতী অর্কেষ্ট্রা পার্টি, তরুণ ব্যায়াম সমিতি ও এভারগ্রীণ ড্রামাটিক ক্লাবের ছোক্‌রা সভ্যেরা। মিঃ বোসের ভেতরের বারান্দায় বড় সতরঞ্চি পাতা হয়েছে। তারি ওপরে সবাই ঘন হয়ে বসে একাগ্রমনে আলোচনা করছে। কোণের ঘরটার পরদা সরিয়ে রুবী দেখছে সবাইকে চেয়ারে বসে বসে। নেহাৎ কৌতুহল। রুবী বাড়ী থেকে বেরুতে পারছে না, পার্টি, সিনেমা আর পিক্‌নিকের অভাবটা বড় দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এমনি সময়ে এই মিটিং। আর কিছু না হোক্‌, বহুরকমের মানুষকে তো দেখা যাবে। আর রুবী শুধু দেখেই না—দেখে বিচারও করে, বিচার করে আনন্দ পায়।

মিঃ বোস কথা বললেন, সভাপতি-সুলভ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ও ভারি গলাতে বললেন, "কাল থেকে সহরের বুকে যা আরম্ভ হয়েছে তা আপনারা সবাই জানেন ও দেখেছেন। বেশী কিছু বলা বা বক্তৃতা দেওয়ার সময় এটা নয়, আমার সে যোগ্যতাও নেই। আমি শুধু আপনাদের এইটুকুই বলতে চাই যে আমাদের, বিশেষতঃ বাঙালীদের জীবনে একটা দুর্দ্দিনের সুরু হয়েছে। আজ আমাদের এই মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে দল বেঁধে দাঁড়াতে হবে, we have to fight it and stop it—মানে, এই বিকারকে থামাতেই হবে। সুতরাং আজ আমরা সমস্ত দলাদলি ভুলে গিয়ে এক হয়ে দাঁড়াব। আজ বর্ণ ও জাতির ভেদাভেদ, উচ্চ ও নীচের পার্থক্য, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের প্রভেদ সব ভুলে যেতে হবে—শুধু একটি মাত্র কথা মনে রাখতে হবে যে আমরা হিন্দু—আর কিছু নয়।"

মিঃ বোস থামলেন, রুমাল বের করে উত্তেজনা-প্রসূত ঘামকে মুছলেন, সিগারেট-কেস থেকে একটা ব্ল্যাক এ্যাণ্ড্ হোয়াইট্ সিগারেট' বের করে উপস্থিত প্রবীণদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজেও একটি ধরালেন। ইতিমধ্যে তাঁর সারগর্ভ কথা গুলোর প্রশংসা উপস্থিত সভার মধ্যে গুঞ্জরিত

হয়ে উঠেছে আর কবীর চোখের তারাতে দেখা দিয়েছে জলজলে নক্ষত্র-দীপ্তি।

লৌহব্যবসায়ী বললেন, "যথার্থ—আপনার কথা অত্যন্ত মূল্যবান। জাতি, বর্ণ, শ্রেণী নিয়ে মাথা ঘামাবার দিন এখন গেছে—এখন থেকে আমরা সবাই সমান, সবাই হিন্দু।"

মিঃ বোস বললেন, "এবার তবে কার্য্যপদ্ধতি স্থির করা হোক্—"

"ঠিক—ঠিক।" সবাই সমস্বরে সায় দিল ও ঝুঁকে পড়ল।

প্রবীন অধ্যাপক বললেন, "পাড়াকে চারটি দলে ভাগ করা হোক, এক এক দল এক এক দিকে দৃষ্টি রাখবে।"

উকীল বললেন, "সিগনালিং ও বিপদ্-সূচক সংবাদ জ্ঞাপনের জন্ত সাইরেণ বা শঙ্খের ব্যবস্থা করা হোক।"

ডাক্তার বললেন, "একদল যুবকেরা পালা করে রাত জাগবে ও পাহারা দেবে, কোনো বিপদের সূচনা দেখলেই তিনবার শঙ্খধ্বনি করবে ও সঙ্গে সঙ্গে সাইরেণ বেজে উঠবে। পাড়ার চারদিকে, চারটে প্রান্তদেশের বাড়ীগুলোতে লাল বাতি জলবে, যেদিক থেকে বিপদ আসবে সেদিকের বাতিটাই জ্বলে উঠবে।"

ব্যবসায়ী বললেন, "আর উপরতলায় বা ছাদে মেয়েরা, শিশুরা ও বৃদ্ধেরা ইঁটপাটকেল নিয়ে থাকবে। নীচের তলায় থাকবে অন্যান্ত পুরুষেরা লাঠি সোঁটা নিয়ে।"

প্রত্যেকের প্রস্তাবই গৃহীত হল। ডিফেন্স কমিটির মিটিং বেশ এগোচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎ যতীন বলে একটি ছোক্‌রা বিপদ বাধাল। ছেলেটা খদ্দর টদ্দর পরে, রুক্ষ রুক্ষ কথা বলে, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটে।

সে বলল, "সবই তো করলেন কিন্তু যদি ওরা এসে আক্রমণ করে বসে তখন তাদের সাম্‌নাসাম্‌নি কে লড়বেন?"

যেন বোমা ফাটল। ধোঁয়ায় যেন সব দিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ঠিকই তো, একথা তো ক্ষণ-তড়িতের মতও মনে উদিত হয়নি। সত্যি, এ ভাববার কথা।

ব্যবসায়ী বললেন, "কেন সবাই লড়ব, সবাই নেমে পড়ব।

প্রবীণ অধ্যাপক মাথা নাড়লেন, "কথাটা সন্তোষজনক মনে হচ্ছে না। একদল লোককে সর্ব্বদা নীচে রাস্তায় থাকতে হবে, শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই লড়বার জন্যে। অর্থাৎ প্রাণ দেবার জন্যে তাদের সর্ব্বক্ষণই তৈরী থাকতে হবে। সব সক্ষম লোকেরা কি তা থকবে বা থাকতে পারবে?"

আবার বিস্ফোরণের মত ধোঁয়া। সত্যি, আসল সংগ্রামটা কারা কারা করবে? যদি ভয় সত্যি হয়, হাজার হাজার মানুষ যদি এসে আচম্‌কা আক্রমণ করে বসে তখন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত এক একটা বাড়ীতে বসে ইটপাটকেল আর লাঠি ঘুরিয়ে কি পাড়া বাঁচবে?

যতীন বলল, "এমন নিখুঁত একটা মিটিং করে ও ব্যবস্থা করেও আমরা বাঁচতে পারবো না। সুতরাং কি করবেন ভাবুন—"

মিঃ বোস বুদ্ধিমান লোক, লবণ-সমুদ্রের পরপার থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে আসার পর থেকে তার সেই বুদ্ধি আরো ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। তিনি দেখলেন যে যতীন যখন খট্‌কাটা বাঁধিয়েছে তখন নিশ্চয়ই সে সমাধানের পথটাও জানে। আর সত্যি, অত্যন্ত গুরুতরই বটে কথাটা।

মিঃ বোস বললেন, "যতীনের কথার যুক্তিকে আমি খণ্ডন করার মত কিছু পাচ্ছিনা অতএব আমার অনুরোধ যে যতীনই এ বিষয়ে আমাদের পথ দেখাক্—"

যতীন মুচ্‌কী হেসে মাথা নাড়ল, "বেশ, সে সমস্যার সমাধান আমি করছি। ও পাড়া আর এ পাড়ার মাঝে যে সব গরীব লোকগুলো রয়েছে তাদের খবর কি আপনারা জানেন?"

"ডোমেরা।"

"হ্যাঁ। ওরা ও পাড়ার নয়, নিজেদের তারা এ পাড়ার হিন্দুদের দলেই মনে করে, এ পাড়ার মুখে যে শিব মন্দিরটি রয়েছে তাতে তাদের প্রবেশাধিকার না থাকলেও সেই মন্দিরের বিগ্রহকেই পূজা করে। অর্থাৎ তারা হিন্দু—।"

মিঃ বোস সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে হাসলেন, "দি আইডিয়া।"

যতীন বলে চলল, "ওরা অল্প খায়, অল্প পরে, তবু ওরা শক্তিমান।

আমরা যে বৃত্তিটা হারিয়ে ফেলে আজ এত লোক হয়েও অসহায় বোধ করছি ওদের সেই বৃত্তিটা সম্পূর্ণ সজাগ আছে। সুতরাং যদি সত্যিকার ডিফেন্স কমিটি কর্ত্তে চান বা বাঁচতে চান তবে ওদের ডেকে পাঠান। আর—আর ফাণ্ড্ তুলুন—এখুনি।"

ব্যবসায়ীর হিসাবী মন নাড়া খেল, "ফাণ্ড, কেন হে ?"

"যে গরু দুধ দেয় তার চাঁট খাওয়া ভাল।" যতীন হাসল।

"মানে ? খুলে বল বাপু"—ব্যবসায়ী বিরক্ত হলেন।

"মানে তো খুব সহজ। ওদের অস্ত্রশস্ত্র দিতে হবে, ভাল খাবার দিতে হবে, মদ খাওয়াতে হবে।"

মিঃ বোস সমর্থন করে বললেন, "কথাটি ঠিক। যারা প্রাণ দেয় তাদের ও দাবী মানতেই হয়।"

যতীন জোর দিয়ে বলল, "আর বেশী ভেবে সময় নষ্ট করবেন না। অত্যাচারকে শক্তির দ্বারাই দমন করতে হয়। সুতরাং আমাদের তৈরী থাকতেই হবে। আর আজকে যে ওরা আক্রমণ করবেই এবিষয়ে যেন আপনাদের কোনো সন্দেহ না থাকে।"

নোট আর মুদ্রার শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চাশ টাকা উঠল। আরো টাকা পরে পাওয়া যাবে। কিছু টাকা খাটিয়েই যদি নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়া যায় তবে কে আপত্তি করবে ? প্রাণের চেয়ে দামী আর কি আছে ? তাই ভালো—খাক ওরা। ভালো খাবার আর খেনো মদ। এমন বেশী কিছু নয়। হয়ত আজ রাতেই আক্রমণ করবে। রাতের অন্ধকারে যেন নরক থেকে উঠে আসবে হিংসায় অন্ধ পশুর দল—তখন—তখন যারা এই অতিদামী প্রাণ দিয়ে আর রক্ত ঢেলে তাদের বাঁচাবে তাদের কি এতটুকু সেবা তারা করবে না! নিশ্চয়ই করবে। এ একটা মহৎ কাজ। শুধুই বাঁচার আনন্দ নয়, মহৎ কাজের মহৎ আনন্দটাও লাভ হবে এই টাকা ঢেলে। সুতরাং ওরা খাক, মাতাল হোক।

ঝগরুর হঠাৎ ক্লান্তি এলো। ঢোলটাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে সে বলল, "হমার নশা বিগড় গেল্—"

কাজ নেই আজ। বাড়ীতে বসে বসে আর কতক্ষণ ভালো লাগে? ভালো লাগে তাড়ি থাকলে। তা ফুরিয়েছে। স্থরতিয়া একটু রঙ্গরস করলে মন্দ হোত না। কিন্তু ছৌঁড়ী পালিয়ে গেল, বোধ হয় তার কাজ আছে। আর ওসব রঙ্গরসও আজকাল যখন তখন বেশী ভালো লাগে না। সব সময়ে যা ভাল লাগে তা মদ। এই নেশা কেটে যাওয়া, সমস্ত দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসা, স্তিমিত চেতনায় বাস্তবের স্পর্শ লাগা মোটেই ভালো লাগেনা ঝগরুর! জীবন বলতে যা বোঝায় সেইটাই তার কাছে অস্বাভাবিক—তার কাছে স্বাভাবিক হচ্ছে মদ খেয়ে নেশা করা, মাতাল হয়ে মারামারি করা, উলঙ্গ হয়ে অশ্লীল গান আর নৃত্য করা, বমি করা বা আর ঝিম্ মেরে পড়ে থাকা।

বিশ্রী লাগছে। আবার তাড়ি খেতে হবে। ফিকে হয়ে আসা নেশাকে আবার গাঢ় করে নিতে হবে।

"স্থরতিয়া—আগে স্থরতিয়া"—

"কী কহইছ জী?"

"দো আনা পয়সা দে ভাই।"

"না হ্যায়।"

ঝগরু লাফিয়ে উঠল, গর্জ্জন করে বলল, "চুপচাপ দেবুয়া কি নেহি বোল্, জ্যাদা টাঁয়টোঁয় মৎ কর স্থরতিয়া—"

স্থরতিয়াও সমানে ঝঙ্কার দিয়ে বলল, "টাঁয়ভি না কইরেছি, টোঁয় ভি না কইরেছি—বাত পাক্কা বোলইছি কি পয়সা না হ্যায়!"

"হারামজাদী কাহাকা"—হঠাৎ ঝগরু স্থরতিয়ার ছোট বেণিটা ধরে টান দিল, তার পিঠে জোর করে বসাল কয়েক ঘা।

"আইগে মাইয়া গে—মার ডালা রে—"স্থরতিয়া চীৎকার করে কেঁদে উঠল। তার অত জোরে চেঁচানোটা উচিত হয়নি, কিন্তু স্থরতিয়ার ধরণই আলাদা—তিলকে তাল করাই তার বহু পুরাতন রীতি।

"বোল্ পয়সা দেবুয়া কি নেহি? বোল্ চুড়ৈল কাহাকা—"

ডোম পাড়া আবার সচেতন হয়ে উঠল, সশ্রদ্ধ স্বরে আবার তারা বলাবলি করতে লাগল, "সর্দ্দার জরুকো পিটত হ্যায় জী, পিটত হ্যায়"—

ঠিক সেই সময় দু'তিনজনের ডাক শোনা গেল, "ঝগরু আছে— ঝগরু ?"

সুরতিয়ার চীৎকারের চোটে সে ডাক শোনা যায় না।

আবার শোনা গেল সেই ডাক, এবার আহ্বানকারীদের কণ্ঠস্বর উঁচু পর্দায় চড়েছে—"ঝগরু সর্দার আছো—ঝগরু ?"

সুরতিয়া কান্না থামাল, বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কৌন্ সব তুমকো বোলাওৎ হ্যায় জী—"

"হাম্‌কো ?"

"হাঁ। ভাদর আদমী—"

"ভাদর আদ্‌মি! হাঁ ?"

সে হঠাৎ সংযত হবার চেষ্টা করতে লাগল, বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো তিনজন অপরিচিতের সামনে। তাদের মধ্যে যতীনও ছিল।

"তুমিই ঝগরু ?"

"হাঁ হামিই সেই।"

"তোমাকে ডাকছে।"

"কোন ডাকছে ?" কিছু বুঝতে পারলনা ঝগরু।

"বোস সাহেব, ব্যারিষ্টার, চেন না তাঁকে ?"

ঝগরুর চোখে সম্ভ্রম ফুটে উঠল, মাথা দুলিয়ে সে বলল, "আয়রে বাপ, কেনো চিনব না তাকে ? চিন্‌ছি হামি—"

"তিনি ডাকছেন তোমায় এখুনি।"

"হামাকে ? আয়রে বাপ, হামি তো ঝগরু ডোম আছি, হামাকে কনো ?

"দরকার আছে, যাবে না ?

"হাঁ হাঁ, যাবে বৈকি, জরুর যাবে। বালিষ্টার সাহেব বুলিয়েছে—আয়রে বাপ—"

"সেলাম হুজুর ; সেলাম বাবুলোক—

ঝগরু এসে দাঁড়াল পাড়ার ডিফেন্স কমিটির সামনে। তখনো তার

বেশ নেশা রয়েছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে টলতে লাগল সে, সবাই তাকাল তার দিকে। কেশবিরল মাথায় বিন্দু বিন্দু ঘাম চকচক করছে তার, ছোট ছোট চোখের তারা দুটো এদিক ওদিক ঘুরছে কৌতুহলে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরণে, গায়ে একটা মোটা কাপড়ের ফতুয়া, বাঁ গালে একটা ফোঁড়ার চিহ্ন। এই ঝগরুর চেহারা।

রুবী এসে আবার পরদার পাশে দাঁড়িয়েছে। নাকটা কুঁচকে সে বিড় বিড় করে বলল, হাউ আগ্‌লি এ্যাণ্ড ডার্টি—"

সবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এসে ছুঁচের মত বিঁধছে ঝগরুর গায়ে।

সে হেসে বলল, "হুজুর মাফ করবেন, হামি একটু তালের রস খেয়ে মাতোয়াল হয়েছে—"

মিঃ বোস সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, "তুমিই ঝগরু ?"

"জী হাঁ—ঝগরু ডোম।"

"তুমি মাতাল হয়েছ ?"

"আগিয়া হাঁ"—

"তুমি মদ খেতে ভালবাস ?"

মাথা নিচু করে হেসে বলল ঝগরু "আগিয়া হাঁ হুজুর।"

কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন মিঃ বোস, "তুমি ডোমদের সর্দ্দার ?"

"জী—"

"তবে শোন ঝগরু, তোমাকে এবং তোমার লোকদের আমরা মদ খেতে দেব—যত চাও। শুধু মদের জন্যই নয়, খাবার জন্যও টাকা দেব তোমাদের।"

ঝগরু কি স্বপ্ন দেখছে ? সে থতমত খেয়ে গেল, তাকাল চারদিকে। না, সব সত্যি মনে হচ্ছে। সে কি বেশী নেশা করেছে ? দূর, এক লব্‌নি তাড়িতে তার গলাও ভেজে না। মিথ্যে নয়, সবই সত্যি, বাস্তব।

"হুজুর বড় মেহেরবান, লেকেন—"

মিঃ বোস বাধা দিয়ে মাথা নাড়লেন, "বলছি। দাঙ্গা হচ্ছে জানো তো ঝগরু ?"

ঝগরু মাথা নাড়ল।

"আজ রাতে হয়ত ওরা আসবে।"

"জী"

"আমরা হিন্দু তোমরাও হিন্দু।"

"আগিয়া—"

"হিন্দুকে হিন্দু না বাঁচালে কে বাঁচাবে বল?"

"জরুর, জরুর হুজুর।"

"যদি ওরা আসে তবে তোমরা লড়বে তো? আমরা—আমরাও অবশ্য যোগ দেব, সবাই একসঙ্গে লড়ব।"

হঠাৎ মিঃ বোস দেখলেন যে উপবিষ্ট সবার মাঝে ঝগরুই শুধু দাঁড়িয়ে আছে, তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু ওকি! তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন ঝগরু? বোস, বোস—"

আশ্চর্য্য হয়ে গেল ঝগরু, আকস্মিক এই অভ্যর্থনায় হকচকিয়েও গেল, সে আম্‌তা আমতা করে বলল, "লেকেন—"

"কিছু না, কিছু না, লজ্জা করো না, বোস"—

"হামি ডোম আছি হুজুর"—

"ডোম!" মিঃ বোস চোখ কপালে তুললেন, তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে থরথর করে কাঁপতে লাগল, "ডোম তাতে কি? তুমিও আমাদের মত মানুষ, আমাদেরি মত হিন্দু—বোস, বোস ভাই"—হঠাৎ আবেগের আতিশয্যে তিনি উঠে এগিয়ে এলেন, বিস্মিত ঝগরুর হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

ঝগরু কথা বলতে গেল, কিন্তু কথা বেরোল না তার গলা দিয়ে৷ কড়া নেশা করেও যে অনর্গল কথা বলে যায়, আজ সেই ঝগরু বিস্ময়ে, কৃতজ্ঞতায়, অনাস্বাদিত এক আনন্দে কথা হারিয়ে ফেলল।

নোটের খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল।

একটু বাদেই সেখান থেকে বেরোল ঝগরু।

বাড়ী ফিরবার সময়ে বস্তীর নিকটবর্ত্তী শিব মন্দিরের সামনে দিয়ে চলতে চলতে সে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল মন্দিরের কাছে। মন্দিরের নোনাধরা দেয়ালের ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে একবার হাসল।

বিড়বিড় করে তারপরে সে বলল, "শিউজী—তু বড়া ভালা আছে, বড়া ভালা—"

বস্তীর সবাই হঠাৎ উৎসবে মেতে উঠল। রামপ্রসাদ সিংয়ের ভাটিখানা একঘণ্টায় উজার হয়ে গেল। নিঃশেষ হয়ে গেল বনোয়ারী হালুয়াই আর তেওয়ারীর দোকানের খাবার।

ঘরে ঘরে মত্তকণ্ঠের কোলাহল ধ্বনিত হল।

টিম্‌টিমে লাল কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে সবাই ঘরের মধ্যে বসল ভাঁড় আর খুড়ি নিয়ে।

ফুর্ত্তি, আনন্দ।

কোলাহল। আনন্দের অশ্লীল ও আদিম প্রকাশ।

মেয়েরাও বাদ গেল না। নেশায় বেসামাল হওয়ায় দু'একজনের কাপড় আলগা হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের কান্না শোনা যায়। নেশার ঘোরে কোনো পুরুষ তার বৌকে মারছে।

পুরুষের আর্ত্তনাদও শোনা যায়। সবলা স্ত্রীর হাতে কোনো দুর্ব্বল ডোম মার খাচ্ছে।

কোলাহল, গান, চীৎকার।

আর ওদিকে ডোম সর্দ্দার ঝগরু ঢোল বাজিয়ে গান গাইছে। কোমরে হাত দিয়ে নাচবার চেষ্টা করে গানের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে সুরতিয়া।

ঝগরু গাইছে—"হামার বাত্‌ শুনো সঁইয়া—
এ পিয়ারী সজনৈয়া—"

নেশায় আরক্ত ও আচ্ছন্ন চক্ষু মেলে, হাসতে হাসতে বস্তীর লোকেরা বলাবলি করে; "হামানিকে সর্দ্দার গাওত্‌ হ্যায় জী—গাওত্‌ হ্যায়।"

ওদিকে রাতের আকাশ থম্‌থম্‌ করছিল একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে। নক্ষত্রগুলো পাণ্ডুর মুখে তাকিয়ে ছিল নীচের দিকে। নির্জ্জন পরিত্যক্ত রাস্তাঘাটে ঘনীভূত হচ্ছিল একটা ভৌতিক পরিবেশ।

এক সময়ে ডোমপাড়ার কোলাহল থেমে গেল।

রাত গভীর হল।

দূরে কোথায় যেন আগুন লেগেছে। কালো আকাশের কোলে যেন রক্তের ছোপ লেগেছে।

মাঝে মাঝে কোলাহল ভেসে আসে। উন্মত্ত তাণ্ডবের ধ্বনি। 'আল্লাহো আকবর'—। দূরাগত সমুদ্র-গর্জ্জনের মত সে ধ্বনি মাথার ওপর দিয়ে তরঙ্গের মত গড়িয়ে যায়।

মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়।

আর গভীর রাত্রির এই নিঃশব্দ ও অন্ধকার মুহূর্ত্তে ডোমপাড়ার সর্দ্দার জেগে বসে থাকে। তার দু'চোখ সামনের দিকে প্রসারিত, কান রয়েছে সমস্ত রকমের শব্দ ও প্রতিশব্দের দিকে।

রাত একটা নাগাদ যুদ্ধ-ঘোষণা করল ওরা।

"আল্লাহো আকবর—"

"পাকিস্থান জিন্দাবাদ—"

ঢোলকে ঘা দিল ঝগরু। ডুম্ ডুম্-ডুম্-ডুম্।

সমস্ত ডোমপাড়া জেগে উঠল। নিঃশব্দে ছুটে বেরোল, সবাই একত্রিত হল।

ওরা বাগু্ বাজিয়ে এলো, এলো মশাল জালিয়ে। নরকের একটা বিভীষিকাময় অংশও নেমে এল তাদের সঙ্গে। আদিম অরণ্যের যত রক্ত-তৃষাতুর অশরিরী—সবাই যেন আজ ওদের মস্তিষ্কের অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছে।

শিব-মন্দিরটাকে লক্ষ্য করেই ওরা প্রথমে এগিয়ে এল। উদ্দেশ্য মন্দির ধ্বংস করার পরে পাড়াকে ধ্বংস করবে।

সমস্ত পাড়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সাইরেণ বাজতে লাগল, অট্টালিকা-শীর্ষের লাল বাতিগুলো থেকে আতঙ্কের রক্ত-দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল, ছেলে মেয়েদের কান্না শোনা গেল, দুড়ুম দাড়াম করে দরজা জানালা বন্ধ হতে লাগল, ধাবমান পদশব্দ ধ্বনিত হল আর ধ্বনিত হল শঙ্খ।

সমস্ত পাড়া ভয়ার্ত্ত হুঙ্কার ছাড়ল, "বন্দে মাতরম্—"

যে মন্ত্র উচ্চারণ করে দেশকে মুক্ত করতে চায় ওরা, আজ সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে ওরা দেশের লোককেই মারতে চাইল।

ঝগরুর ঢোলক তখন থেমেছে। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছে ওরা।

"সোরগোল্ মাত কর্ ভাই—নজদিক্ আনে দে—"ঝগরুর নির্দ্দেশ ধ্বনিত হল।

"আল্লাহো আকবর—"

হঠাৎ বন্যার স্রোতের মত ওরা সবাই ধেয়ে এলো। মশালের আলোতে মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোকের মত ওদের ঝক্‌ঝকে ছোরা আর তলোয়ারগুলো ঝলসে উঠল।

ঝগরু দুলছিল ওদের ব্যাণ্ডের তালে তালে, এবার বলল, "অব লগ্ যা ভাই—জঞ্জাল সাফ কর্—"

ধ্বনি উঠল ঝগরুর দলের।

যে শিব-মন্দিরের ভেতরে কোনোদিন ঢুকতে পায়নি তারা, যে শিব-ঠাকুরের মন্দিরের নোনাধরা দেওয়ালের ওপর হাত বুলিয়ে আর মাথা ঠুকেই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেছে ওরা, যে নির্ব্বাক প্রস্তর-দেবতা তাদের এই বঞ্চিত দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদই জানায়নি আজ ঝগরু সেই দেবতারই জয়ধ্বনি করে উঠল।

"হর হর মহাদেও—জয়, শিউজীকা জয়—"

তারপরে যেন দুটো পাহাড়ে সংঘর্ষ ঘটল। মাটির পাহাড় নয়, আদিম পৃথিবীর লৌহকঠিন পাথরের পাহাড়।

রক্তের ঢল নামল! হাত, পা, মাথা ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ল। চূর্ণীকৃত মাথা থেকে ঘিয়ের মত ঘিলু গড়াল, বুকের ভেতরকার রক্ত মাংসকে চুম্বন করে ধারালো ছোরা বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এল।

মাথার ওপরকার অনন্ত নীলাকাশে অনেকগুলো নক্ষত্র তখন কাঁপছে। নিঃশব্দে লঘু মেঘের টুক্‌রোগুলো ভেসে যাচ্ছে। কোথাও নিশ্চয়ই এই রাতের অন্ধকারে ফুল ফুটছে, কোনো শিশু ঘুমোচ্ছে, কোনো প্রেমিক তার প্রেয়সীকে বুকে টেনে নিয়ে নিথর হয়ে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই

মানুষেরা কোথাও এখন স্বপ্ন দেখছে, গান গাইছে, পরস্পরকে ভালবাসছে। অথচ—

দাঙ্গা থেমেছে। ওরা হার মেনে পিছু হটে গেছে। ঝগরুর দল ওদের আস্ফালনকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। শিব-মন্দির অক্ষত রয়েছে।

কিন্তু মরেছে অনেকে। ওরাও মরেছে, এরাও মরেছে। এরা মানে ডোমেরা। ভদ্র বাবুরা পেছনের ঘাটি আগলে ছিল, বিপদ ততদূর এগোয়নি। এগোলে ওরা নাকি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করত, প্রাণ দিত।

পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রে পড়ে আছে শবদেহ। বাতাসে চাপ চাপ রক্তের তাজা গন্ধটা বেশ ভাল করেই পাওয়া যাচ্ছে।

মিঃ বোসের বাড়ীতে গেলে দেখা যাবে যে বাইরে তাঁর মোটরটা এসে দাঁড়িয়েছে আসন্ন প্রভাতের অস্পষ্ট আলো-আঁধারে। আর তারি পাশে আছে একটা মিলিটারী ট্রাক—তাতে চারজন সৈনিক।

মিঃ বোস দ্রুতকণ্ঠে বললেন, "কৈ তোমরা কি তৈরী রুবী? শিগগীর এসো—মিলিটারী escort আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবে না"—

রুবী মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ we are ready, চলো মা। জানো বাবা, মা terrible shock পেয়েছেন"—

সবাই বেরোল।

মিঃ বোস বললেন, "স্বাভাবিক—quite natural. আমিও কি সুস্থ আছি ভাবছ? ভগবান বাঁচিয়েছেন বলেই রক্ষা পেলাম। চলো, hurry up—"

গাড়ীতে চড়লেন মিঃ বোস।

গাড়ী ছুটল। ওঁরা ভবানীপুর যাবেন।

অরুণ বলল, "ঝগরুই বাঁচালো বাবা—উঃ, লোকটা সাংঘাতিক fight দিয়েছে—"

মিঃ বোস সিগারেট ধরালেন, এতক্ষণ সে রকম মানসিক অবকাশ তাঁর ছিল না। ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, "হুঁ—এ ওদেরি কাজ, একি

তোমরা পারতে কখনো? Certainly not—যাক্ the man has been well-paid"—

রুবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাঁচা গেল। পিকনিক পার্টি আর সিনেমা তা হলে জীবন থেকে মুছে যাবে না। প্রজাপতির আয়ু তবে শেষ হয় নি।

ওঁদের গাড়ী দূরে মিলিয়ে গেল।

তখন ডোমপাড়ায় মহাভারতের নারীপর্ব্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বহু, বহু নারী হারিয়েছে তাদের বাপ, ভাই, স্বামী ও পুত্রদের। আগুনের শিখার মত কাঁপতে কাঁপতে একটা বিলাপের ধ্বনি আকাশের দিকে উঠছে।

সুরতিয়াও কাঁদছে। ঝগরু মারা গেছে।

হ্যাঁ, ঝগরু মারা গেছে। কারণ মিঃ বোসদের বাঁচাবার জন্যই তো ঝগরুর মতো মানুষেরা চিরকাল জন্মায় আর মরে। পঞ্চ নিষাদ প্রাণ না দিলে তো রাজপুত্র পাণ্ডবেরা বাঁচতে পারত না।

সেতার

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্বশুর শাশুড়ী উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলিমা বসবার টুলটাকে স্বামীর বিছানার আরো কাছে এগিয়ে নিয়ে এল। তারপর তার শীর্ণ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'একটা কথা বলব শুনবে?'

সুবিমল ম্লান একটু হাসল, 'কেন শুনব না বলো।'

নীলিমা বলল, 'আগে কথা দাও আপত্তি ক'রবে না, রাগ ক'রবে না।'

সুবিমলের দু'পাশে সারে সারে আরো চোদ্দ-পনেরটি বেড। রোগী আর তাদের দর্শনার্থী আত্মীয় স্বজনের ভিড়ে হাসপাতালের এই ঘরটি ভরে উঠেছে, নীলিমার গলার স্বরে কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকাল। কিন্তু নীলিমার কোন খেয়াল নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই কারো দিকে। স্বামী-সম্ভাষণের এমন উপযুক্ত ক্ষেত্র এমন নিবিড় অবকাশ যেন আর কোন দিন সে পায়নি।

সুবিমলের হাতে আর একটু চাপ দিল নীলিমা, বলল, 'রেখা বউদির কথা মনে আছে তোমার? আমার মামাত-ভাই নীরদদার বউ। তিনি কাল এসেছিলেন আমাদের বাড়ী। বললেন, এক দিন হাসপাতালেও আসবেন তোমাকে দেখতে। রেখা বউদিরই পিসেমশাই হ'ন সম্পর্কে রায় সাহেব পি, এন, বিশ্বাস। তাঁরই ছোট ছোট দুটি নাতনীকে বিকেলে গিয়ে গান শেখাতে হবে। রেখা বউদি বলছিলেন আমি যা জানি তাতেই চলবে। টাকা পঁচিশেক তো ওঁরা দেবেনই, বেশিও দিতে পারেন।

সুবিমল আস্তে আস্তে বলল, 'কুটুম্ব-স্বজনের বাড়ীতে শেষ পর্যন্ত গানের মাষ্টারীও গিয়ে ক'রতে হবে তোমাকে?'

নীলিমা বলল, 'আহা-হা ভারি তো মাষ্টারী, মাষ্টারী করবার মত গান যেন আমি জানি। আর কুটুম্বও তো খুব। মামাতো ভাইয়ের পিসে-শ্বশুর। তাঁর কাছ থেকে টাকা নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, বরং এক হিসেবে লাভ আছে। প্রথমেই একেবারে অজানা-অচেনার মধ্যে গিয়ে পড়বার ভয় নেই।'

সুবিমল বলল, 'কিন্তু বাবা মা কি রাজী হবেন?'

নীলিমা জবাব দিল, 'সে জন্য ভেব না। সে ভার আমার ওপর, এক রকম নিমরাজী তাঁরা হয়েছেন।'

সুবিমল বিস্মিত হ'ল না। যে শ্বশুর-শাশুড়ী বিয়ের পর মাত্র কয়েকটি মাসের জন্য পুত্রবধূকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে দেননি, ছেলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলা-মেশায় আপত্তি করেছেন তাঁরাও যে আজ নীলিমাকে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দিতে পারেন, একথা সুবিমলের কাছে আজ অবিশ্বাস্য মনে হোল না, এই বছর দু'য়েকের মধ্যে তাদের সংসারে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। থাইসিসে আক্রান্ত হয়ে সে এসেছে যাদবপুরের এই হাসপাতালে, প্রথম বছর ফ্রী-বেড মেলেনি। চিকিৎসার খরচ বাবদ মোটা টাকা লেগেছে মাসে মাসে। বুড়ো বাপ দেশী একটা মার্চেণ্ট অফিসে হিসেব লিখেন, অসুখ-বিসুখ দূরের কথা, সংসারের দৈনন্দিন অনেক খরচই তাঁর হিসেবের বাইরে গিয়ে পড়ে। ইদানীং সুবিমলের চাকরিই ছিল ভরসা। তাই অসুখের প্রথম ধাক্কাতেই তাঁকে হাত দিতে হয়েছে স্ত্রী আর পুত্রবধূর গয়নায়, হাত পাততে হয়েছে স্বজন-বন্ধুদের কাছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অগণ্য নয়, ধার দেওয়ার ক্ষমতারও সীমা আছে। বাসন-কোসন গেছে, সামান্য আসবাবপত্র অদৃশ্য হয়েছে, তবু রোগ রেহাই দেয়নি।

সংসারের খরচা কম নয়, ভাই-বোনেই সুবিমলেরা ছ'টি। ভাগ্যের ফেরে মাঝখানেই পর পর দুটি অনূঢ়া বয়স্থা মেয়ে, কন্যাদায়ের চিন্তা ছাড়া বাপ-মায়ের আর কিছু তারা বাড়াতে পারেনি, ছেলেরা এখনো স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়ে।

তবু অনেক চেষ্টা-চরিত্র ধরাধরির ফলে মাস কয়েক হোল হাসপাতালে

সুবিমলের জন্য ফ্রী-বেডের ব্যবস্থা হয়েছে, বড় রকমের খরচ কিছু লাগে না। কিন্তু দু'একটা ওষুধের দাম আর টুকটাক হাতখরচ বাবদ ফী মাসেই পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দরকার হয়। সুবিমল জানে, এই ক'টি টাকা পাঠাতেও বাপের সাধ্য আর এখন নেই, কিছু কাল ধরে নিজের ব্যবস্থা নিজেই তাই তাকে করতে হচ্ছে। কলকাতার বন্ধুদের কারো কাছে হাত পাততে আর বাকি নেই। ইদানীং তাদের কাছ থেকে টাকা আর সে চায় না, চায় ঠিকানা। বন্ধুর বন্ধু তস্য বন্ধুরা সারা ভারতবর্ষ ভ'রে কে কোথায় আছে, কে কোথায় ভালো চাকরি ক'রছে।

অনেকেই চিনতে পারে না, অনেকের কাছ থেকেই জবাব পাওয়া যায় না। সকলে সমান নয়, কেউ কেউ আবার দেয়ও। ভরসা দেয় থাইসিস রোগটা আজকাল আর এমন কিছু মারাত্মক নয়, বিশেষ ও গোড়াতেই যখন ধরা পড়েছে। কেউ কেউ দু'-এক মাস পাঁচ-দশ টাকা পাঠায়, কিন্তু তারপর হয় আর তাদের সাড়া মেলে না, না হয় অত্যন্ত হাত-টানাটানির খবর আসে।

এমনি দু'-তিনখানা চিঠি স্বামীকে দেখতে এসে গতবার নীলিমার হাতে পড়েছিল।

সুবিমল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তাঁরা যদি রাজি থাকেন তবে আর কি, অন্যের কাছে থেকে ভিক্ষে নেওয়ার চেয়ে তোমার রোজগার আমি সহজ-ভাবেই নিতে পারব।'

নীলিমার চোখ ছলছল ক'রে উঠল, 'অমন ক'রে ব'লো না।'

স্ত্রীর সেই জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে সুবিমল কি যেন দেখল; তারপর কোমল কণ্ঠে বলল, 'মান-অপমানের কথা নয়, আমি ভাবছি তোমার শরীরের কথা, সংসারের অত খাটুনির পরে আবার কি গান শেখানোর পরিশ্রম দেহে সইবে? দু'দিনও তো শরীর টিকবে না তোমার।'

নীলিমার মনে পড়ল অফিসের কাজের পরে সুবিমল যখন টিউশানিতে বেরুত নীলিমা ঠিক এই ধরণের কথাই বলত, স্বামীর স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ ক'রত, সেই আশংকাই আজ নিষ্ঠুর সত্য হয়ে দেখা

দিয়েছে। এখন সুবিমলের মুখে সেই কথা, নীলিমার স্বাস্থ্যের জন্য ঠিক তেমনি ধরণের উদ্বেগ দেখা দিয়েছে স্বামীর মনে। এমন কি হয় না, নীলিমার মত সুবিমলের আজকের এই উদ্বেগ আর আশংকাও এমনি সত্যি সত্যি ফলে যায়। আর সুবিমল সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে ওঠে। তা'হলে বেশ মজা হয়, তাহ'লে নীলিমা উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারে স্বামীর ওপর।

সুবিমল বলল, 'হাসছ যে।'

নীলিমা বলল, 'হাসছি তোমার কথা শুনে, আমার আবার শরীর! তার জন্য তোমার এত ভাবনা!'

সুবিমল বলল, 'অত বিনয় ভালো নয়। তোমার শরীরের জন্য ভাবব না, তোমার মনের জন্য ভাবব না তবে ভাবব আর পৃথিবীতে কিসের জন্য?'

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে সুবিমল অদ্ভুত একটু হাসল।

নীলিমার মুখে কেমন যেন একটু ছায়া পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তে সে-ও হাসিমুখে জবাব দিল, 'কিছু ভেব না, তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

সুবিমল মৃদু একটু হাসল, 'তাই থাকলেই হোল। এর চেয়ে বেশি ভরসায় আমার দরকার নেই।'

কালীমোহন তবু আমতা আমতা করলেন, বললেন, 'লোকে কি বলবে।'

মনোরমা বললেন, আর সে সব কথা যদি আমার সুবুর কানে যায় তাহলে তারই বা কেমন লাগবে।'

অতি দুঃখে নীলিমার হাসি পেল। স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী সকলের মনে সেই একই প্রশ্ন, সেই একই বিপদের আশংকা। অভাব অনটন সমস্ত সংসারকে গিলে ধ'রেছে কিন্তু স্থির আছে সেই অবিশ্বাস, সেই কুটিল সংশয়-প্রবণতা।

নীলিমা জবাব দিল, 'অত ভাবছেন কেন মা, আজকাল কত মেয়েই তো এমন ক'রছে। এতে নিন্দার কিছু নেই। আর নিন্দা-বন্দনার দিকে কান দেওয়ার এই কি আমাদের সময়?'

অন্য কোন সময় হ'লে পুত্রবধূর মুখে এই সব ছাপার অক্ষরের বড় বড় কথা মনোরমা সহ্য করতেন না, কিন্তু এখন চুপ ক'রে রইলেন।

রেখাই প্রথম পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভার নিল। নির্দিষ্ট দিনে এসে বলল, 'চল ঠাকুরঝি।'

পায়ে পুরোনো একজোড়া স্যাণ্ডাল, পরণে অনেক কাল আগের রঙ ফিকে হয়ে যাওয়া একখানা শাড়ি। রেখা তার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলি বলি ক'রে চুপ ক'রে গেল।

নীলিমা শ্বশুরের সামনে গিয়ে বলল, 'তাহলে আসি বাবা।'

কালীমোহনের কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে এল, বললেন, 'এসো মা। নিতান্ত দুরদৃষ্ট নাহ'লে কুললক্ষী তুমি, তোমাকে আজ বেরোতে হয় টাকার চেষ্টায়!'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু এ সময় ঝি-গিরিতেও যে আমার অপমান নেই বাবা।'

কালীমোহন বললেন, 'তবু আমি বেঁচে থাকতে—'

নীলিমা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আপনি বিচলিত হবেন না বাবা।'

কালীমোহন বললেন, 'না, আর বিচলিত হব কেন। আশীর্ব্বাদ করি তোমার কষ্ট যেন সার্থক হয়।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'খুব দেখে-শুনে সাবধান মত চ'ল মা।'

রেখা হেসে বলল, 'বউকে বুঝি খুব দূর দেশে পাঠাচ্ছেন তাঐমশাই। ভবানীপুর থেকে কালীঘাট,—ট্রামের মাত্র গোটাকয়েক ষ্টেপেজ, তাতেই ভেবে এত সারা হচ্ছেন! ভয় নেই, ঘণ্টাখানেক বাদেই আপনাদের বউকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

রায় সাহেবের এ-বাড়িতে কি একটা বিয়ের নিমন্ত্রণে নীলিমা এর আগে আরো একবার এসেছিল। কিন্তু সে আসায় আর এ আসায় পার্থক্য অনেক। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে গিয়ে নীলিমার পা যেন হঠাৎ আর এগুতে চাইল না, মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল।

রেখা বলল, 'কি ব্যাপার, অত ভাবছ কি ? দিন-রাত অমন ভাবনা কিন্তু ভালো নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের কথা মনে পড়ল নীলিমার, মনে পড়ল স্বামীর রুগ্ন শীর্ণ মুখ, নিজেদের নিঃসম্বল দীনতার কথা।

নীলিমা একটু হাসতে চেষ্টা করল, বলল, 'সে কথা ঠিক। চল।'

রেখার পিসীমা পিশেমশাই নীলিমাদের সাদরে বাড়ির ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

রায় সাহেব বললেন, 'কোন সংকোচ কোরো না।'

কাত্যায়নী বললেন, 'বাঃ, সংকোচ আবার কিসের। এ কি পরের বাড়িতে এসেছে না কি।'

পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন কাত্যায়নী। সুদর্শন স্বাস্থ্যবান্ পুত্র, সুন্দরী পুত্রবধূ, সাত-আট বছরের চঞ্চল সপ্রতিভ দুটি মেয়ে, চমৎকার দেখতে।

কাত্যায়নী বললেন, 'এরাই তোমার ছাত্রী নীলিমা—অঞ্জু আর মঞ্জু, ভালো নাম কৃষ্ণা আর কাবেরী। পরিচয়ের সময় সঙ্গে সঙ্গে ভালো নাম দুটিও আমাকে ব'লে দিতে হয়, না হ'লে ফল ভালো হয় না।' কাত্যায়নী হাসলেন।

দোতলার দক্ষিণ দিকের একটি ঘরে নীলিমাকে নিয়ে এলেন কাত্যায়নী। মেঝের ওপর দামী গালিচা পাতা। এক দিকে বাজনার নানা সরঞ্জাম ডুগি-তবলা, ছোট-বড় গুটি তিনেক সেতার নীল রঙের ঢাকনিতে ঢাকা।

কাত্যায়নী বললেন, 'সপ্তাহে দু'দিন ওস্তাদ আসেন অঞ্জু আর মঞ্জুকে সেতার শেখাবার জন্য। সেই সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাপও শেখে। খুব ভালো সেতার বাজায় আমাদের খোকা, এক দিন শুনো।'

নীলিমা বলল, 'গান-বাজনার দিকে সকলেরই বেশ ঝোঁক আছে এ-বাড়ীতে।'

রায় সাহেব পিছনে পিছনে এসেছিলেন। হেসে বললেন, 'তা একটু আছে। পেশায় আমরা চামার হ'লে হবে কি মা, নেশাটা সকলেরই একটু মোলায়েম।'

সহরতলীতে রায় সাহেবের ট্যানারী খ্যাতিলাভ করেছে।

সুমিতা বলল, 'বাবাও বেশ চমৎকার ডুগীতবলা বাজাতে পারেন।'

ভূমিকা হিসাবে হারমনিয়ম বাজিয়ে খান দুই গান গাইল নীলিমা। খুব ভালো জমল না। দু'-এক জায়গায় তালও কাটল। রায় সাহেব ভ্রূ কুঁচকালেন।

রেখা ননদের দোষ স্খালনের চেষ্টা করে বলল, 'অনেক দিন ধরেই তো চর্চা নেই কি না।'

কাত্যায়নী বললেন, 'থাকবার কথাও তো নয়। মনের যে শান্তিতে এখন রয়েছে।' নীলিমার দিকে চেয়ে বললেন, 'সব আমরা শুনেছি মা রেখার কাছে। কেমন আছে আজকাল সুবিমল? সত্যই ভারি কষ্ট হয় তোমার শ্বশুরেরর কথা ভেবে। এ বাজারে সংসারের খরচ চালিয়ে আবার হাসপাতালের খরচ জোগানো কি সহজ কথা! আর এ হ'ল একেবারে রাজা-রাজড়াদের ব্যাধি। রীতিমত রাজসূয় যজ্ঞ।'

নীলিমার গুণের চেয়ে, তার প্রয়োজন, স্বামীর অসুস্থতার অর্থ সাহায্যের কথাই যে ওঁরা বেশি বিবেচনা ক'রেছেন একথা নীলিমাও বুঝল, ওঁরাও বুঝিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লেও মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু বিঁধতে লাগল নীলিমার।

ফেরার পথে রেখা বলল, 'গান-বাজনাটা তোমাকে আরও একটু ভালো করে চর্চা করতে হবে ভাই।'

নীলিমা গম্ভীর ভাবে বলল, "তা তো হবেই।'

ওস্তাদ রেখে গান-বাজনা শেখার সুযোগ নীলিমা কোন দিন পায়নি, গরীব বাপের পক্ষে সে ব্যবস্থা করা সম্ভবও ছিল না। রেকর্ড রেডিয়ো শোনা বিদ্যা। স্কুলে গানের ক্লাসও মাঝে মাঝে দু-এক বছর হ'ত, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যেত। মাইনে উঠত কম। স্কুলের তহবিলে কুলোত না, নিজের উদ্যম উৎসাহেই যা কিছু শিখেছিল নীলিমা। শ্বশুরবাড়ীতে এসে সব আবার চাপা পড়ে গিয়েছিল। শ্বশুর-শাশুড়ী জিনিসটা বিশেষ পছন্দ করতেন না, সুবিমলেরও যে এদিকে খুব সখ-আগ্রহ ছিল তা নয়। তার পর এই দু'বছর ধরে গানের কথা ভাববার নীলিমার ইচ্ছাও হয়নি,

সময়ও হয়নি। আজ হ'ল—সখ নয়, আনন্দ নয়, প্রয়োজন আর পেশা। একটু অভ্যাস করে না গেলে ছাত্রীদের কাছে মান থাকবে না, এমন কি চাকরি যেতেই বা কতক্ষণ। কিন্তু চাকরি গেলে চলবে না নীলিমার। যেমন ক'রেই হোক স্বামীর হাসপাতালের খরচ তাকে সংগ্রহ ক'রতেই হবে। পরিচিত অর্দ্ধ-পরিচিতদের কাছে আর তাঁকে সে ভিক্ষা ক'রতে দেবে না। তার চেয়ে নিজে ভিক্ষা ক'রবে সেও ভালো।

বাড়ির অন্য কেউ উঠবার আগে খুব ভোরে উঠে গলা সাধতে বসে নীলিমা। দিন ভ'রে চলে সংসারের কাজ। দুপুরে কোন কোন দিন অবসর পেলে গানের সঙ্গে হারমনিয়ম বাজিয়ে হাত আর গলাটাকে চোস্ত রাখে, বিদ্যাটাকে একটু ঝালিয়ে নিতে চেষ্টা করে নীলিমা। যেদিন সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যায় সে দিন রাত্রেও আসর বসে নীলিমার ঘরে। দুই ননদ শান্তি আর সুধা এসে জোটে, বলে, 'বউদি, আমরাও শিখব, আমাদেরও শিখিয়ে দাও ভালো ক'রে। তার পর তোমার মত বেরোব টিউশানিতে তিন গুণ টাকা আসবে ঘরে।'

মনোরমা মাঝে-মাঝে ধমক্ দেন, 'কি যে তোরা আমোদ-আহ্লাদ গান-বাজনা করিস, তোরাই জানিস। এত স্ফূর্তি যে তোদের কি দেখে আসে তাই ভাবি। বাছা আমার হাসপাতালে ভুগছে আর বাড়ীতে তোরা দিব্যি গান-বাজনায় আনন্দ সোহাগে দিন কাটাচ্ছিস। যে শোনে সেইতো অবাক্ হয়ে যায়।'

বেদনায় নীলিমাও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার পর ঘরে এসে তাকায় দেয়ালে টাঙানো স্বামীর ফটোখানার দিকে। মনে অদ্ভুত বল পায় নীলিমা, মুখে হাসির আভাস দেখা দেয়। যে যাই বলুক কিছুতেই কিছু এসে যাবে না তার; সে তো জানে আমোদ-আহ্লাদ কিসের জন্য। তার বিদ্যা আজ কোন্ কাজে লাগছে, কি ভাবে সার্থক হ'তে চলেছে সে তো জানে, সুবিমল তো জানে।

'জানো তো? না তুমিও জানো না?'

ফটোখানাকে জিজ্ঞাসা করে নীলিমা। জবাব শোনবার জন্য দেয়াল থেকে সেখা না পেড়ে নিয়ে এসে অধীর আবেগে নিজের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে।

রায় সাহেবের ছেলে পুরন্দর একদিন সেতার বাজিয়ে শোনাল সবাইকে।

অঞ্জু বলল, 'আমাদের নীল মাসিও বাজাতে জানেন বাবা। সেদিন তোমার সেতার নিয়ে—'

পুরন্দর বলল, 'তাই না কি। আপনার যে এমন চুরি করার অভ্যাস আছে তা তো আগে বলেননি।

নীলিমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'বলবার মত কিছু নয়।'

পুরন্দর বলল, 'সে কথা ঠিক। চুরি কেউ বলে-কয়ে করে না। কিন্তু ধরাই যখন প'ড়ে গেছেন তখন তো একটু না শুনিয়ে পারবেন না।'

নীলিমা ভারি বিব্রত হয়ে পড়ল, 'বিশ্বাস করুন, সত্যি কিছু জানিনে আমি।'

পুরন্দর নীলিমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, 'আপনার অতখানি অনভিজ্ঞতা বিশ্বাস করা সত্যি শক্ত।'

নীলিমা বলে, 'সেটা আপনার বিশ্বাস করার শক্তির ওপর নির্ভর করে। ছেলেবেলায় একবার সুরু ক'রেছিলাম, তারপর আর হয়ে উঠল না।'

পুরন্দর বলল, 'বেশ তো এবার হবে। তখন সুরু ক'রেছিলেন, এখন শেষ ক'রবেন। আমাদের ওস্তাদজী নারায়ণ ত্রিবেদীর সঙ্গে তো আপনারও পরিচয় হয়েছে, তাঁর কাছেই তো শেখার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারেন।'

নীলিমা বলল, 'এক একবার অবশ্য এ কথা আমিও ভেবেছি। সেতারের ট্যুইশানে শুনেছি টাকাও বেশি পাওয়া যায়।'

পুরন্দর যেন একটু আহত হয়ে বলল, 'টাকা! ও, ভারি দুঃখিত। সে কথা আমার মনে ছিল না।'

জবাবে নীলিমা মৃদু একটু হাসল।

বহু অনুরোধ উপরোধেও নীলিমা সে দিন সেতারে হাত দিল না। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে ট্রামে পুরন্দরের পরামর্শটা তার কেবলি মনে পড়তে লাগল। সেতার শিখবার সত্যিই ভারি সাধ ছিল তখন। কিছু দিনের জন্য এক জন সৌখীন অল্পবয়সী দুটি স্বামি-স্ত্রী নীলিমার বাড়ির একতলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। তাঁদের ছিল একটি সেতার। নীলিমা সেই বউটির কাছে সবে শিখতে সুরু ক'রেছিল। হঠাৎ এক দিন ওদের সঙ্গে কলের জল নিয়ে দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল নীলিমাদের। তাঁরাও রাগ ক'রে বাড়ি থেকে উঠে অন্য কোথায় চ'লে গেলেন। তারপর নীলিমা অনেক চেষ্টা ক'রেছে সেতারের জন্য, কিন্তু কিছুতেই সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ক্রমে মা অসুখে পড়লেন, বাবার পুরোনো ভালো চাকরিটা গেল, কম মাইনের নতুন এক অফিসে ঢুকতে হ'ল তাঁকে। সেতারের কথা নীলিমা ভুলেই গেল।

ছাত্রীদের গান শেখাতে এসে আবার চোখে পড়ল সেই সেতার। বাজাতে দেখল অঞ্জু-মঞ্জুকে। কয়েক দিন রইল লোভ সম্বরণ ক'রে, শেষে এক দিন হাত দিয়ে বসল যন্ত্রে। আঙুলের ছোঁয়ায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠল তার, তার চেয়েও বেশি ঝঙ্কার লাগল নীলিমার হৃদয়ে!

কৃষ্ণা আর কাবেরী উদ্বেলিত হয়ে উঠল, 'ও মা, দেখ এসে। নীল মাসী—'

সেতার রেখে নীলিমা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল, 'চুপ, চুপ।'

মাঝখানে দু'তিন দিন গিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রে এল নীলিমা। তারপর নতুন ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখে গিয়ে বলল, 'হাত পাত।'

সুবিমল অনুমান করল জিনিষটা, তবু বলল, 'হাত কি আজ এই প্রথম পাতব?'

নীলিমা বলল, 'প্রথম ছাড়া কি। তোমরা কি কিছু পাততে জানো? হৃদয়ও আমরা পাতি, হাতও আমরা পাতি।'

তিন খানা নতুন দশ টাকার নোট ব্লাউজের ভিতর থেকে বের ক'রে স্বামীর হাতে নীলিমা গুঁজে দিল। আঙুলে আঙুলে মেশামেশি ক'রে রইল খানিকক্ষণ। ঝঙ্কারটা সেতারের চেয়ে কম হ'ল না।

নীলিমা বলল, 'পুরস্কার দেবে না ?'

সুবিমল বলল, 'দেব। ডক্টর কর বলছিলেন, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি। মাস তিনেকের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাব। একটু থেমে সুবিমল স্ত্রীর আনন্দে উচ্ছল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অন্য কোন পুরস্কার তো এখন আর হাতে নেই।'

নীলিমা বলল, 'মনে থাকলেই হবে।'

প্রথম প্রথম কিছু দিন বার-তের বছরের দেবর সুকোমল আসত নীলিমার সঙ্গে। রায় সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি এসে ফিরে যেত। ফেরার পথে আবার এসে দাঁড়াত ট্রাম-ষ্টপেজটার কাছে। দিন কয়েক পরে নীলিমা তাকে রেহাই দিল। বলল, 'থাক, আর তোমাকে পথ দেখাতে হবে না সুকু। তুমি তোমার পড়া করো গিয়ে।'

সুকু রসিকতা ক'রে জবাব দিত, 'ভয় ক'রবে না তো বউদি ? হারিয়ে যাবে না তো ?'

নীলিমা সস্নেহে দেবরের গাল দুটি টিপে দিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'না গো না, হারাই-ই যদি খুঁজবার লোক তো আমার রয়েইছে ?'

গান শিখিয়ে ফেরবার সময় নীলিমাকে পুরন্দর আজ বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিল, বলল, ত্রিবেদীজীকে আমি বলেছিলাম। তিনি রাজী হয়েছেন।'

নীলিমা একটু হাসল, 'কিন্তু আমি যে রাজী হব একথা আপনি কি ক'রে জানলেন ?'

পুরন্দর বলল, 'রাজী হ'লেই তো লাভ। না হয়ে লাভ কি ?'

নীলিমা বলল, 'আপাততঃ দেখছি তো লোকসান। অত গুরু-দক্ষিণা কোথায় পাব।'

পুরন্দর বলতে যাচ্ছিল, 'সেজন্য ভাববেন না,' কথাটা তাড়াতাড়ি বদলে দিয়ে বলল, 'সকলের কাছ থেকে দক্ষিণা তিনি নেন না। তা ছাড়া আপনার কথা আমি তাঁকে সব বলেছি।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু যেখানে গুরু হয়ে যাচ্ছি, সেখানে শিষ্য হব কি করে, ছাত্রীদের কাছে মান যাবে যে।'

পুরন্দর বলল, 'ছাত্রীদের বাড়িতে কেন। আপনাকে একেবারে খোদ গুরুপাটে নিয়ে উপস্থিত ক'রব। তাহ'লে তো আর কোন আপত্তি থাকবে না।'

নীলিমা ট্রামে উঠতে উঠতে বলল, 'আচ্ছা, ভেবে দেখব আপনার কথা।'

পুরন্দর বলল, 'হ্যাঁ, দয়া ক'রে একটু ভাববেন।'

নীলিমা ভালো ক'রে ভেবে দেখল। এই সুযোগে সেতারটা শিখে নিতে পারলে সত্যিই মন্দ হয় না। বাজনা জানা থাকলে টুইশানিতে আরো বেশি টাকা পাওয়া যায়। আর টাকার তো এখনো কত দরকার। সংসারে কিছু দিতে হবে। না হলে শ্বশুর মনে ক'রবেন কি? স্বামী যদি উপার্জনের সমস্ত টাকা তাঁর জন্য ব্যয় ক'রতেন তখন শ্বশুর-শাশুড়ী যা ভাবতেন এখনো প্রায় তাই-ই ভাববেন। তা ছাড়া তিন মাস পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে সুবিমলকে কি কলকাতার এই বদ্ধ গলির মধ্যে ভ'রে রাখবে না কি নীলিমা! অন্ততঃ দু'এক মাসের জন্যও ভালো কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠিয়ে দেবে চেঞ্জের জন্য। আর সেই চেঞ্জের টাকা এই ভাবেই সংগ্রহ ক'রতে হবে নীলিমাকে। কেবল গলায় আর হারমনিয়মে সে টাকা উঠবে না, তার জন্য সেতার দরকার।

নারায়ণ ত্রিবেদীর বয়স ষাটের কাছাকাছি, বয়সের অনুপাতে শরীর বেশ শক্তই আছে। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, ঋজু উন্নত চেহারা। মুখে শান্ত

প্রসন্নতা। শোনা যায় অনেক শোক-তাপ পেয়েছেন জীবনে। পুত্র-কন্যার অকালমৃত্যু হয়েছে, নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রী সম্বন্ধেও নানা রকম বিষয় চিন্তা আছে। কিন্তু সে ইতিহাস লোকের চোখের সামনে ধরে রাখেননি। নিজের অন্তরের মধ্যেই তা তিনি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। মাঝেমাঝে গভীর রাত্রে সেতারের আলাপে কেবল তার আভাস পাওয়া যায়। অন্য কোন আলাপ আলোচনায় ধরা যায় না।

প্রৌঢ়া একটি বালবিধবা বোনকে নিয়ে তিনি থাকেন হরীশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের পুরোনো একতালা বাড়ীর দুখানা ঘর নিয়ে। পুরন্দর নীলিমাকে এক দিন বিকালে নিয়ে এল সেখানে।

নীলিমা পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রলে ত্রিবেদী স্মিত মুখে আশীর্ব্বাদ জানালেন, বললেন, 'কোন ভাবনা নেই। সব তিনি শুনেছেন পুরন্দরের কাছে।'

নীলিমা বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ ক'রল, টুইশানিতে আসবার আগে আসে এখানে। কিছুক্ষণ বসে বসে বাজায়; ত্রিবেদী চেয়ে চেয়ে দেখেন। মাঝে-মাঝে কেবল হেসে মাথা নাড়েন, হোল না। •

অদ্ভুত ধৈর্য। কোন বিরক্তি নেই, তিরস্কার র্ভৎসনার আভাস নেই, এমন সহিষ্ণুতা সাধারণতঃ দেখা যায় না।

কিন্তু ধৈর্য্য নেই নীলিমার নিজের। প্রায়ই প্রশ্ন করে আর কত দিন বাকি। কত দিনে অন্ততঃ কাজ চালাবার মত বিদ্যাটা আয়ত্তে আসবে। টাকা রোজগার করতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীকে শিখিয়ে।

ত্রিবেদী হাসেন, বলেন, 'যা আনন্দের জিনিষ তাকে তুমি এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনে লাগাতে চাচ্ছ। আনন্দকে ছাপিয়ে প্রয়োজন তো এক দিন বড় হয়ে উঠবেই, কিন্তু তা আজই কেন?'

নীলিমা চুপ ক'রে থাকে। তিরস্কারের জন্য দুঃখ করে না। ত্রিবেদী কি করে বুঝবেন তার প্রয়োজনের কথা, যার সঙ্গে আনন্দের কোন ভেদ নেই কিংবা যা আনন্দের চেয়েও অনেক বড়।

অনেক ইতস্ততঃ ক'রে নীলিমা কিছু টাকা ধার চেয়ে পুরন্দরের কাছে একটা সেতার কিনবে বলে। পরে শোধ করবে।

পুরন্দর জবাব দিয়েছিল, 'ভুল করেছেন, আমি মহাজন নই। নিতান্তই অভাজন মাত্র। টাকা নেই তবে একটা জিনিষ আছে সেটা ধার দিলেও দিতে পারি।' বলে পুরন্দর একটু হাসল।

নীলিমা শঙ্কিত হয়ে উঠল, পাছে পুরন্দর বেফাঁস কিছু বলে ফেলে।

পুরন্দর তার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'ভয় করবেন না, বাজে অকেজো জিনিষ রাখবার মত বাড়তি জায়গা আপনার নেই তা জানি, সে সব কিছু নয়। আমার সেতারটাই নিন্, আপনার কাজে লাগবে।'

নীলিমা কিছুক্ষণ মুখ নীচু ক'রে রইল; তারপর বলল 'কিন্তু আপনি কি বাজাবেন?'

পুরন্দর একটু হাসল, 'সে জন্য ভাববেন না। এমন জিনিষ রইল, যা না বাজালেও বাজবে।'

এর পর এ টিউশানি রাখতে আর সাহস ক'রল না নীলিমা। ইতিমধ্যে আরো দুটি টিউশানির খোঁজ এসেছিল। নিজেই একটু অগ্রসর হয়ে সে দুটিকে নিয়ে নিল। কিন্তু সেতারটা পুরন্দরকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে চক্ষুলজ্জায় বাধল। কিংবা হয়তো কেবল চক্ষুলজ্জাই নয়। সেতারটা রয়ে গেল তার হাতে।

নীলিমা ভাবল, রইলই বা। হাতের জিনিষ বেশির ভাগ সময় জিনিষ হয়ে হাতেই থাকে মালিক হয়ে মনে গিয়ে পৌছায় আর কত দিন কতক্ষণ। ইচ্ছা ক'রে চেষ্টা ক'রে বিস্মৃতিকে ডেকে আনতে হয় না, সে আপনিই এসে দেখা দেয়।

নীলিমা সুবিমলকে গিয়ে এক দিন বলে আসল তার চেঞ্জের পরিকল্পনার কথা।

সুবিমল হেসে বলল, 'বেশ তো।'

না, বেশ তো নয়। সুবিমলকে সত্যি সত্যি দেখিয়ে দেবে তার সাধ্যের সীমা কতখানি। খুঁজে খুঁজে নীলিমা সেতারের টিউশানিও নিল। চেষ্টা ক'রল রেডিয়োতে। প্রোগ্রাম-ডিরেক্টর বললেন, 'কিন্তু আমরা তো নতুন শিক্ষার্থীদের তেমন সুযোগ দিতে পারিনে, টাকা দেওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে না।'

নীলিমা অম্লান মুখে বলল, 'কিন্তু আমার কথা শুনলে আপনি না ক'রতে পারবেন না।'

প্রোগ্রাম-ডিরেক্টর শুনলেন এবং সত্যিই আর না ক'রলেন না।

অদ্ভুত উত্তেজনায় পেয়ে বসল নীলিমাকে। স্বামীর জন্য শুধু হাসপাতালের খরচই নয় তার চেঞ্জের টাকাও সংগ্রহ ক'রতে হবে। যত্র তত্র সে গান শেখাতে লাগল। সেতার শেখাতে গিয়ে কোন কোন জায়গায় অপদস্থও হ'ল, তবু হটল না।

নারায়ণ ত্রিবেদী বললেন, 'অত অধীর হয়ো না মা। অকালে শক্তির অমন অপচয় কোরো না। তাকে সঞ্চয় কোরো নিজের মধ্যে। ভবিষ্যতেও তার প্রয়োজন হবে।'

তিন মাসের পর আরো মাস দুই গেল। তারপর সুবিমলের সত্যিই ছাড়া পাবার দিন এল। একটি দিন মাত্র মধ্যে। এদিকে শ'-তিনেক টাকার মত প্রায় জমিয়ে তুলেছে নীলিমা। আর পঁচিশটা টাকা হ'লে সংখ্যা পূর্ণ হয়। আপাততঃ এতেই হবে। সুবিমল বাড়ী এলে টাকার তোড়াটা তাকে উপহার দেবে নীলিমা, বলবে, 'দেখ পেরেছি কি না।'

পঁচিশটা টাকার কথা ভাবছে নীলিমা এই সময় আমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে এল উত্তর কলকাতার এক দল ছেলে। রঙ-মহল থিয়েটার ভাড়া নিয়ে তারা এক জলসার অয়োজন ক'রেছে। টাকাটা যাবে বন্যাপীড়িত দুর্গত-সেবার তহবিলে। সহরের বড় বড় সব শিল্পীরা আসবেন। তাঁদের সঙ্গে নীলিমারও ডাক পড়েছে।

নীলিমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'এঁদের মধ্যে আমাকে কেন? আমার কোন্ যোগ্যতা আছে?'

দলপতি গোছের কয়েক জন এগিয়ে এল, মধুর হেসে বলল, আছে। সেবার অধিকার তো সকলেরই। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে বিশেষ দাবীও আছে নীলিমার। সে নিজেকে যতখানি ছোট বলে মনে করে তা সে নয়।

এদের মধ্যে দু'-একজন রেডিয়োতে দেওয়া নীলিমার দু'-একটা

গানের কথা উল্লেখ ক'রল। ছোট একটি পেশাদারী জলসায় তার সেতার না কি অদ্ভুত হয়েছিল শুনতে।

অদ্ভুত, হ্যাঁ অদ্ভুতই লাগল নীলিমার। প্রথম প্রথম স্বামীর রোগের কথা শুনে লোকে তাকে অনুকম্পা ক'রে টাকা দিয়েছে। মাঝে মাঝে একটু খোঁচা লাগত মনে, ক্রমে সেটাই তার অভ্যাস হয়ে এসেছিল। যেখানে এ রকম পক্ষপাতিত্ব তার জুটত না নৈপুণ্যের অভাব দেখে লোকে তাকে তুচ্ছ ক'রত, অনাদর ক'রত, সে সব জায়গায় নীলিমাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে স্মরণ করিয়ে দিত বিদ্যায় তার দীনতা থাকলে কি হবে অন্তরে সে সমৃদ্ধ। সে টাকা তুলছে দুঃস্থ যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত স্বামীর জন্য, নিঃস্ব অর্দ্ধভুক্ত পরিবারের জন্য। তাতেও টাকাও আসত, নিজের শিল্প-কুশলতার অভাবের জন্য ক্ষোভ এবং গ্লানিও কম হোত। মাঝে মাঝে উপরি পাওনা হিসাবে কোন জায়গা থেকে প্রশংসা অবশ্য এসেছে, কোন কোন মুহূর্তে গুন্‌গুন্ ক'রে গাওয়া পরিচিত গানের একটি কলি মনকে আচমকা দোলা দিয়ে গেছে ; মনে হয়েছে এর সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না, সমস্ত কর্তব্য এর কাছে মিথ্যা, সকল উদ্দেশ্য এর কাছে অর্থহীন। কিন্তু মনের এই মোহকে নীলিমা বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দেয়নি। আদর্শের পথে কর্তব্যের পথে বাধা বলে ত্যাগ ক'রেছে। তাছাড়া শুধু আদর্শ আর কর্তব্যই তো নয় হৃদয়ের দাবী, প্রেমের দাবী তার মনকে একাত্ম করে অধিকার করেছে। কিছুতেই অন্যমনস্ক হ'তে দেয়নি।

কিন্তু আজ যখন ক্ষুদ্র সিদ্ধি তার করায়ত্তপ্রায় তার ছোট হৃদয়ের আর ক্ষমতার মাপে মাপা, তখন এল বৃহত্তর জগতের আহ্বান, মহত্তর সার্থকতার সম্ভাবনা।

নীলিমা শুনল, তার কৃতিত্ব আছে, নৈপুণ্য আছে, তার গান অনেকের সত্যি সত্যিই ভাল লেগেছে, তার সেতার অনেকের মনেই অনুরণন জাগিয়েছে। আর শুধু তাই নয় তার এই দক্ষতা আরও বড় কাজে লাগছে, ব্যাপকতার সেবায় ব্যয়িত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে আসবেন দেশের বড় বড় শিল্পী, যাঁদের অনেকের সে কেবল নামমাত্র শুনেছে। তাঁদের সে আজ স্বচক্ষে দেখবে, গান শুনবে, গান শোনাবে।

উদ্যোক্তাদের কাছে সবিনয়ে সম্মতি জানাল নীলিমা। বলল, তার যোগ্যতা যদি সত্যিই কিছু থাকে তবে তা দেশের কাজে লেগে ধন্য হোক্।

সুবিমল আসবে কাল বাড়ি। এক হাতে নীলিমা ঘর গুছাল, ঘর সাজালো, কিন্তু আর এক হাত রইল তার সেতারের তারে। ঘর কন্নার ফাঁকে ফাঁকে সেতারে তুলতে লাগল তার সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত, তার শিল্প-কুশলতার চরম নৈপুণ্য। কাল জগৎ তার যথার্থ পরিচয় পাবে। সে ছোট নয়, দীন নয়, অকৃতার্থ নয়।

পরদিন খানিকটা বেলা হ'তে না হতেই সুবিমল এসে পৌঁছল। বাড়িতে তার আগে থেকেই উৎসব সুরু হয়েছে। ভাইবোনদের ছুটোছুটির অন্ত নেই। বাপ এলেন, রুক্ষ কঠিন তার মুখ, কিন্তু ভিতরের আনন্দ তবু যেন চাপা থাকছে না। মা এলেন গৃহদেবতা নারায়ণের আশীর্ব্বাদ নিয়ে, মনের আনন্দ চোখের জলে টলটল করছে। প্রতিবেশীরা এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন। কাছের বন্ধুরা খবর পেয়ে এল দেখা করতে।

এক ফাঁকে নীলিমাকে নির্জনে পেল সুবিমল, বলল, 'সবচেয়ে তোমার কৃতিত্ব বেশি।'

নীলিমা বলল, 'আস্তে, কেউ শুনে ফেলবে।'

সুবিমল হাসল, 'কারো যেন শোনার বাকি আছে। তার পর তোমার সেই টাকার তোড়া কই? সেই চেঞ্জে পাঠাবার তোড়া।'

মন্ত্রগুপ্তি ঠিকমত রাখতে পারেনি নীলিমা। হাসপাতালে এক দিন কথায় কথায় খুসির ঢেউয়ে গোপন কথা ভেসে এসেছে।

নীলিমা মুখ ম্লান ক'রে বলল, 'তোড়া পূর্ণ হয়নি। গোটা-পঁচিশেক টাকা কম আছে।'

সুবিমল হাসল, 'মাত্র! কিন্তু তোড়া পুরাবার পঁচিশ টাকার চেয়েও বেশি দামী জিনিষ এখানে আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

কিন্তু দুপুরের পর বিকাল, বিকালের পর সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসতে লাগল নীলিমার মন ততই চঞ্চল হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে এক একবার সেতারের কাছে গেল আবার ফিরে এল।

সুবিমল লক্ষ্য করে বলল, 'ব্যাপার কি।'

নীলিমা কুণ্ঠায় সংকোচে অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'একটু বাইরে যেতে হবে।'

সুবিমলের মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে প'ড়ে যাওয়ায় হাসিমুখে বলল, 'ক্ষেপেছ, এত কাল বাদে আমি এলাম ঘরে আর তুমি যাবে বাইরে! টিউশনি-টানিতে আর কাজ নেই। তিনশো টাকায় ঘরে ব'সে দিব্যি তিন মাস খাব আর ঘুমাবো।'

নীলিমা বলল, 'টিউশানি নয়।'

সুবিমল বলল, 'তবে কি জলসা-টলসা গোছের কিছু নাকি? তার আর দরকার নেই। তারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনেছে নীলিমা বাইজীর ভূতপূর্ব স্বামী এসেছে ফিরে, যমের দুয়ার থেকে, যমের হাত থেকে যমদণ্ড কেড়ে নিয়ে। আজ কেবলমাত্র একটিমাত্র জলসা হবে, কেবল তোমাতে আমাতে। তুমি একমাত্র গীত-সরস্বতী। আমি গুণমুগ্ধ নারায়ণ।' একটু হেসে 'ধরো, এই নাও।' বলে নিজেই সুবিমল সেতারটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। তারপর দোর দিল ভেজিয়ে।

নীলিমা কাতর স্বরে বলল, 'আজ থাক।'

সুবিমল বলল, না নীলিমা, আজই। রোগের বীজ আজ হয়তো চাপা আছে, কালই যে আবার ভেসে উঠবে না তার ঠিক কি? ডাক্তারের কথায় অত সহজে ভুলো না। তুমি বাজাও নীলিমা, আমি আজই একটু শুনব। তোমার সুর বেচে কেবল তুচ্ছ টাকাই এত দিন দিয়েছ, আজ অত অল্পতে ভোলাতে পাবে না। আজ তোমার সেই আসল সুর আমাকে শোনাতেই হবে। এত দিন তো হাত পাততে সংকোচ করিনি, আজ হৃদয় নিয়ে উন্মুখ হয়ে আছি বলেই কি তোমার এত দ্বিধা, এত কার্পণ্য।'

সুবিমল থামল। নীলিমার সেতার বাজতে লাগল। সেই সুর, যা আজ দুদিন ধ'রে মনের মধ্যে গুন্‌-গুন্‌ ক'রে ফিরছে, সেই সুর যা সে দেশের গুণিজনকে শুনাবে ভেবেছিল, তারে তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সেই রাগিণী। হঠাৎ এক সময় চমকে উঠল নীলিমা। কানে গেল সদর দরজার কড়া নড়ছে।

কান পেতে একবার শুনে নিল নীলিমা। নিজের সেতারের বাজনার চেয়েও যেন মধুর আর অপূর্ব ঐ কড়ানাড়ার নিক্কণ।

সুবিমল বলল, 'বাঃ, চমৎকার হচ্ছে, বাজাও, থেমো না।'

নীলিমা থামল না।

ভোগবতী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এ পারে বাঙলা, ওপারে মানভূম। পাথর মেশানো রাঢ়ের অনুর্বর কঠিন বিস্তারের ওপর দিয়ে রাঙা সুরকির পথ। মাঝে মাঝে, শালের ঘন-বিন্যাস। হিমালয়ের বুকে শালবীথির যে সমুন্নত উদ্ধত মহিমা—এরা যেন তাদের সংক্ষিপ্ত হাস্যকর সংস্করণ। আকন্দের ঝোপের মতো রাশি রাশি পলাশও মাঝে মাঝে বিকীর্ণ হয়ে আছে, ওই পলাশবন যে বসন্তে রাঙা ফুলের চেলী পরে নিজের বিন্দুতম শ্যামালিমাকেও নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে—এটা যেন কেমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

কিন্তু এ দেশটার রীতিই এই। যেন জগৎটাকে সৃষ্টি করবার আগে বিশ্বকর্মা এখানে তাদের ছোটখাট কতকগুলো মডেল তৈরী করে নিয়েছিলেন। অথবা যেন পৃথিবীর বড়সড়ো আকারের একটা রিলিফ ম্যাপ। নদী আছে, কিন্তু মোটা মোটা বালির দানা আর ছোট বড় পাথরের টুকরোর ভেতর দিয়ে তাদের জলের ধারাটা একফালি অভ্রের পাত বলে ভুল হতে পারে। আর আছে পাহাড়। শুধু রাত্রির অন্ধকারে যেখানে বার্ণপুরের চিমনির আভায় কালো দিগন্তটা লাল হয়ে থাকে, সে দিকটা ছাড়া আর তিন দিকেই চলেছে পাহাড়ের অনন্ত শ্রেণী।

একদিকের দুরান্ত রেখায় পঞ্চকোট, অন্যদিকের চক্রবালে শুশুনিয়া পাহাড়ের অলক্ষ্যপ্রায় ছায়ামূর্তি। মাঝখানে বিহারীনাথ পাহাড়।

তা ছাড়া ছোট বড় অখ্যাত ও অজ্ঞাতনামা পাহাড়ের কোন সীমাসংখ্যাই নেই। কোনোটায় পলাশের জঙ্গল, কোনোটা একেবারে ন্যাড়া। নিতান্তই জংলা—শতমূলী সহস্রমূলী থেকে সুরু করে দু'হাত উঁচু আবলুশ গাছ আর নলবনের মতো সরু সরু পাহাড়ী বাঁশ—অথবা বাঁশের ক্যারিকেচার। তাতে কখনো কখনো বাঘের সন্ধান পাওয়া

যায় আর মাঝে মাঝে দেখা হয় শঙ্খচূড় সাপের সঙ্গে। স্বল্প বিস্তীর্ণ একটী ব্যাসার্ধে'র ভেতরে সমস্ত পৃথিবীর ভূগোল-পরিচয়।

বহু দূরে দূরে ভদ্রলোকের গ্রাম। আর সাঁওতাল—সব সাঁওতাল। চাষী সাঁওতাল, খেড়ে সাঁওতাল। চাষী সাঁওতালরা ভদ্রপাড়ার কাছাকাছি এসে বাসা বেঁধেছে, চাষ করে, সবজী লাগায়। জামা কাপড় পরে তারা, কখনো কখনো কাঁচা চামড়ার ফাটা কাটা মোটা জুতোও। আর খেড়ে সাঁওতালের কোমরে এখনো লেংটি, কানে ফুল গোঁজা, মাথায় বাবরী, হাতে কাঁড় বাঁশ। ভাতের মহিমা কিছু উপলব্ধি করে তারা এখনো পুরোপুরি 'ভেতো' হয়ে উঠতে পারেনি, বনে জঙ্গলে প্রচুর প্রাণপ্রাচুর্য্য নিয়ে তাদের প্রাকৃতিক খাদ্য ছড়িয়ে পড়ে আছে।

এদের মাঝামাঝি যারা, তারা কাঠুরে। ভদ্রলোক জমিদার বাবুদের পাহাড়ে তারা বিনা-অনুমতিতে কাঠ কাটে। এসব পাহাড়ে তাদের জন্মগত অধিকার। দশ মাইল দূরের জমিদার কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনের বলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এ সমস্ত পাহাড়ের ভোগ দখলের অধিকারী, তাদের স্থূল মস্তিষ্কে সেটা সহজে প্রবেশ করে না।

দূরের থেকে যে পাহাড়টাকে কাল-বৈশাখী মেঘের মতো নিবিড় নীলবর্ণ বলে মনে হয় ওর নাম ভৈরব পাহাড়। ওর সর্বাঙ্গে জঙ্গল, নিবিড় জঙ্গল। মাটি আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জন্মেছে যেন প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য। কিন্তু ছোট পাহাড়টির মতো গাছগুলিও ছোট ছোট—জ্বালানি ছাড়া কোন কাজেই তারা লাগে না।

এই পাহাড়ে কাঠ কাটতে এল শুকলাল আর সোনা। ভোর হয়ে আসছে। বার্ণপুরের আকাশে রক্তাভা ফিকে হয়ে আসছে—আর রাঙা রঙ ধরছে শুশুনিয়ার ছায়ামূর্তির আশে পাশে। হালকা শিশিরে ভেজা পাহাড়ী গাছ গাছড়া আর রাঢ়ের রাঙা মাটির বুক থেকে উঠছে প্রতি দিনের পরিচিত লঘু একটী মিষ্টি গন্ধ।

ঝাঁকড়া তিন চারটে মহুয়া গাছের তলা থেকে এখনো রাত্রির অন্ধকার সরে যায় নি। সেটাকে পাশ কাটিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল শুকলাল, পেছন থেকে সোনা তার হাত চেপে ধরলে।

—এই মোড়লের পো, বাবাঠাকুরকে প্রণাম করলিনে ?

থেমে দাঁড়িয়ে শুকলাল হাসল।

—ঠাকুরের ঘুম এখনও ভাঙেনি। জাগালে রাগ করবে। দেরী করিসনি সোনা, চল।

সোনা ভ্রূকুটি করলে: মস্করা করিসনে খালভরা। ঠাকুরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছিস, পাহাড়ে তোকে বাঘে ধরবে দেখিস। আয় প্রণাম করে যা ঠাকুরকে।

নিজের পেশল শরীরটার দিকে একবার তাকালো শুকলাল। পলি মাটির দুলাল নয়, পাথুরে দেশের পাথরে তৈরী দামাল ছেলে। বললে, বাঘের বরাত মন্দ না হলে বাঘ আমাকে ধরতে আসবে না।

—থাক, থাক—খুব মরদ হয়েছিস, গলার স্বরে অবজ্ঞা ফোটাবার চেষ্টা করলেও সেটা ফুটল না। কালো সাঁওতাল মেয়ের কালো চোখে আনন্দিত গর্বের আলোই ঝিলিক দিয়ে গেল। সত্যিই অহংকার করবার অধিকার আছে শুকলালের। তার কুড়ুলের ঘায়ে শুধু গাছালিই নয়, শক্ত পাথর পর্য্যন্ত গুঁড়ো হয়ে যায়। শুকলালের চওড়া বুকের উপর খেলা করে গেল সোনার সস্নেহ দৃষ্টি। আর তেমনি সপ্রেম গভীর চোখে সোনার ওপরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে শুকলাল। শুশুনিয়া পাহাড়ের আকাশে রঙের সমুদ্রে ডুব দিয়ে রক্ত পদ্মের মতো সবে ফুটে উঠেছে প্রথম সূর্য। সোনার যৌবনোজ্জ্বল দেহেও তার আভাস এসে পড়েছে—যেন তারও ভেতরে কোথায় পাপড়ি মেলেছে ভোরের পদ্ম। হাওয়ায় কাঁপা পদ্মপাতার শ্যামলতা তার ভেতরেও যেন হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে।

চকিতে চোখ নামিয়ে নিলে সোনা। বললে, আয়, প্রণাম করবি। মহুয়াকুঞ্জের তলায় ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার—অবসিত রাত্রি আর ছায়ার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটছে এতক্ষণে। পাথরের ঠাকুরও বোধ হয় ঘুমভরা চোখ মেলে জেগে উঠছেন, মহুয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে কালো গ্রানিটের ওপরে পড়েছে টুকরো টুকরো রঙের ফালি।

পাহাড়ের নীচে প্রতীহারী হয়ে আছেন বাবাঠাকুর। চওড়া একখানা শিলাপট্ট—মাটির ভেতরে আধাআধি পরিমাণে সমাহিত। তার মাথার

ওপর ছেনি দিয়ে কাটা একটা সিংহের আকৃতি। নীচে অশ্বারোহী একটা বীর পুরুষের মূর্তি—তার প্রসারিত হাতে খোলা একখানা সুদীর্ঘ তরবারি, বোঝা যায় কোন দিগ্বিজয়ী রাজা নিজের শৌর্য-বীর্যকে অক্ষয় করে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। শিলাপট্টের গায়ে কিছু কিছু লেখাও আছে, তার আভাসমাত্র পাওয়া যায়। বাকিটা তলিয়ে আছে মাটির নীচে—হয়তো ভবিষ্যৎকালের কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদের হাতে মুক্তির প্রতীক্ষায়।

কিন্তু এসব বোঝবার শিক্ষা-দীক্ষা নেই সরল সাঁওতালের। গাছ-তলায় একটা বড় পাথর দেখলেই তারা সিঁদুর মাখিয়ে পূজো করে, একটা ভাঙা মূর্তি দেখলেই থান বসিয়ে দেয় মুরগী বলি। তাই এখানকার বিস্মৃতনামা রাজা রূপান্তরিত হয়েছেন পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা ভৈরব ঠাকুরে।

ঠাকুর প্রণাম করে পাহাড়ে উঠল শুকলাল আর সোনা। কাঠুরেদের যাতায়াতে জঙ্গল ভেঙে দু-একটা সরুপথ আপনা থেকে তৈরী হয়েছে এদিকে ওদিকে—সরীসৃপ গতিতে পাহাড়ের চারিদিকে পাক খেয়ে গেছে। তা ছাড়া দুর্ভেদ্য জঙ্গল—পাথরের চাঙাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মাটির ভেতর রাশি রাশি বুনো গাছ আর লতার জটিলতা। কাঁটা গাছের মাথায় হাওয়ায় দুলছে বন-ধুঁদুল। মাঝে মাঝে ফুটছে ভুঁইচাপা আর কাঠগোলাপ। কোথাও কোথাও বেগুনে রঙের ফুলের বাহার নিয়ে পাথরের আড়ালে উঁকি দিচ্ছে লজ্জাবতী। ছোট ছোট পাখী নেচে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে।

শুকনো আধ-শুকনো গাছ খুঁজে কুড়ুল চালাতে লাগল শুকলাল আর মোটা একটা গুলঞ্চের লতা দিয়ে খড়ির আঁটি বাঁধতে লাগল সোনা। ওরই এক ফাঁকে কখন দুটো ধুঁদুল সংগ্রহ করেছে সোনা, গোটা কয়েক কাঠগোলাপও সাজিয়ে নিয়েছে খোঁপায়। সংসারের কথা ভোলেনি, সেই সঙ্গে একটুখানি অঙ্গরাগও করে নিয়েছে। মাঝে মাঝে একটা গানের কলিও গুন্ গুন্ করে উঠছে। কিন্তু আপাতত তার দিকে নজর নেই শুকলালের। বিশ্রামহীন ভাবে তার কুড়ুল চলছে, মড় মড় খট্ খট্ শব্দে ভেঙে পড়ছে গাছ আর গাছের ডাল। আর থেকে থেকে বাঁ হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলছে কপালে জমে ওঠা বড় বড় ঘামের বিন্দুগুলো।

এর মধ্যেই কখন উঠে গেছে অনেকখানি বেলা। শুশুনিয়া পাহাড়ের

মাথা ডিঙিয়ে সূর্য উঠে এসেছে আকাশের মাঝখানে। পাথর গরম হয়ে উঠেছে—চারদিক থেকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ছে একটা বাষ্পীয় উত্তাপ। এতক্ষণ পরে হাতের কুড়ুল নামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল শুকলাল—হাঁপাতে লাগল।

ওদিকে পিঠের বোঝাটাও বেশ ভারী হয়ে উঠেছে সোনার। রোদে টক্ টক্ করছে মুখ। দুজনে দুজনের দিকে তাকালো।

শুকলাল বললে, ভারী গরম।

শ্রান্ত গলায় জবাব দিলে, এখন থাক। ঝোরার কাছে চল।

ঝোরা! মনে পড়তেই যেন শান্তি আর তৃপ্তির একটা স্নিগ্ধ অনুভূতি এসে সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিলে ওদের। ঝোরা। এই বিস্তীর্ণ নির্মম পাষাণের বুকের থেকে উচ্ছলিত ফল্গুর প্রবাহ। পাহাড়ের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা ভাঁজ পড়ে যেখানে ছোট একটা মালভূমির মতো সৃষ্টি হয়েছে—ওইখানে—ছোট অশ্বত্থ আর ছোট পলাশের ছায়াকুঞ্জের ভেতর প্রকাণ্ড একখানা পাথরের তলা দিয়ে একটা ঝর্ণা নেমেছে এসে। এত বড় পাহাড়ে ওটা ছাড়া আর কোথাও একবিন্দুও জল নেই। ওই জলটা কোথা থেকে নিঃশব্দ প্রবাহে যে বয়ে আসছে কেউ বলতে পারে না— কিন্তু মাটির তলা থেকে উৎসারিত ভোগবতী ধারার মতোই ওর ঠাণ্ডা আর মিষ্টি জল কঠিন পাহাড়টার মর্মবাহী স্নেহের মতো উছলে পড়ছে।

হাতের কুড়ুল আর পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে পাথর বেয়ে বেয়ে ঝর্ণার পাশে এসে বসল দুজনে। চারপাশে নিবিড় ছায়া দুপুরের রোদে যেন ঝিমুচ্ছে। পাহাড়ে যে দু'চারটে বড় গাছ আছে—এখানেই যেন তারা সার বেঁধে রয়েছে। ইচ্ছে করেই ওদের গায়ে হাত দেয়নি কাঠুরেরা। রাঢ়ের আগুন ঝরা দুপুরে পাথরের অসহ্য উত্তাপের ভেতর এখানে ওদের মরুদ্যান। পাথরের তলা থেকে বেরিয়ে নীচে যেখানে ছোট একটা গর্তের ভেতরে একটুখানি জল জমেছে, দুটো নীলকণ্ঠ পাখী পরমোল্লাসে সেখানে স্নান করছিল পাখা ঝেড়ে। মানুষের সাড়া পেয়েও তারা ভয় পেলো না, ধীরে সুস্থে তারা ঠোঁট দিয়ে নিজেদের সদ্যঃস্নাত নরম পালকগুলোকে পরিষ্কার করে নিলে। তারপর মিষ্টিগলায় কী একটা ডেকে উঠে লাফাতে লাফাতে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ততক্ষণে সোনা আর শুকলাল এসে বসেছে ছায়ার নীচে। মিঠে বাতাসে দুজনের ক্লান্তি যেন এক মুহূর্তে দূর হয়ে গেছে। সোনার কাছে আরো ঘন হয়ে এসে শুকলাল বলল, দেখলি ?

—কী দেখব ?

—ওই পাখী দুটো।

—এতক্ষণ ওরা এখানে ও ওকে সোহাগ করছিল—চান করছিল। তুই আমি এলাম দেখে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল।

মুখের ভঙ্গি করে সোনা বললে, যাঃ।

—হ্যাঁ—সত্যি ?

—ওরা কি এসব বোঝে ?

—বোঝে বইকি। সব বোঝে।

এবারে সোনা আরো কাছে ঘেঁসে এল শুকলালের। তার খোঁপা থেকে একটি ফুল তুলে নিয়ে শুকলাল খেলা করতে লাগল।

—বড় পিয়াস লেগেছে—জল খাই—।

পলাশের পাতা ভেঙে নিয়ে দুটো ঠোঙা তৈরী করলে সোনা। ঠোঙা ভরে ভরে জল খেল দুজনে—ঠাণ্ডা জল—সুস্বাদু ফটিকের মত জল। এই ঝোরা তাদের প্রাণ। যদি না থাকত তা হলে কোন কাঠুরের সাধ্য ছিল না, এই পাহাড়ে এসে কাঠ কাটে। কাছাকাছি কোথাও জল নেই —শুধু এক মাইল দূরে একটা মরা নদী ছাড়া। দু' হাত বালি খুঁড়লে তা থেকে এক আঁচলা জল মিলতে পারে। নীরস অনুর্বরতার মাঝখানে এই ঝর্ণাটা একটা অপরিসীম বিস্ময়—যেন দৈবী করুণা। পাতালবাহিনী ভোগবতীর একটুখানি উদ্বেলিত স্নেহ নির্যাস।

তৃপ্ত গলায় সোনা বললে, আঃ! ঠাকুরের দয়া দেখেছিস! পাথর ফুঁড়ে কেমন জল দিয়েছে ?

এবারে আর ঠাকুরকে নিয়ে ঠাট্টা করলে না শুকলাল। জলে ভিজে ভিজে সোনার একখানা ঠাণ্ডা হাত নিজের কড়া কড়া মস্ত শক্ত মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে নিলে। গভীর স্বরে বললে, সত্যি।

—এবার উঠবিনা মোড়ল ? ওদিকে কাঠ আর কুড়ুল পড়ে রইল যে।

—থাক পড়ে, কেউ নেবে না। বোস, আর একটু জিরুই। যা রোদ, একটু হেলে যাক।

দুজনে চুপ করে বসে রইল। অশ্বত্থের পাতা কাঁপছে। বেলোয়ারী চুড়ির বাজনার মতো শব্দ করে পড়ছে ঝর্ণার জল, পাতার দোলানিতে মাঝে মাঝে চিকমিকে রোদ ওপরে খেলা করে যাচ্ছে। একখানা পাথর থেকে আর একখানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে হীরের গুঁড়ো। খানিক দূর গিয়ে তাকে আর দেখা যাচ্ছে না—আবার কোন্ পাথরের তলা দিয়ে পাতালের ফল্গু পাতালেই ফিরে গিয়েছে হয়তো।

রোদে ঝিকমিক করছে পাহাড়—ঝির ঝির করছে হাওয়া। পাখীর ডাক আসছে, সেই নীলকণ্ঠ পাখী দুটো'ই হয়তো। বেলোয়ারী চুড়ির মতো শব্দ করে তেমনি বাজছে ঝর্ণার একতারা। সোনা একটা গান ধরছে; হয়তো ঝর্ণার সঙ্গে সুর মিলিয়েই। এমন সময় একটা বিজাতীয় শব্দে পাহাড়ের দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

তলিয়ে গেল নীলকণ্ঠ পাখীর ডাক, ঝর্ণা আর সোনার মিলিত ঐক্যতান। শিকৃরে বাজের মতো বিশাল কালো একটা জানোয়ার আকাশে দেখা দিয়েছে। তার গর্জনে পাহাড়ের গুহা—গহ্বরগুলো এক সঙ্গে গুম্ গুম্ করে উঠল—যেন সাড়া দিয়ে উঠল আকাশচারী বিশাল জন্তুটার ডাকে, গম্ভীর ক্রুদ্ধস্বরে কী একটা প্রত্যুত্তর পাঠিয়ে দিলে একটা কুটিল জিজ্ঞাসার। সোনা সোৎসাহে বললে, হাওয়াই জাহাজ। শুকলাল বললে, তাই লাগছে পারা।

—আয় দেখি—

—ও আর কি দেখব। রোজই তো আসছে আজকাল, লড়াই বেধেছে কিনা।

—আয় আয় না—

ঝর্ণার পাশ থেকে বেরিয়ে একটা বড় পাথরের ওপর দাঁড়াল ওরা। হাওয়াই জাহাজটা কোন্ খেয়ালে কে জানে ওই পাহাড়টার চারিদিকেই ঘুরে ঘুরে চক্র দিচ্ছে। আরো আশ্চর্য—এত নীচে নেমে এসেছে যে ওর ভেতরের দু'তিনটে মানুষের মাথা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভয় পেয়ে সোনা শুকলালের পেছনে সরে এল : ওটা নামবে নাকি ?

কে জানে। ওদের মর্জি!

সোনা বিস্ফারিত চোখে এরোপ্লেনটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বিস্ময়ে নয়, ভয়ে। এই হাওয়াই জাহাজগুলো নাকি মানুষেরই কীর্তি। কিন্তু সোনার তা বিশ্বাস হয় না, তার আশংকা হয় ওর ভেতরে অস্বাভাবিক একটা কিছু লুকিয়ে আছে, একটা কিছু অলৌকিক এবং ভয়ংকর। ঝড়ের রাত্রে যে যে সব ভূত-প্রেত-পিশাচ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রচণ্ড উল্লাসে নেচে বেড়ায়, ওই অস্বাভাবিক কাণ্ডটা যেন তাদেরই খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। ওটা মাটিতে নেমে এলে যে কত বড় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে ভাবতেও ওর রক্ত জল হয়ে যায়।

বিমানটা কিন্তু নামল না। বার কয়েক পাহাড়ের মাথায় ঘুরপাক খেয়ে সাঁ করে একটা তীরের মতো বার্ণপুরের দিকে দেখতে দেখতে উধাও হয়ে গেল। শুধু নির্মেঘ আকাশে অনেকক্ষণ ধরে একটা ধূমপুচ্ছ দীর্ঘরেখায় বিস্তীর্ণ হয়ে রইল—যেন ধূমকেতুর সংকেত।

দুদিন পরে পাহাড় থেকে কাঠের বোঝা নিয়ে নামবার পরে দেখা হরিকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে।

হরিকৃষ্ণ রায় এই পাহাড়ের মালিক পালবাবুর গোমস্তা। একটা হাড় বের করা টাট্টু ঘোড়াকে সায়েস্তা করতে করতে আসছিল। পাঁজরের ওপরে জুতোর ঠোক্কর খেতে খেতে ঘোড়াটা যেভাবে এগোচ্ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যে কোন সময় সে মুখ থুবড়ে ধরা শয্যা গ্রহণ করবে।

ওদের দেখে হরিকৃষ্ণ রায় ঘোড়ার রাশ টানল। কিন্তু রাশ না টানলেও সেটা এমনিই থামত।

খড়ির বোঝাটার দিকে একটা তির্যক কুটিল কটাক্ষ করলে হরিকৃষ্ণ।

—বেশ মনের আনন্দে গাছ কাটছিস্, এ্যাঁই—দুটো খড়ি নিলাম খালি—

—দুটো খড়ি!

ছুটো ছুটো করে নিতেই তো পাহাড়ের গাছপালাগুলো সব সাবাড় করে দিলি। বাবু ভালো মানুষ বলে করে খাচ্ছিস, কেমন ?

জবাব না দিয়ে আপ্যায়নের হাসি হাসলে শুকলাল। তিরস্কারের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন স্নেহের সুর আছে হরিকৃষ্ণের। তার মুখটাই খারাপ, মনটা নয়।

—দাঁড়া, মিলিটারী আসছে। দুদিনেই তোদের ঠাণ্ডা করে দেব।

—কে আসছে বাবু ?

—মিলিটারী, মিলিটারী। মানে পল্টন। মাথার ওপর দিয়ে হাওয়াই জাহাজ গেল দেখলি না ? এখানে মাঠের মধ্যে আস্তানা গাড়বে—দেখিস তখন।

কথার শেষে হরিকৃষ্ণ ঘোড়ার পিঠে একটা চাবুক বসালো। চিড় চিড় করে লাফিয়ে উঠে ঘোড়াটা তিন পা দৌড়ে গেল, তারপর আবার গজেন্দ্র গতি।

সোনা পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করলে, আকাশ থেকে ওরা নেমে আসবে এখানে ?

গম্ভীর চিন্তার দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকালো শুকলাল। কয়েক মুহূর্ত পরে জবাব দিলে 'হুঁ'।

তারও পরে মাত্র একটা মাস।

সব কিছু অদলবদল হয়ে গেল। পৃথিবীর রূপ পাল্‌টে গেল, পাল্‌টে গেল সোনা আর শুকলাল। সেই বুড়ো টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালো হরিকৃষ্ণ রায়। ছড়ালে মিষ্টি কথা, ছড়ালে টাকা। চাষী সাঁওতালের লাঙল খসে পড়ল, খেড়ে সাঁওতালের ধনুক আর রইল না, মরচে ধরল কাঠুরেদের কুড়ুলে। তার জায়গায় চকচকে হয়ে উঠল শাবল, ঝকঝকে হল কোদাল।

যুদ্ধের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। সীমান্ত থেকে দুঃসংবাদ আসছে। পশ্চাদপসরণ যদি করতে হয়, তাহলে আগে থেকে তার ব্যবস্থা করা দরকার। সুতরাং এই অঞ্চলটাকে কেন্দ্র করে একটা সম্ভাব্য ডিফেন্স লাইন গড়ে তোলা হতে লাগল। রাঙা কাঁকরের টানা পথ ঘুমিয়েছিল

শাল পলাশের ছায়াকুঞ্জের ভেতরে। তাকে ক্ষত বিক্ষত বিধ্বস্ত করে এল জীপ, এল লরী। কাঠ এল, তাঁবু এল, বিচিত্র যন্ত্রপাতি এল আর তার সঙ্গে এল বিচিত্রতর মানুষ। রাঢ়ের অনুর্বর মাঠের ভেতর জাঁকিয়ে বসল কলোনী—একটা ছোট এরোড্রোম। দেশটা যেন হাজার বছরের একটানা ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠল যন্ত্রযুদ্ধের বাস্তবতম নির্মম পরিবেশের ভেতর।

সহজ হয়ে গেছে শুকলাল আর সোনার, অভ্যস্ত হয়ে গেছে বুনো সাঁওতাল, গৃহস্থ সাঁওতালদের। আজ আর ওদের ভেতরে জাতি-গোত্রের ভেদ নেই। একটা মন্ত্র-বলে ওরা সবাই এক হয়ে গেছে—ওরা কুলি। নিজেদেরই ওরা এখন আর চিনতে পারে না। টাকা পায়, খেতে পায়—পায় বিস্কুট, টিনের দুধ আর চকোলেট। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে মাঝে মাঝে কারো কিট্‌ব্যাগ থেকে এক আধটা লাল রঙের বেঁটে চেহারার বিয়ারের বোতলও ওদের দিকে এগিয়ে আসে। মহুয়া আর ভাতপচানো হাঁড়িয়ার চাইতে তার স্বাদ ঢের ভালো।

আর ওরা কাজ করে। আসানসোলের দিক থেকে বড় বড় মোটর গাড়ি যাতে নির্ব্বিঘ্নে পাড়ি জমাতে পারে; তারই জন্যে পথ তৈরী করে ওরা। কঠিন লাল মাটিতে সাবল গাঁইতির ঘা পড়ে ঝনঝনিয়ে। মাটি সহজে আমল দিতে চায় না, তার তলায় তলায় ছোট বড় পাথর সাবলের ফলা দুমড়ে দেয়—কোদাল ছিটকে বেরিয়ে আসে। তবু মাটি কাটতেই হবে—পথকে বাড়াতে হবে, বড় করতে হবে। শুকলালেরা ঘর্মাক্ত দেহে আসুরিক শক্তিতে মাটিকে কেটে নামায় আর সোনারা ঝুড়ি ভরে ভরে সেই মাটি নিয়ে ফেলে পথের পাশে।

মাথার ওপরে দুপুরের সূর্য জ্বলে। নিষ্ঠুর, করুণাহীন পাহাড়ের পাথর আর পাথুরে মাটিতে তার উত্তাপের কোন তারতম্য ঘটে না। সাঁওতালের কালো শরীর থেকে রক্ত জল করা সাদা ঘাম মাটিতে ঝরে পড়ে, তৃষ্ণার্ত পৃথিবী যেন এক চুমুকে তা চোঁ করে শুষে নেয়। ওদের অনাবৃত স্পেশাল সিক্ত পিষ্ঠগুলো রোদের আলোয় জ্বলতে থাকে, ঘাড়ে কপালে লবণের

গুঁড়ো চিকমিক করে। অস্তাহত পাথরের টুকরোগুলো ছিটকে ছিটকে এসে চোখে মুখে আঘাত দিয়ে যায়—অসহায় পৃথিবীর যেন ক্ষীণ সহিংস প্রতিবাদ। একটু দূরে খোলা তাঁবুর ছায়ায় টেবিল ফ্যান খুলে বসে নগ্ন-গাত্র সাদা সাহেব কাজের তদারক করে ওদের। নীল চশমা পরা চোখের ভেতর থেকে উগ্র দৃষ্টি ক্ষেপন করে, গাল দেয়, আর একটার পর একটা বোতল শূন্য হয়ে টেবিলের নীচে গড়াগড়ি যেতে থাকে।

কাজ করে সোনা—কাজ করে শুকলাল। রোদে চাঁদি পুড়ে যায় পিপাসায় টাকরার ভেতর যেন পিন ফুটতে থাকে। সামনে একটা মরা দীঘির দুর্গন্ধ কাদাজল—সেই খেয়ে ওরা পিপাসা দূর করবার চেষ্টা করে। আর তখনি চোখে পড়ে দূরে ভৈরব পাহাড়। মাটির বুক থেকে ঢেউয়ের মতো হঠাৎ সোজা উঠে নীলিম রেখায় দিগন্তের দিকে তরঙ্গিত হয়ে গেছে। ওখানে রুক্ষ মাটি, কঠিন পাথর। কিন্তু সে মাটি—সে পাথর এ জাতের নয়। তাদের ঘিরে ঘিরে উঠেছে প্রকৃতির অকৃপণ শ্যামলতা—শতমূলি থেকে সুরু করে ছোট আবলুস আর পাহাড়ী বাঁশের ঝাড়; সেখানে পাথরের আড়ালে বেগুনি ফুলে আকীর্ণ লজ্জাবতী সংকুচিত হয়ে আছে, সেখানে বেঁটে পলাশের ছায়ায় ফুটেছে ভুঁই চাঁপা, বাতাসে ভাসছে বন-গোলাপের গন্ধ। আর—আর—পাথর চুঁইয়ে নামছে একটি ছোট ঝর্ণা, বনের ভেতরে যেন একটি সাঁওতাল মেয়ের হাতে ঠিন ঠিন করে বেলোয়ারী চুড়ির সুর বাজছে। তার জলের রঙ জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল, তার স্বাদ দুধের মতো মিষ্টি আর তা বরফের মতো ঠাণ্ডা। মর দীঘির কাদাজলের মতো তা বুকটাকে পুড়িয়ে দেয় না—তার দিকে তাকালেই আর ক্লান্তি থাকে না কোথাও।

কিন্তু ভৈরব পাহাড় অনেক দূরে। এখানে মাটি কাটা হচ্ছে—পাথর জড়ানো রাঙা মাটি। পথ তৈরী হলে বড় বড় গাড়ী আসতে পারবে আসানসোল থেকে। তাই দু'হাত ভরে মিলিটারী ওদের মজুরী দিচ্ছে। এখন আর মহুয়া গাছের নীচে শিলা-পট্টে খোদাই করা বাবা ঠাকুর ওদের ইষ্ট দেবতা নয়—তার জায়গা দখল করেছে অতি চেতন এবং অতি সজাগ ওই সাদা চামড়ার লোকটা।

নীল চশমার ভেতর দিয়ে শাণিত চোখে ওদের কাজ দেখছে আর বোতল টানছে।

—এই কুলি—ঠারো মৎ, ঠারো মৎ! ফুরতিসে কাম চালাও—জল্‌দি!

—বহুৎ ধূপ হুজুর—

—ওঃ—ধূপ! ধূপ্‌! মরদ লোগ্‌কা ধূপ্‌সে কেয়া ডর হ্যায়? ডেভিল টেক্‌ ইউ লেজী ব্রুটস্‌—

গাল দেয় সাহেব, হাত ভরে পয়সা দেয়, মদ দেয়। কিন্তু কি দিতে পারে ভৈরব পাহাড়? কিছু খড়ি, কিছু ছায়া আর—আর—পাতাল ফুঁড়ে ওঠা ভোগবতীর ঠাণ্ডা মিষ্টি জল। ঝর্ণার পাশে আজ আর কেউ বসে না, শুকলাল নয়, সোনা নয়, অন্য সাঁওতালেরাও নয়। সেখানে এখন নিশ্চিন্তে নীলকণ্ঠ পাখীরা স্নান করে, পাখা ঝাড়ে আর মিষ্টি গদ্‌গদ গলায় এ ওর সঙ্গে প্রেমালাপ করে হয়তো।

কিন্তু সাহেবের দেওয়া মদ ভুলিয়ে দেয় ভোগবতীকে। তার স্বাদ মিষ্টি নয়, তেতো, বিষের মতো তেতো। রক্ত জুড়িয়ে যায় না, মুহূর্তে ভৈরব পাহাড় সরে যায় দৃষ্টির সামনে থেকে, পাগলের মতো কোদাল তুলে নেয় শুকলাল—ঝুড়ি মাথায় করে দাড়ায় সোনা। দুপুরের রোদ আর মদের নেশা শরীরের ভেতরে একটা আসুরিক মত্ততা সৃষ্টি করে—অদম্য অন্ধবেগে যেন ওরা ভেঙ্গে পড়তে চায়, টুকরো টুকরো হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায়। প্রবল বেগে অনিচ্ছুক মাটির বুকের ভেতরে কোদালের আঘাত নেমে আসে—পাথরের গায়ে ঘা লাগে, যেন শোনা যায় মাটীর তলা থেকে মা বসুমতীর চাপা যন্ত্রণার গোঙানি।

তারপর দিনান্তে শুকলাল আর সোনা ফিরে রওনা হয় ঘরের দিকে।

মদের নেশা তখন কেটে গেছে, শরীরে ঘনিয়েছে দ্বিগুণ শ্রান্তি আর অবসাদ। পা জড়িয়ে জড়িয়ে দুজনে মূর্ছিতের মতো এগিয়ে চলে। আকাশের প্রান্তরেখায় প্রথম প্রেমের মতো অপূর্ব কোমল মাদকতা নিয়ে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দিগন্তে কালো আর করুণ হয়ে আছে ভৈরব

পাহাড়—যেন একটা অতিকায় ভালুক শিকারীর গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে।

দু'জনেই তাকায় সেদিকে। দু'জনরেই এক সঙ্গে একই কথা মনে হয়।

শুকলাল বলে, সোনা, চল, কাল থেকে আবার আমরা কাঠ কাটব।

সোনা মাথা নাড়ে—জবাব দেয় না। অকারণে তার ইচ্ছে করতে থাকে মজুরীর টাকাগুলো পথের ওপর ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দেয়।

শুকলাল বলে, মাটী কাটতে ভাল লাগে না। কাঠুরে ছিলাম—বেশ ছিলাম রে।

সোনা তেমনি নিরুত্তরে মাথা নাড়ে। অন্ধকার পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন ওটা অভিমানে ম্লান হয়ে আছে। লজ্জা হয় সোনার, অপরাধ-বোধ জাগে মনের মধ্যে। একটু পরে জবাব দেয়, ঠিক।

কিন্তু রাত্রি কাটে—দিন আসে, সন্ধ্যার সংকল্প মনে থাকে না কারো—শুকলালেরও নয়, সোনারও নয়। আবার শাবল গাঁইতি ঝকঝকে ফলা মাটীর বুক কুরে কুরে বার করতে থাকে। মদের নেশা আর দুপুরের রৌদ্র বিষ হয়ে আবর্তন করে রক্তের ভেতরে। শুকলালের কোদাল পড়তে থাকে : ঝন—ঝন—ঝনাৎ—

ওরা ভৈরব পাহাড়কে ভুলেছে, ভৈরব পাহাড় ওদের ভোলেনি।

তাই হয়তো মহুয়া গাছের নীচে একদিন জেগে উঠলেন শিলাপট্টে আঁকা বাবাঠাকুর। তাঁরি মাথার ওপরে গর্জন করে উঠল সিংহ—তার হাতে ঝিকিয়ে উঠল তরোয়াল। নিজের শক্তির পরিচয় দিলেন দেবতা।

রাস্তা অনেকখানি তৈরী হয়ে গেছে—ভারী ভারী গাড়ির যাতায়াতের সংখ্যা বেড়েছে অনেক। সেই গাড়িগুলোর একটা সেদিন বেসামাল হয়ে বসল।

ড্রাইভারের মদের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, হঠাৎ কোথা থেকে কী হল—হাত থেকে পিছলে গেল স্টিয়ারিং। পথের পাশে বড় একখানা বেলে পাথরের গায়ে আচমকা ধাক্কা খেল গাড়িটা, তারপর সোজা একটা ডিগবাজি খেয়ে পথের উলটো দিকে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল। কুলি মেয়েরা ঝুড়ি ভরে মাটি ফেলছিল সেখানে।

এক মিনিটের মধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে গেল।

উলটানো গাড়িটার সামনের চাকা দুটো আকাশের দিকে উদ্যত হয়ে বিষ্ণুচক্রের মতো ঘুরলে খানিকক্ষণ। একটা প্রলয়ংকর ঝড়ের মতো ঝুরো মাটি চারদিকে ছিটকে যেতে লাগল। তাঁবু থেকে সাহেবেরা ছুটে এল—চেঁচামেচি জুড়ে দিলে কুলিরা।

কিন্তু শুকলালের মুখে কথা নেই—যেন পাথর।

গাড়ির ভেতর থেকে বেরুল সাহেবের দেহ—মাথাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, ঘিলু আর রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। হাতপাগুলো বেঁকে দুমড়ে কচ্ছপাকার ধারণ করেছে সাহেব। আর গাড়ির তলা থেকে বেরুল সোনা। সোনা? না, ঠিক সোনা নয়। নাক মুখ শরীর সমস্ত চেপটে একটা অমানুষিক বীভৎসতা। রাঢ়ের তৃষ্ণার্ত রাঙামাটিও অত রক্ত শুষে খেয়ে ফেলতে পারেনি—থকথকে খানিকটা কাদার সৃষ্টি হয়েছে। কালো সাঁওতালের রক্ত যে অত লাল তা কে জানত? আশ্চর্য্য ভারী আশ্চর্য, সাহেবের রক্তের রঙের সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই!

যুদ্ধের ক্যাজুয়ালটি। অমন কত হয়—অমন কত হয়েছে। কে তার খবর রাখে, তা নিয়ে নিজেকে বিব্রত বোধ করে? ডিফেন্স লাইন তৈরী করতেই হবে—বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্যে, অসুরদের নিপাত করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্যে। একটা সাঁওতাল মেয়ের মৃত্যু। তার জন্যে মাটি কাটা বন্ধ থাকবে না—মাটি ফেলাও না।

ফিরে এল শুকলাল। এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না, বুক চাপড়ে হাহাকার করে উঠলনা একবারও। ভৈরব পাহাড়ের দেবতা শোধ নিয়েছে, পরিচয় দিয়েছেন তাঁর ক্ষমতার, তাঁর দোর্দণ্ড দুরন্ত প্রতাপের।

টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন হরিকৃষ্ণ রায়। দূরের গ্রামে আরো কুলি সংগ্রহের চেষ্টায় গিয়েছিলেন তিনি। এ এক মন্দ ব্যবসা নয়—বেশ দু' চার পয়সা কমিশন আসছে হাতে। আনন্দে উৎসাহে বুড়ো ঘোড়াটাকে তাড়না করতেও ভুলে যাচ্ছিলেন তিনি, ঘোড়াটা ইচ্ছে মতো থেমে থেমে চলছিল। শুকলালকে দেখে কষ্ট হল হরিকৃষ্ণ রায়ের। আহা বেচারা! বৌটাকে সত্যিই বড় ভালোবাসত। ঘোড়া থেকে নামলেন

তিনি। পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, কষ্ট করে আর কী করবি শুকলাল, কপালে যা ছিল তাই হয়েছে।

কথা বলল না শুকলাল, থেমেও দাঁড়াল না। যেন হরিকৃষ্ণ রায়কে সে দেখতেই পায়নি। অলস শ্রান্ত গতিতে যেমন যাচ্ছিল, তেমনই চলে গেল। শুধু তার অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিটা দূরে আকাশের কোলে গিয়ে পড়তে লাগল, যেখানে লতাকুঞ্জে আচ্ছন্ন হয়ে ভৈরব পাহাড় স্তব্ধ একটা ধ্যানস্থ মূর্তি।

বহুদিন পরে মরচে পড়া কুড়ুলটায় শান দিয়েছে শুকলাল। তারপর পাহাড়ে উঠে পাগলের মতো গাছ কাটতে সুরু করে দিয়েছে।

পাহাড় তার ওপরে প্রতিশোধ নিয়েছে—সেও পাহাড়কে ক্ষমা করবে না। দু হাতে সে ডাইনে বাঁয়ে যা পাচ্ছে কেটে চলেছে। পাহাড়টাকে আজ সে ন্যাড়ামুড়ো আর নির্মূল করে দেবে। একবার যাচাই করে দেখবে তার শক্তি বেশী, না দেবতার প্রতাপটাই বড়।

মাথার ওপরে তেমনি আগুন ছড়ানো সূর্য। পাহাড়ের বুক থেকে উচ্ছলিত স্নেহধারা। পলাশ আর পিয়াশাল গাছের নীচে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। ছোট গর্তের ভেতর যেখানে একটুখানি জল জমেছে, সেখানে পাখা ঝেড়ে ঝেড়ে স্নান করছে নীলকণ্ঠ পাখী।

তার ঠাণ্ডা মিষ্টি জল। বহুদিনের অনাস্বাদিত সুধার পাত্র। টলতে টলতে ঝর্ণার দিকে ছুটে এল শুকলাল। কিন্তু কোথায় ভোগবতী?

তার চিহ্নমাত্র নেই। নেই বেলোয়ারী চুড়ির হালকা ঝংকার—নেই নীলকণ্ঠ পাখী। যেখানে ঝর্ণা ছিল সেখানে কালো অজগরের মতো মোটা একটা লোহার নল—পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে সে নলটা ঘুরে চলে গেছে—কোথায় গেছে বুঝতে কষ্ট হল শুকলালের।

একমুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালো শুকলাল। ওই কালো লোহার থাপটা মাটির তলায় তার হিংস্র মাথাটা ডুবিয়ে দিয়ে তাদের ভোগবতীকে চুষে খেয়ে নিয়েছে। ভোগবতীর জল—ঠাণ্ডা মিষ্টি দুধের মতো জল তার সরীসৃপ দেহের বিষসঞ্চয়কে পুষ্ট করছে আজ। তার সেই বিষে সোনা

মরে গেছে—শুকলাল মরবে, আরো অনেকে মরবে। কেউ বাঁচবে না,. কেউ নয়।

কেউ বাঁচবেনা। কেউ বাঁচবে না। শুকলালের মাথার ভেতর সব কিছু যেন আতসবাজির ফুলঝুরি হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। কুড়ুলটা তুলে নিলে হাতে—প্রচণ্ড শক্তিতে ঘা বসালো অজগরটার গায়ে। ঝন ঝন করে একটা বিরাট শব্দে পাহাড় কেঁপে উঠল। আর এক ঘা—আর এক ঘা। কুড়ুলের ফলা কুঁকড়ে এল কিন্তু লোহার সাপটা টোল খেল না।

—হু ইজ দেয়ার ?

পাহাড়ের মাথা থেকে প্রশ্ন। রাইফেল হাতে সেন্ট্রি দেখা দিয়েছে।

—হু ইজ দেয়ার ?

শুনতে পেল না শুকলাল—জবাব দিলে না। আরো এক ঘা—এইবার একটু দাগ পড়েছে মনে হচ্ছে। আর এক ঘা।

—স্যাবোটেজ !

পাহাড়ের মাথা থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুটে এল রাইফেলের গুলি।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল শুকলাল। চেতনার শেষ বিন্দুটুকুও মুছে যাওয়ার আগে টের পেল—তার পিপাসাকাতর মুখে কে যেন জল দিচ্ছে। ভোগবতীর ধারা কি মুক্ত হয়ে গেল ? কিন্তু সে জল তো এমন গরম নয়—এমন নোনতা নয়! নিজের রক্ত লেহন করতে করতে লোহার পাইপটার ওপরে মাথা রেখে স্থির হয়ে গেল শুকলাল।

মিলিটারী কলোনীতে ট্যাপের মুখে ভোগবতীর স্নিগ্ধ জল ঝরে পড়ছে শত ধারায়। সেজল তেমনি নির্মল, তেমনি স্বচ্ছ, শুকলালের রক্তের এতটুকুও লালের আভাস তাতে লাগেনি।

লেভেল ক্রসিং

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সকাল বেলা কামাখ্যা ডাক্তারের সঙ্গে রুইদাসের এক চোট হয়ে গেল।

'বলি কেমন ধারা ভেজাল বড়িগুলো দিচ্ছ বটে ডাক্তার, একমাস হয়ে গেল জ্বর আর গেলনি। কুইলাইন কিছু নাই বুঝি—খালি নিম-পাতা বাটা!'

রুইদাসের কথাবার্তা বরাবরই একটু বেয়াড়া। অন্য দিন হলে কামাখ্যা ডাক্তার তাই কিছু গায়ে মাখত না। কিন্তু আজ চালকলের খোদ মালিকের ভাগনে ও ম্যানেজার বনোয়ারীলাল স্বয়ং এসেছে তার ডিসপেন্সারিতে পেটের দরদের ওষুধ নিতে। এই সময় এ রকম বেফাঁস কথায় কার না রাগ হয়। কামাখ্যা ডাক্তার দাঁত খিচিয়ে বলে উঠল, 'পছন্দ না হয়, ত নিমপাতা নিজে বেটে নিলেই ত পারিস্। আসিস কেন ব্যাটা!"

"ব্যাটা ব্যাটা করোনি ডাক্তার, রুইদাস্ রাগলে কাকেও পরোয়া করে না। জানো!'

"জানি জানি, ভারী আমার লেভেল ক্রসিং-এর জমাদার, তার আবার তেজ দেখনা! যা যা বেটা এখানে তোর ওষুধ মিলবে না।"—কামাখ্যা ডাক্তার টেবিলের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে রুইদাসের হাত থেকে ওষুধের পুরিয়াটা সত্যিই ছিনিয়ে নিলেন।

রুইদাস প্রথমটা কেমন ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছল, পরের মুহূর্তেই একেবারে ফেটে পড়ল। 'দেখলে, সবাই তোমরা দেখলে! দেখলে, সবাই তোমরা দেখলে! দেখলে চামার ডাক্তারের ব্যাভারটা! হাত থেকে ওষুধটা কেড়ে নিলে জোর করে'!—রুইদাসের রাগটা যেন একেবারে হতাশ কান্নায় মেশানো।

'তা কেড়ে নিবে নি?' কাঠের গোলার ভরত এবার ডাক্তারের খোসামুদি করবার একটু সুযোগ পেয়ে ফোড়ন পাড়লে, 'ডাক্তারের ওপর ভক্তি ছেদ্দা নেইত ওষুধ নিতে আসা কেন! বলে কি না, নিম পাতা বাটা!'

'তো নিমপাতা বাটা বলবে নি? কুইনাইন থাকলে একমাসে জ্বর একটু বাগ মানে না!'—কথাটা তেজের হলেও রুইদাসের সুর এখন অনেকটা নরম। নেহাৎ হাতে পায়ে ধরা ছাড়া আর যে করে হোক এখনও ওষুধটা ফিরে পেলে সে নেয়।

কিন্তু বনোয়ারীলাল হাওয়াটাকে আবার গরম করে তুললে, 'আরে কোথাকার লবাব তুমি হে, কুইনাইন লিতে আসেছো। কুইনাইন লাট বেটা বলে পায় না। চার আনায় উনি কুইনাইন খরিদ করতে আসিয়াছেন!'

বনোয়ারীলালের কথায় সবাই হেসে ওঠার সঙ্গে রুইদাসের রক্ত আবার মাথায় উঠে গেল।

'কেন চার আনা পয়সা কি পয়সা নয় যে ফাঁকি দিয়ে নেবে! কুইনান না থাকেত এ জুয়াচুরীর ডাক্তারী কেন?'

কামাখ্যা ডাক্তার নিজের পেশাদারী গাম্ভীর্য এতক্ষণে আবার ফিরে পেয়েছে, তা ছাড়া হাতুড়ে ডাক্তাব হ'লে কি হয় লোকটা নেহাৎ খারাপ নয়। সে এবার রেগে না উঠে ভারিক্কি স্বরে বল্লে 'যাও হে রুইদাস যাও, সকাল বেলায় ডাক্তার খানায় ঝামেলা করো না। ওষুধ পছন্দ না হয় নিওনা, ব্যস ফুরিয়ে গেল। তোমায়ত আর জুলুম করে ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি না।'

'গছিয়ে দিলেই আমি যেন নিচ্ছি?' অত্যন্ত দুর্বলভাবে নিজের তেজটা বজায় রাখবার করুণ চেষ্টা করে রুইদাস ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

ইচ্ছে থাকলেও আর বেশীক্ষণ তার থাকবার উপায় নেই। এক্ষুনি গিয়ে একটা মালগাড়ি পাশ করাবার জন্যে গেট বন্ধ করতে হবে। সকালের দিকে মাত্র ঘণ্টা খানেক সে ছুটি পেয়েছিল। ভেবেছিল, ওষুধ নিয়ে বাজারটাও

একবার করে যাবে। কিন্তু তার আর সময় নেই। প্রায় ছুটতে ছুটতেও গুমটি ঘরের দিকে সে নেহাৎ দম দেওয়া পুতুলের মতই এগোচ্ছে, কিন্তু মনটা তার কেমন যেন তছনছ হয়ে গেছে। কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল! কেনই যে এমন হয়ে যায়! আজ সে ডাক্তারের কাছে একেবারে কেঁদে পড়বে ঠিক করে এসেছিল। ভেবেছিল ডাক্তারের হাত দুটো ধরে বলবে, 'ছেলেটাকে ত রাখতে পারলে না ডাক্তার, ছেলের মাকেও কি পারবে না? একটা তেজী কিছু ওষুধ দাও ডাক্তার, যাতে চোখ মেলে জেগে ওঠে। ও যে চোখ মেলে চাইতেও ভুলে গেছে।' কিন্তু কি যে তার বদ্ স্বভাব পেটের কথাগুলো গলা পর্য্যন্ত এসে কেমন ঝাঁঝালো তেতো হয়ে ওঠে।

ফস্ করে কি যে বলে ফেলে কখন! সব কিছু ভেস্তে যায়। অথচ কামাখ্যা ডাক্তার ছাড়া গতিও তার নেই সে জানে। ইষ্টিশানের কাছে বাজারের মাঝখানে পেতলের সাইনবোর্ড মারা ঘোষাল ডাক্তারের ডাক্তারখানায় তার মত লোকের পাত্তা নেই। আর কামাখ্যা ডাক্তার মানুষও সত্যি ভালো। কলকাতার কোন ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারী ছেড়ে দিয়ে দেশে গাঁয়ে এসে নিজেই ডাক্তার বলে বসেছে বটে, কিন্তু অনেক পাশকরা ডাক্তার তার কাছে হার মানে। গরীবের ঘরেই তার পয়সা। গরীবের সুখ দুঃখ অভাব অনটন সে বোঝে। ভিজিট পেলে নেয়, না পেলে ক্ষেতের লাউ কুমড়ো বেগুন দিয়ে এলেও ব্যাজার হয় না। ছেলেটার অসুখের সময় কামাখ্যা ডাক্তার কি না করেছে! ভিজিটের নাম গন্ধ নেই—দুবেলা নিজের গরজে এসে দেখেছে, শেষ কটা দিন রাত পর্য্যন্ত জেগেছে যমের সঙ্গে যোঝবার জন্য। কেন যে অমন কড়া কথাটা সে আজ বলে ফেল্লে? বলে ফেলে আর কথা কি করে ফেরাতে হয় সে জানে না।

'ওই রুইদাস এসে পড়েছে গো, দিবে এখুনি গেট বন্ধ করে—হেট্ হেট্।'

রুইদাস লেভেল ক্রসিংএর কাছে এসে পড়েছে। এক সার কাঠ বোঝাই গরুর গাড়ী চলেছে ষ্টেশনের দিকে। রুইদাসকে দেখে ক্রসিং

পার হবার জন্যে তাদের তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। বড় কড়া ত্যাঁদোড় লোক রুইদাস, তারা জানে।

রুইদাস কিন্তু গেটের দিকে যায় না। সোজা সে তার গুমটি ঘরে গিয়ে ঢোকে। রেললাইনের পাশে লাল টালিতে ছাওয়া ছোট্ট একটি ঘর। একটা মানুষ হাত পা গুটিয়ে কোন রকমে শুতে পারে। এরই ভেতর রুইদাসের গোটা সংসার কুলোতে হয়। সংসার বলতে অবশ্য এখন তার রুগ্না স্ত্রী রাখালী, সে ও একটা ছাগলী। ঘরের পেছন দিকে কটা টিন হেলান দিয়ে একটা ছাউনি মত করেছে। সেখানেই রান্না হয়। ছাগলীটাও সেখানেই বাঁধা ছিল তাকে দুধ খাওয়াবার জন্যে। ছাগলীটা বাচ্চা দেবার আগেই ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। ছাগলীটা তবু আছে। বাচ্চা হ'তে আর দেরী নেই।

সকালে যেমন দেখে গেছল রাখালী এখনও তেমনি জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে। শুধু ঘরটা জলে থইথই করছে। ঘরের মধ্যে কলসী থেকে একবার বোধ হয় জল গড়িয়ে খেতে গেছল। বেকায়দায় কলসীটা উলটে গেছে। রাখালীর শোবার কাঁথা মাথার চুল সমস্ত ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু তার সাড়া নেই। জলটি ঝেঁটিয়ে এখুনি বার করে দিলে ভাল হয়। কিন্তু সময় নেই। রুইদাস রাখালীকে টেনে বিছানার অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। রাখালী অস্ফুট কি রকম একটা শব্দ করে মাত্র। একবার আচ্ছন্ন চোখের পাতাগুলো টেনে খোলবার বুঝি চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। কলসীটা গড়িয়ে গেলেও ভাঙেনি। যে টুকু জল তাতে ছিল তাই বাটিতে ঢেলে রাখালীর মুখটা হাঁ করে একটু ঢেলে দিয়ে রুইদাস বাইরে বেরিয়ে আসে। মালগাড়ি পাশ করবার আর দেরী নেই। লাঠা দেওয়া গেটটা নামাতে রুইদাস পেছনে দূরের রাস্তায় মোটরের হর্ণ শুনতে পায়। চাবি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটরটা সশব্দে পেছনে থেমে যেন রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করতে থাকে।

'এই—এই রুইদাস।'

রুইদাস চাবিটা নীল কোর্তার পকেটে রেখে ধীরে সুস্থে পেছন ফিরে তাকায়। মোটর নয়, মোটর লরী আসছে ফুল চুরি থেকে খোয়া-

পাথর বোঝাই করে। ড্রাইভার সাধন শিকদার নিজেই নেমে আসে গাড়ি থেকে। প্রথমটা কড়া মেজাজে বলে, 'গেট নামালে যে বড়! হর্ণ দিচ্ছি শুনতে পাওনা।'

'শুনবনি কেন, কালা ত নই।'

'খুলে দাও গেট, এখনও গাড়ীর অনেক দেরী।'

ভ্রূক্ষেপ না করে রুইদাস ঘরের দিকে এগোয়।

রুইদাসকে চিনতে সাধন শিকদারেরও বাকী নেই। এবার তার স্বর নরম হয়ে আসে। 'বলি চলেই যাচ্ছ যে! শোন না।'

রুইদাস জবাব দেয় না।

শিকদার এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধরে ফেলে তার। অনুনয় করে বলে, 'একটি দিন শুধু ছেড়ে দে রুইদাস। সকাল আটটার মধ্যে একটি ক্ষেপ পৌঁছে দেবার কথা। নটা প্রায় বাজে। কণ্ট্রাকটারের নতুন সরকার বেটা এসে অবধি আমার পেছনে লেগেছে। আজ বাগে পেয়ে চাকরিটা খতম করে ছাড়বে।'

রুইদাসের মনটা বুঝি একটু নরম হয়। কিন্তু খিঁচিয়ে উঠে সে বলে, 'অত যদি গরজ ত আরো ভোর ভোর উঠতে পারনি? নেশা ভাঙ করে পড়ে ছিলে বুঝি?'

এবার রেগে উঠে রুইদাসের হাতটা ছেড়ে দিয়ে শিকদার বলে, 'নেশা ভাঙ করে পড়ে থাকি আমি! বড় বেশী তোর তেজ হয়েছে রুইদাস, যা মুখে আসে তাই বলিস্। ভারী এক রেল গেটের জমাদার হয়ে ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করিস। কিন্তু তোর তেজ ভাঙবে, আর দেরী নেই, তোর মত কুকুরের মুগুরও আছে জানিস'।

রুইদাস উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। শিকদারের অভিশাপগুলো শুনেও সত্যি তার রাগ হয় না। নিজের দোষ সে জানে। জানে যে কেউ তাকে দেখতে পারে না, বন্ধু বলতে কেউ তার নেই। শুধু তার এই মুখের দোষে নয়, বেয়াড়া ঘাড়ের জন্যও বটে। ঘাড় হেঁট করতে পারে না বলেই জীবন ভোর মাথাটা তার ঠুকতেই গেল। নোয়ানো মাথার মাপে দুনিয়ার সব দরজা যখন কাটা তখন মাথা সোজা

করে কোনখানে তার জায়গা মিলবে? সব দরজাতে তার তাই শুধু মাথাই ঠুকেছে, পার হওয়া আর হয়নি।

চাষার ঘরের ছেলে, কিন্তু চাষবাস তার ধাতে সয়নি। ধান কাটতে যাকে নুইতে হয় তার মাথা যে আর কোথায়ও তোলবার নয় সেটা তার বোধগম্য হয়নি। জমিদারের পাইকের সঙ্গে মারপিট করে প্যাঁচাল এক দাঙ্গার মামলায় পড়ে তাই তাকে দেশত্যাগী হ'তে হয়েছে। ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব নেই, খাটবার গতরও আছে জোয়ান শরীরে, তাই কাজের অভাব হয়নি। রেললাইনে ভাল কাজই সে পেয়েছে কিন্তু বুঝে শুঝে চলতে পারেনি কোথাও। ওপরওলাদের নেকনজরে পড়েনি কোন মতেই, সমান সমানদের সঙ্গেও বনিবনা হয়নি। পয়েণ্টস্‌ম্যান থেকে নেমে তাই লেভেল ক্রসিংএ এসে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু নেহাৎ কাজের গুণে। কাজে ফাঁকি নেই, নিয়ম কানুন একচুল নড়চড় হ'তে সে দেয় না। তাছাড়া ওপর নিচে কারুর সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধবার অবকাশই এই নির্বাসনের রাজ্যে নেই।

তবু নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে সে শিখল কই? মেজাজ তার কিছুতেই শোধরাবার নয়, মুখও রাশ মানে না। জ্বরে এমন করে বেহুঁস হয়ে যাবার আগে রাখালী একদিন বলেছে, আমি মরলে, তোমায় একাই কাঁধে করে পোড়াতে নিয়ে যেতে হবে। কেউ তোমার ছায়া মাড়াবে নি।'

রুইদাস দাঁত খিচিয়ে বলেছে বটে, 'তোকে পোড়াতে আমি একাই পারব। সে খ্যামতা আমার আছে।' কিন্তু মনে মনে সত্যি তার নিজের ওপর ধিক্কার এসেছে। কেন সে আর সবাইকার মত নয়! কেন সে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারে না!

আজও বাইরের টিনের ছাউনিটার তলায় ইঞ্জিনের পোড়া কয়লা দিয়ে উনুনটা ধরাতে ধরাতে নতুন করে সে সঙ্কল্প করে ভাল মানুষ হবার। না, ঘাড় সে আর তুলবে না। ঘাড় সোজা করে এতদিন শুধু ধাক্কাই যদি খেয়ে থাকে এবার ঘাড় নিচু করেই দেখবে লাভ কিছু হয় কি না, রাখালীকে 'কুইনাইন' নইলে বাঁচান যাবে না সে জানে। কুইনিন

তার মত হেঁজি পেঁজির জন্তে নয়। হোমরাচোমরাদের হাতে পায়ে ধরলে হয়ত একটু পাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে অনুগ্রহ করে। তাই সে ধরবে। কোথাও না হয় খোদ হাকিমের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়বে। জংশন ষ্টেশনে ট্রেন ধরবার সুবিধের জন্তে হাকিমের গাড়িত প্রায়ই এই রাস্তা পার হয়ে যায়। সেই সময়েই একেবারে পা জড়িয়ে ধরবে।

কি একটা গোলমাল যেন তার ঘরের দিকেই এগুচ্ছে শুনে রুইদাস ফিরে তাকায়। মালগাড়ি এখনও পাশ করে যায়নি। এত গোল তাহলে কিসের!

দরজার কাছে কটা ছায়া পড়ে।

'কোথায় হে রুইদাস।' কড়া গলায় জবরদস্ত হাঁকের পর আরো দুচার জনের সঙ্গে খোদ হাকিম সাহেবের উর্দিপরা চাপরাশি এসে দরজায় দাঁড়ায়।

রুইদাস ব্যাপারটা প্রথম ঠিক বুঝতে পারে না, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চাপরাশি গম্ভীর গলায় জানায়, 'হাকিম সাব তলব করেছেন, চলো।'

'হাকিম সাব তলব করেছেন!' রুইদাস নিজের কান দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। মনে কথাটা উঠতে না উঠতে এত সহজে এত তাড়াতাড়ি যে ফলে যাবে তা সে ভাবতেই পারেনি! 'কোথায় হাকিম সাব!' ব্যস্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। চাপরাশি মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'হাকিম সায়েব কি তোমার দোড়গোড়ায় হেঁটে এসেছেন, তিনি মোটরে আছেন, চলো।'

চাপরাশির মুখ বাঁকানিটাও রুইদাস গায়ে মাখে না। একবার রাখালীর দিকে তাকায়। মুখটা তার ঘেমে উঠেছে। এইবার জ্বর ছাড়বার পালা। একটু ওষুধ যদি সময়ে পড়ে তাহলেই বোধ হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। কলম নিশ্চয় হাকিম সায়েবের কাছেই আছে। এক টুকরা কাগজ সে যোগাড় করে নেয়।

চাপরাশী ধমক দিয়ে ওঠে। 'বলি কি হচ্ছে কি! হাকিম সায়েব কি তোমার জন্তে বসে থাকবেন নাকি!'

'না এই যে যাই।' রুইদাসই সবার আগে বেরিয়ে পড়ে। চারি ধারে যে গুঞ্জন ওঠে তার আসল মানেটা তার মাথায় তখনও ঢোকেনি।

রেলগেটের এপাশে গোটা দুই লরি, খান কয়েক গরুর গাড়ি এর মধ্যে জমা হয়ে গেছে, তার ভেতর হাকিম সায়েবের মোটরকে সসম্ভ্রমে সামনের দিকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

রুইদাস সেই মোটরের দিকে এগোয়। পেছন থেকে চাপরাশি ধমক দিয়ে বলে, 'ওদিক পানে কোথায় যাচ্ছ হে, আগে গেটের চাবী খুলে দাও।'

রুইদাস সে কথায় কান দেয় না। সটান হাকিম সায়েবের মোটরের কাছে গিয়ে হাজির হয়। তারপর সত্যি সত্যি মাথাটা নুইয়ে সেলাম করে বলে, 'হুজুর—একটু যদি দয়া করেন।'

হাকিম সায়েব একটু অবাক হ'ন। একটু অপ্রসন্নও। রাস্তায় ঘাটে বেকায়দায় পেয়ে তাঁকে দিয়ে এরকম দয়া করিয়ে নেওয়াটা মোটেই তাঁর পছন্দ নয়। তাছাড়া চাপরাশি বেয়ারার বেড়া কি জন্যে আছে, যদি তাঁর ওপর যে সে এসে এমন ভাবে চড়াও হতে পারে! তবু চড়াও যখন হয়েছেই তখন বিরক্ত হ'লেও পোষাকী একটু হাসি টেনে তিনি বলেন, 'এখন তুমি গেটটা একটু খোল দেখি।'—কথাটা নিজেই তাঁকে বলতে হয় বলে বেশী খারাপ লাগে।

রুইদাস তবু নড়ে না। কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'দয়া করে একটা সই করে দেন হুজুর। কুইনাইন অভাবে বৌটা মরতে বসেছে। আপনি একটু কলম ছোঁয়ালিই আর ভাবনা থাকে নি।' হাকিম সাহেব সত্যি বদমেজাজের লোক নয়। বরং এই এক বছরে এই মহকুমায় উদার অমায়িক বলে বেশ একটু সুনামই তিনি অর্জন করেছেন। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি তা বলে কি করে বরদাস্ত করা যায়। মুখে তাঁর একটু ভ্রূকুটি দেখা দেয়। চাপরাশি এই ভ্রূকুটিটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। রুইদাসের কাঁধটায় একটা ধাক্কা দিয়ে বলে, 'কি ঝামেলা লাগিয়েছে এখানে; যাও গেট খুলে দাও।'

রুইদাসের ঘাড়টা একটু যেন টান হয়ে ওঠে। চাপরাশির ধাক্কাটা

গ্রাহ্য না করে সে আবার বলে, দোহাই হুজুর গরীবের ওপর একটু দয়া করুন।'

চাপরাশি বুঝি এবার ঘাড় ধাক্কাই দিতে যাচ্ছিল। হাকিম সাহেব হাত নেড়ে তাকে নিষেধ করে আবার সেই পোষাকী হাসি টেনে বলেন, 'আমি কি দয়া করব, বল? কুইনিন দরকার হয় ডাক্তারকে দিয়ে সই করিয়ে নাও গে যাও।'

'ভিজিটের অত টাকা কোথায় পাব হুজুর? ভিজিটটা না দিলে ডাক্তারত সই করবে নি।'

'তা হলে আমি কি করতে পারি বল? কুইনিন ত আমার দয়ার ব্যাপার নয়, আইনের ব্যাপার!'—হাকিম সাহেব এবার বিরক্তটুকু গোপন করেন না।

'আইনের ত আপনারাই মালিক হুজুর?'

হাকিম সাহেবের এবার ধৈর্যচ্যুতি হয়। তবু নিজেকে সামলে গম্ভীর ভাবে বলেন, 'মালিককেও আইন মানতে হয় বুঝেছ, যাও এখন গেটটা খুলে দাও গিয়ে।'

'গেটত খুলতে পারব না হুজুর'—রুইদাস এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

হাকিম সাহেব প্রথমে কথাটা শুনেছেন বলে বিশ্বাসই করতে পারেন না। আশ-পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মতই খানিক স্তম্ভিত হয়ে থেকে তিনি অবশেষে বলেন, 'পারবে না মানে?'—নিজেকে সামলাতে মুখ চোখ তাঁর তখন লাল হয়ে উঠেছে।

'খোলবার আইন নাই হুজুর!'

'আইন থাকে না থাকে আমি বুঝব। আমি বলছি তুমি গেট খুলে দাও।'—যথাসাধ্য সরকারী গম্ভীর্য্য বজায় রাখবার চেষ্টা সত্বেও মনে হয় গলাটায় যেন একটু চিড় ধরেছে।

'মাপ করবেন হুজুর, পারব না। আইন মালিককেও মানতে হয়।' শুধু হাকিম সাহেবের মুখের ওই চেহারাটুকু দেখবার দরকার ছিল।

'এত বড় আস্পর্দা! ছোট মুখে এত বড় কথা!' চাপরাশির চড়টা সজোরে গালে এসে লাগে, আরদালির রুদ্দাটাও সেই সঙ্গে ঘাড়ে। দুজনে

নেকড়ে বাঘের মত রুইদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রুইদাসের হাতের একটা ঘা খেয়ে চাপরাশি মাটি নেয় বটে কিন্তু সে নিজেও তখন ছিটকে পড়েছে। কানের ঘুসিটায় মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলেও হুঁস তার যায় নি। যতগুলো মানুষ তার চারধারে ভিড় করে এসেছে সবাই তার বিপক্ষে সে জানে। কেউ তাকে পছন্দ করে না, তার হয়ে দাঁড়াবার কেউ নেই। এতগুলো লোকের কাছে তার জারিজুরি বেশিক্ষণ খাটবে না সে বোঝে।

কিন্তু তবু সে হার মানবে না কিছুতেই। এখনও গেটের চাবি তার কাছে; সে চাবি সে দেবে না, প্রাণ থাকতে। যেমন করে হোক এ চাবি তাকে এদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। চাপরাশি মাটি থেকে উঠে আবার তার দিকে তেড়ে আসছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভিড়ের একটি ফাঁক দিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে যায়। জমাট মানুষের ভিড় কি করে তার সামনে ধোঁয়ার মত ফাঁক হয়ে যায় সে বুঝতে পারে না।

পেছনে একটা মস্ত শোরগোল উঠেছে সে টের পায়। কিন্তু একবার ভিড় থেকে বেরিয়ে পিছু ফিরে আর সে তাকায় না। লাইনের ওধারে রেলের তারের বেড়া, সে তারের বেড়া টপকে গেলে কটা কাঁটা ঝোপে ঢাকা পাথুরে ঢিবি। সে ঢিবিগুলোর ওধারেই দুর্ভেদ্য ঘন জঙ্গল দূরের পাহাড়গুলো পর্যন্ত ছড়ান। সোজা সে জঙ্গলের দিকে রুইদাস রওনা হয়। একেবারে ঘন গাছের ঝোপে গিয়ে না পৌঁছান পর্যন্ত সে আর থামে না। চারদিকে তাকিয়ে এবার সে বুঝতে পারে এতদূর পর্যন্ত তার পিছু নিতে কেউ পারে নি।

সারাদিন বনের মধ্যে লুকিয়ে কাটিয়ে গভীর রাত্রে রুইদাস চুপিচুপি চোরের মত তার ঘরের দিকে ফেরে। সারাদিনের অনাহারে দুর্ভাবনায় শরীরটার চেয়ে মনটাই তার যেন ভেঙ্গে পড়েছে। নিজের আহাম্মুকির জন্যে আপশোষের তার আর সীমা নেই তখন। রাখালীর এতক্ষণে কি হাল হয়েছে কে জানে? বেঁচে যদি বা থাকে প্রাণটা ঠোঁটে এসে ঠেকেছে সন্দেহ নাই। কেউ একবার উঁকি মেরে দেখে তার মুখে একটু জল দেবে এতটুকু আশাও সে করতে পারে না। সবই তার দোষ। না, এইবার

সে সত্যি করে নিজেকে শোধরাবে পণ করেছে। রাখালীকে একবার দেখে সে হাকিম সাহেবের কাছে গিয়ে ধরা দেবে। মাটিতে মাথা লুটিয়ে মাপ চাইবে। যা শাস্তি নেবার নেবে। ঘাড় আর সে জীবনে সোজা করবে না।

সন্তর্পণে উঠোনের দিকের বেড়াটা টপ্‌কে পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। তারই আলোয় জন তিনচার লোককে সেখানে দেখা যাচ্ছে। রুইদাসের পায়ের শব্দেই ফিরে তাকিয়ে, 'কে'? বলে একজন উঠোনে বেরিয়ে আসে। রুইদাস অবাক হয়েই বোধ হয় আর পালাবার চেষ্টা করতে ভুলে যায়। লোকটা আর কেউ নয় সাধন শিকদার।

শিকদার তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলে, 'তা বলে এই এত রাত করে! আমরাত ভাবছিলাম, বুঝি আর আসবিই না'।

অন্যেরাও এখন তাদের কথা শুনে উঠোনে নেমে এসেছে। রুইদাস বিমূঢ়ভাবে তাদের দিকে তাকায়। সাধন শিকদার, নরহরি মালি, এমন কি কামাখ্যা ডাক্তার পর্য্যন্ত এতরাত অবধি তার ঘরে বসে আছে তার অপেক্ষায়!

ধরা গলায় সে জিজ্ঞাসা করে কোন রকমে "কেমন আছে এখন!"

'তোর বৌ! ভালো আছে ভালো আছে!' শিকদার জবাব দেয়, 'কামাখ্যা ডাক্তার নিজে হাতে ওষুধ এনেছে, চারটিখানি কথা ত নয়!'

'মিথ্যে মিথ্যে সকাল বেলা আমায় যা নয় তাই বলে মেজাজটা বিগড়ে দিয়ে এলে!' কামাখ্যা ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, 'থাকলে আর ভাল ওষুধ দেই না।'

নরহরি তাড়া দিয়ে বলে, 'সময় বড় অল্প হে, ভোর না হতেই হয়ত থানার লোক এসে হানা দেবে। যা সলা পরামর্শ করবার এই বেলা সেরে ফেল।'

তারা সবাই ঘরে গিয়ে ওঠে। রাখালী ঘুমিয়ে আছে। তার পাশে আর একটি কে মেয়ে ঘোমটা টেনে বসে আছে। অবাক হয়ে রুইদাসকে

সে দিকে চাইতে দেখে শিকদার যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলে, 'নিয়ে এলাম বৌটাকে! দেখাশোনা করতে একটা মেয়েছেলেত চাই।'

এবার তাদের পরামর্শ সুরু হয়। রুইদাস হতভম্বের মত শুনে যায় শুধু। সহরে বাজারে নাকি হৈ চৈ পড়ে গেছে। তার নামে নাকি হুলিয়া বেরুবে। জবর খুন জখম দাঙ্গার দায়ে তাকে জড়ান হয়েছে। আরদালির দুটো দাঁত ভেঙেছে, চাপরাশির পা থেকে হয়েছে রক্তপাত। রেলের চাকরীর দফাও তার রফা, ওপরওয়ালাদের কাছে খবর গেছে।

তা যাক্ কুছ পরোয়া নেই। শিকদারও বেশীদিন এখানে আর থাকছে না। রুইদাস চায় ত মামলা লড়ুক, আর নয়ত শিকদার এখুনি বেরিয়ে পড়তে রাজি তাকে নিয়ে, কেউ তাদের চুলের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাবে না। রুইদাসের বৌএর জন্যেই বা ভাবনা কিসের? শিকদারের যা হোক একটা চুলোত আছে। সেখানে তার বৌ ছেলেমেয়ের যদি দু মুঠো জোটে তা হলে রুইদাসের বৌকেও উপোসী থাকতে হবে না। আর তারা দুটো জোয়ান মদ্দ—এতবড় দুনিয়ায় তাদের দানাপানি কি কোথাও মিলবে না?

রুইদাস অবাক হয়ে এদের মুখের দিকে চায়। শুধু লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় এদের মুখ এত জলজ্বলে হয়ে ওঠেনি। কি একটা নতুন কিছু যেন তারা পেয়েছে। রুইদাসকে তারা বিষ নজরে দেখে না। তার বেয়াড়া ঘাড় তার ঝাঁঝালো তেতো মুখ তারা যেন নতুন একদিক থেকে দেখছে। হয়ত কাল সকাল পর্যন্ত এ উৎসাহ তাদের সবার থাকবে না, তবু হঠাৎ তারা যেন এইটুকু আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেছে যে, মাথাটা উঁচু করে রাখবার জন্যেই ঘাড়ের ওপর বসান, মাটিতে লুটোবার জন্যে নয়।

অর্জুন মণ্ডল

বনফুল

কড়া নাড়ার শব্দে উঠে বসলাম। শীতকালে এতরাত্রে কে এল আবার!

"কে—"

"আমি, আমি, কপাট খোল"

খুললাম। সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জ্বাললাম। দেখি খর্বকায় একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। আজানুলম্বিত গলাবন্ধ খদ্দরের কোট গায়ে। মাথার সামনের দিকটা কেশ-বিরল, চোখ নিষ্প্রভ, ভুরুতে পাক ধরেছে, সমস্ত মুখে বলি-রেখা, সামনে গোটা দুই দাঁত নেই।

"আমার চিঠি পাওনি নিশ্চয়"

"না"

"চিতুয়া পোস্ট করেনি তাহলে। শালা ডাকু। নিজে হাতে পোস্ট করলেই ঠিক হত···তাকে দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল। ভুল, ভুল, এ জীবনটা ভুল করতে করতেই কাটল বীরেনবাবু"

হঠাৎ অর্জুনকাকাকে চিনতে পারলাম আমি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরই চিনিয়ে দিলে তাঁকে। বহুদিনের যবনিকা সরে গেল যেন।

"অর্জুনকাকা! হঠাৎ এত রাতে কোথা থেকে"

"তীর্থে যাচ্ছি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। শহরে জিনিসপত্রও কিনতে হবে কিছু। তোমাকে এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিলাম বোধ হয়। আমার ধারণা ছিল চিঠি পেয়েছ তুমি"

"না, না, তার জন্যে কি হয়েছে"

"হয়নি কিছু। তোমার কাছে খবর না দিয়ে আসবার জোরও আমার আছে। কিন্তু চিতুয়াটার কথাই ভাবছি। এই সব ছোটখাটো ব্যাপার থেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝা যায় কি না—"

অর্জুনকাকা মাঝে মাঝে কথাবার্তাতেও শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। 'বুঝা' 'দিব' নিয়ে আগে কত হাসাহাসি করেছি আমরা।

"ডাকের গোলমাল হয়েছে হয় তো।"

"না ও কথা মানব না আমি"

অর্জুনকাকা বারান্দা থেকে নেবে গেলেন এবং গাড়ি থেকে নিজেই নিজের জিনিসপত্র নামাতে উদ্যত হলেন।

"আপনি ছেড়ে দিন না, গাড়োয়ানই নামাবে এখন"

"কেন ওকে বেশী পয়সা দিতে যাব মিছামিছি"

'মিছামিছি' ও অর্জুনকাকার বিশেষত্ব।

"দাঁড়ান, আমার চাকরটাকে ডাকি তাহলে"

"চাকরকেই বা ডাকবে কেন। আমার গায়ে জোর নাই না কি"

অবলীলাক্রমে নাবিয়ে ফেললেন সব। বিছানা, প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ, লোহার উনুনও একটা। চুক্তি মাফিক গাড়োয়ানকে পাই পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন—"কোন ঘরটায় শুব ?"

বাইরের দিকে খালি ঘর ছিল একখানা। তাতে একটা চৌকিও ছিল। সেইটেই খুলে দিলাম। অর্জুনকাকা বললেন—"যাও, তুমি শুয়ে পড় এইবার। অনেক রাত হয়েছে। আমি এই চৌকির উপর নিজেই বিছানা বিছিয়ে নিচ্ছি। তুমি যাও"

"আপনার খাওয়া দাওয়া ?"

"রাত্রে আমি কিছুই খাব না"

"দু' চারখানা লুচিটুচি ভেজে দিক না, কি আর এমন রাত হয়েছে"

বিছানা পাততে পাততে অর্জুনকাকা বললেন—"তোমার সঙ্গে কি আমি লৌকিকতা করছি ?"

চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "চিতুয়া এবারও ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি, বুঝলে"

"ও"

"নিজেই ভুগবে শালা। আমার কি"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"যাও, আর রাত কোরো না, শুয়ে পড়"

"সত্যিই কিছু খাবেন না ?"

"দেখ, বেশী যদি পীড়াপীড়ি কর বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে চলে যাব তাহলে"

বুঝলাম অর্জুনকাকা বদলাননি। আর দ্বিরুক্তি না করে শুতে চলে গেলাম।

শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। অর্জুনকাকার কথাই ভাবতে লাগলাম। অর্জুনকাকার কথা বাবার মুখে খানিকটা শুনেছি—নিজেও দেখেছি খানিকটা। আশ্চর্য জীবন লোকটার! স্বাধীন দেশে জন্মালে দিগ্বিজয় করতে পারতেন। এ দেশে কিছু হল না। জাতে জেলে। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। মাথায় করে মাছের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে এসে হাটে বেচতেন আমাদেরই বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই হাট বসত। অর্জুনকাকার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটা এখনও আমার মনে আছে।

হাটে প্রচণ্ড একটা গোলমাল উঠল একদিন। চীৎকার চেঁচামেচি, কলরব আর্তনাদে সমস্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। একটা জায়গায় ভীড়টা জমাট বেঁধে গেল। মনে হতে লাগল তার কেন্দ্রে ভয়াবহ কি যেন একটা হচ্ছে। হঠাৎ ভীড় ঠেলে অর্জুনকাকা বেরিয়ে এলেন। তাঁর বগলে একটা রুই মাছ। বাবা হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। অর্জুনকাকা ছুটে এসে মাছটা দড়াম করে সামনে ফেলে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

"আমায় বাঁচান আপনি ডাক্তারবাবু, শালারা আমার সব কেড়ে নিচ্ছে"

বাবা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

"কি কেড়ে নিচ্ছে ? কারা ?"

"জমিদারের সিপাহিরা। মাছ কেড়ে নিচ্ছে আমার। রোজই নেয় কিছু কিছু। আজ এই বড় রুইটা নিতে যাচ্ছিল। দেব না বললাম তো মারলে এক চড়। আমিও ঘুরিয়ে এক চড় মেরেছি শালাকে"

গুরুতর ব্যাপার। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের বিরুদ্ধে সামান্য জেলের এই বিদ্রোহ হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ ঘটনা নয়। বাবা একটু বিব্রত হলেন। সামান্য অবাধ্যতার জন্য এই জমিদার একজন গরীব প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন কিছুদিন আগে।

"আচ্ছা তুমি চুপ করে' বস এইখানে"

বাবার পা ছেড়ে অর্জুনকাকা এককোণে বসলেন গিয়ে। সিপাহি দু'জনও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বাবা জিগ্যেস করলেন "এর মাছ কেড়ে নিচ্ছিলে কেন তোমরা?"

"এইসেই তো রেওয়াজ হ্যায় হুজুর। মাহিনামে একঠো বড়া মছলি তো উসকো দেনাই চাহিয়ে"

"নেহি দেগা"

কোণ থেকে গর্জ্জন করে' উঠলেন অর্জুনকাকা।

সিপাহিদের চক্ষু অগ্নি বর্ষণ করতে লাগল।

ডাক্তার বলে' বাবাকে ইতর ভদ্র সকলেই খাতির করত। তাই সিপাহিরা আত্মসম্বরণ করে' দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা সিপাহিদের বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যাও। তোমাদের মালিককে যা বলবার আমি বলব। ওকে তোমরা কিছু বোলো না এখন"

সিপাহিরা চলে গেল।

জমিদারও বাবাকে খুব খাতির করতেন। অর্জুনকাকার কিছু হল না। বাবার খাতিরে জমিদার তার মাছ নেওয়াই মাপ করে' দিলেন। অতিশয় সামান্য ব্যাপার। জমিদাররা মানীর মান রাখবার জন্যে হামেসাই এরকম করে' থাকেন। অর্জুনকাকার কিন্তু তাক্ লেগে গেল। অত বড় দুর্দ্ধর্ষ রাবণ মিশির লিকলিকে রোগা এই ডাক্তার বাবুটির কাছে একেবারে কেঁচো! উঃ, বিদ্যার কি প্রতাপ! কি হবে পয়সায়, কি হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস। বশিষ্ঠের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।

উক্ত ঘটনার দিন সাতেক পরে অর্জুনকাকা একদিন এসে একটু কাচুমাচু হয়ে বাবাকে বললেন—"আমার একটা আরজি আছে ডাক্তারবাবু"

"কি বল"

"আমি কিছু লিখাপড়া করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন"

এইবার বাবার তাক্ লাগল।

"তুমি লেখাপড়া করবে! তোমার সংসার দেখবে কে?"

"আমার স্ত্রী। আমার জমি জমা কিছু আছে, আমার স্ত্রী ধান কুটে, ছাতু পিষে—চলে যাবে কোন রকমে। আমিও রোজকার করব কিছু"

"ক'টি ছেলে পিলে তোমার"

"সাতটি মেয়ে, ছেলে নাই"

বাবার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু অর্জুনকাকার চোখে জ্বলন্ত আগ্রহ দেখে হাস্য সম্বরণ করতে হ'ল তাঁকে।

"পড়াশোনা করবে! সে তো ভাল কথাই। কিন্তু করবে কি করে' স্কুলে তো আর নেবে না তোমায়"

"নেবে না?"

"এ বয়সে কি আর স্কুলে নেয়"

"তবু আমি পড়ব। আপনি যদি একটু দয়া করেন তাহলে হয়"

"কি করব বল"

"আপনার চরণে যদি আশ্রয় দেন একটু। আপনার হাতায় আমি ছোট কুঁড়ে বেঁধে থাকব, আর আপনার ছেলেদের কাছেই পড়ব, তাদেরই পুরনো বই টই নিয়ে…"

বাবা একটু চুপ করে' রইলেন। অর্জুনকাকার আগ্রহ দেখে তাঁকে তিনি নিরস্ত করতেও পারছিলেন না, অথচ এরকম একটা অসম্ভব প্রস্তাবে সায় দিতেও কেমন যেন লাগছিল তাঁর। একটু চুপ করে' থেকে দ্বিধাভরে শেষে বললেন, "বেশ, পার তো আমার আপত্তি কি"

তার পরদিনই বাঁশ খড় দড়ি কাটারি শাবল কোদাল নিয়ে

অর্জুনকাকা এসে পড়লেন, দেখতে দেখতে ছোট কুঁড়ে ঘরটি বানিয়ে ফেললেন। আমরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম আর সেইদিন থেকে তিনি হলেন আমাদের অর্জুনকাকা। আমাদের যে মাষ্টারমশাই পড়াতেন তিনিই অর্জুনকাকার অক্ষর পরিচয় করিয়ে হাতে খড়ি দিয়ে দিলেন। আমাদেরই প্রথম ভাগ এবং ফাষ্ট বুক নিয়ে তাঁর পড়া শুরু হয়ে গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে আমাদের ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।

অর্জুনকাকা খুব ভোরে উঠতেন। এত ভোরে যে আমরা টেরই পেতাম না। আমরা উঠে দেখতাম তিনি কাজে বেরিয়ে গেছেন। মজুরের কাজ করে' বেড়াতেন দিনের বেলায়। যা পেতেন স্ত্রীকে দিয়ে আসতেন। ফিরতেন বিকেলে। বিকেলে এসেই তিনি খাওয়া দাওয়া করতেন। প্রায়ই রাঁধতেন না। দই চিঁড়ে কলা প্রিয় খাদ্য ছিল—ছাতুও খেতেন কখনও কখনও। খেয়ে উঠেই হাতের লেখা লিখতেন দিনের আলো থাকতে থাকতে। সন্ধ্যা হলে প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসতেন। রেড়ির তেলের বেশ বড় একটা প্রদীপ ছিল তাঁর। ভোরে কাজে বেরোবার আগে তিনি যে পড়াটা পড়তেন তা আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যে ভাবে পড়তেন তার থেকে তা আন্দাজ করে' নেওয়া অসম্ভব ছিল না। শির-দাঁড়া একটুও বেঁকতে দেখিনি কখনও। টেবিল চেয়ার ছিল না, আমাদের মতো চাপটালি খেয়েও বসতে পারতেন না তিনি। উবু হয়ে বসতেন। সামনে থাকত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, তার উপর খবরের কাগজ পাতা। তা'তেই একটি ছোট ইটের উপর তিনি প্রদীপটি রাখতেন। সেই কেরোসিন কাঠের বাক্সটি একাধারে ছিল তাঁর টেবিল এবং শেলফ্। নীচের ফাঁকটায় তাঁর বই খাতা দোয়াত কলম থাকত। কি সুন্দরভাবে যে গুছিয়ে রাখতেন সেগুলিকে। খাগের কলমটি, পেন্সিলটি নিখুঁত-ভাবে কাটা। আমাদের পেন্সিল কলমও তিনিই বেড়ে দিতেন। পিতলের দোয়াতটি ঝকঝক করত। প্রত্যেক বইয়ে কি সুন্দর মলাট দিতেন। কিছুক্ষণ পড়বার পরই কিন্তু ঘুম পেত তাঁর। কিন্তু ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করবার লোক অর্জুনকাকা নন। উঠে চা করতেন

ঘুঁটের উনুন জেলে। ঘুঁটের ধোঁয়ায় শুধু ঘুম নয় মশাও পালাত। একটি ঘটি চা খেতেন তিনি, এক আধ কাপ নয়। রাত্রে আর কিছু খেতেন না। চা খেয়ে আবার সুরু করতেন পড়া। কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুল ধরত। চোখে সর্ষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধরে' টানতেন। ঠাস ঠাস করে' নিজের গালে চড়ও মারতেন কখনও কখনও। আমরা হাসতাম। কারণ অর্জুনকাকার সাধনার ঠিক স্বরূপটি বোঝবার মতো বয়স হয় নি আমাদের তখনও। এখন বুঝতে পারি পুরাকালে শিক্ষার্থী যেমন গুরু-গৃহে বাস করে' অধ্যয়ন করত, অর্জুনকাকাও তেমনি আমাদের বাড়িতে থেকে পড়তেন। অর্জুন কাকার গুরুস্থানীয় হবার মতো লোক অবশ্য কেউ ছিল না, তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল সেকালের বিদ্যার্থীদের মতো। ওরকম নিষ্ঠা আর কোথাও দেখি নি। মাঝে মাঝে দু'একদিনের জন্য বাড়ি যেতেন অবশ্য, কিন্তু তা দু'এক দিনের জন্যই। মাসের অধিকাংশ দিনই পড়াশোনা করতেন তাঁর কুঁড়ে ঘরে বসে'। এই ভাবে পড়ে' বছর দেড়েকের মধ্যে বাংলায় সীতার বনবাস এবং ইংরাজীতে রয়াল রীডার নম্বর ফোর পর্যন্ত পড়ে ফেললেন তিনি। অঙ্কও শিখলেন কিছু কিছু। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক বেশ কষতে পারতেন। তাঁর উৎসাহ দেখে স্কুলের মাস্টার পণ্ডিত সবাই সাহায্য করতেন তাঁকে। অর্জুনকাকা বিনামূল্যে কারও সাহায্য নেবার লোক নন। নানাভাবে প্রতিদানও দিতেন তিনি। দইটা মাছটা কলাটা মুলোটা তো দিতেনই, সেবাও করতেন। কারও পা টিপে দিতেন, কারও কাপড় কেচে দিতেন, কারও বাজার করে' দিতেন, কিছুতেই আপত্তি ছিল না তাঁর।

এই ভাবেই হয়তো আরও কিছুদিন চলত কিন্তু হঠাৎ একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে' সব ওলট পালট হয়ে গেল। হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এক সাহেব সিভিল সার্জন এলেন একদিন। সকালে স্টেশনের কুলি তাঁর জিনিষ পত্র বয়ে এনেছিল, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ফেরবার সময় জিনিস বইবার লোক পেলেন না। হাসপাতালের চাকরটা

অসুস্থ, আমাদের চাকরও বাড়ি গিয়েছিল। কাছে কুলি-জাতীয় কাউকে না পেয়ে সাহেব (এবং বাবাও) বিপন্ন বোধ করছিলেন। স্টেশন বেশ একটু দূরে, সাহেবের মালও নেহাৎ হাল্কা নয়। অর্জুনকাকা নিজের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে' দড়ি পাকাচ্ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি বসে বসে' দড়ি পাকাতেন এবং প্রতি হাটে তা বিক্রি করতেন। বাবা গিয়ে তাঁকে বলতেই তিনি সাহেবের জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয় এগিয়ে এসে সাহেবকে সেলাম করে' বললেন —Yes, Sir, I Shall carry your things most gladly. অর্জুন কাকার মুখে সাহেব ইংরেজি শুনবেন প্রত্যাশা করেন নি, শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বাবার মুখে অর্জুন কাকার ইতিহাস এবং অধ্যবসায়ের গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হলেন। স্টেশনে মালপত্র নাবাতেই সাহেব তাঁকে একটি টাকা দিতে গেলেন। অর্জুনকাকা পুনরায় সেলাম করে বললেন —Thank you sir, I am a labourer, no doubt, but I shall not accept anything' from you.

বিস্মিত সাহেব প্রশ্ন করলেন—Why ?

"You are our Doctor Babu's honoured Guest." সাহেব অত্যন্ত খুশী হয়ে গেলেন। অর্জুনকাকা জিনিসপত্র নাবিয়ে চলে যাবার পর সাহেব বাবাকে বললেন, "ও যদি চায় আপনি ওকে অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে ভরতি করে' নিন। কিছুদিন পরে পরীক্ষা দিয়ে পাকা ড্রেসার হোক। তারপর ওকে আমি কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যেও স্কলারশিপ জোগাড় করে দেব।

খবরটা শুনে অর্জুনকাকা অবাক হয়ে গেলেন। একটু দমে'ও গেলেন। একাগ্রচিত্তে তিনি যে পথে সবেগে চলছিলেন হঠাৎ তাতে বাধা পেয়ে এবং সে বাধা দুরতিক্রম্য অনুভব করে' (স্বয়ং ডাক্তারবাবু যখন তাকে ড্রেসার হ'তে বলছেন তখন তা' দুরতিক্রম্য ছাড়া আর কি) অর্জুনকাকার এমন অদ্ভুত একটা ভাবান্তর হ'ল যা প্রায় অবর্ণনীয়। হতাশা, জেদ, বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ, ক্ষোভ এবং এই সবটার জন্য দায়ী যে অদৃশ্য শক্তি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—সমস্তটা সমবেতভাবে ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে।

ইতিপূর্ব্বে তাঁর মুখের এ রকম ভাবান্তর আরও কয়েকবার লক্ষ্য করেছিলাম আমি। অর্জুনকাকা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন তাঁর ঘরে একা থাকতেন আমি মাঝে মাঝে ফুটো দিয়ে (তাঁর দরমার ঝাঁপে অসংখ্য ফুটো ছিল) তাঁকে লক্ষ্য করতাম। তাঁর মুখের এ রকম ভাবান্তর হতে অনেকবার দেখেছি। এর চেয়েও বেশী অস্থির হতেও দেখেছি। হঠাৎ তাঁর চোখ মুখ কেমন যেন হয়ে যেত, উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতেন, মনে হত জিবটা যেন চিবুচ্ছেন। নাকটা খুব জোরে কুঁচকে খুব ঘনঘন চিবুতেন মনে হত। ছোট একটা হাত-আয়না ছিল তাঁর। চালে গোঁজা থাকত সেটা। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ সেইটে পেড়ে ভ্রূকুটি সহকারে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে থাকতেন খানিকক্ষণ। অতীত জীবনে যে সব দুরতিক্রম্য বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি, অন্যায়ভাবে নিয়তির কাছে যতবার পরাভূত হয়েছেন, তাঁর সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি তাঁকে মাঝে মাঝে পাগল করে' তুলত বোধ হয়। আয়নার দিকে চেয়ে নিজেই নিজেকে ভ্যাংচাতেন। হয়তো কথঞ্চিৎ শান্তি পেতেন তাতে।

বাবার কথা শুনে বললেন, "কাল থেকে ঘা ধোয়াব! সে কি! তিন তিনখানা ডিক্‌শ্‌নারি আনতে দিয়েছি আমি —"

"অত ডিক্‌শ্‌নারি কি হবে!"

"মুখস্থ করব"

"মুখস্থ করবে? কি হবে ডিক্‌শনারি মুখস্থ করে'। তাছাড়া অত পড়েই বা তোমার লাভ কি, পরীক্ষা তো তোমায় দিতে দেবে না।'

"দেবে না? কেন!"

"এই নিয়ম। প্রাইভেটলি মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারে। আর পারে শিক্ষকরা...তাও তিন বচ্ছর চাকরি করার পর।" অর্জুনকাকা বললেন—"শুনেছি হাই স্কুলে টেষ্ট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়া যায়"।

"তা যায় বটে। কিন্তু তার পর আর পারবে না, কলেজে ভর্তি হতে হবে। আই. এ. পাশ করতে করতে বুড়ো হয়ে যাবে। তাতে

লাভটা হবে কি। তার চেয়ে এইতেই লেগে পড়। কম্পাউণ্ডার হতে পার যদি কাজ হবে একটা ”

অর্জুনকাকা চুপ করে রইলেন।

পরদিন থেকেই অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসারের পদে বাহাল হয়ে গেলেন তিনি। ড্রেসার করিম মিঞার কাছে প্রথম পাঠ নিলেন ব্যাণ্ডেজ পাকাতে হয় কি করে'। করিম মিঞার খুব সুবিধে হল। ছাঁ পোষা লোক তিনি। মুরগী, ছাগল, গোটা দুই বিবি এবং গোটা বারো ছেলে মেয়ে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে যে হাঁসপাতালের কাজে মন দেবার অবসর পেতেন না তিনি। বাবার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতেন। অর্জুন কাকাকে শাকরেদ্ পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি। অর্জুন কাকাই সমস্ত কাজ করতে লাগলেন। সুর্য্যোদয়ের পুর্বে ব্যাণ্ডেজ পাকানো, ছুরি কাঁচি পরিষ্কার, খাতায় রুলটানা, টেবিল ঝাড়া—সমস্ত হয়ে যেত। হাঁসপাতালের চাকরটার আসতে দেরি হলে তার কাজও করে দিতেন। কম্পাউণ্ডার হারাধন বাবুও প্র্যাকটিস করবার সময় পেলেন। স্টক মিকশ্চার, স্টক মলম অর্জুন কাকাই করতে শিখে গেলেন; অল্প কিছুদিন পরে সার্জিকাল যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিষ্কার করতেন, লেবেল ময়লা হয়ে গেলে পরিচ্ছন্ন অক্ষরে লিখতেন সেগুলি, এমন কি বাবার হয়ে রিটার্নও করে' দিতেন প্রত্যহ। অর্জুনকাকা হাঁসপাতালের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠলেন দেখতে দেখতে। হাঁসপাতালের চেহারাই বদলে গেল। অর্জুনকাকার দৈনন্দিন কার্য্যক্রমও বদলে গেল অবশ্য খানিকটা। মজুরি খাটাবার জন্যে আর বেরুতেন না। অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে সিভিল সার্জন যে বেতন তাঁকে মঞ্জুর করেছিলেন যদিও তা সামান্যই কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তিনি। লেখাপড়া বন্ধ করেন নি, বরং বাড়িয়েছিলেন। বাঙলায় বসুমতী সংস্করণের বঙ্কিম চন্দ্র থেকে শুরু করে' অনেক গ্রন্থাবলীই কিনে পড়েছিলেন তিনি। ইংরেজিতে রবিন্সন ক্রুশো, গ্যালিভার্স ট্রাভল্স, পিলগ্রিম্স্ প্রগ্রেস্ জাতীয় বই কিনে শেষ করতে লাগলেন একটার পর একটা। ডিক্শনারি মুখস্থ করবার উদ্যমটা নিয়োজিত করতে হ'ল ড্রেসারি বিষয়ক জ্ঞান-আহরণে। কোর্স

ছিল অবশ্য ছোট একখানা চটি বই। কিন্তু ওইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবার লোক অর্জুনকাকা নন। তিনি সেই বইটা আগাগোড়া মুখস্থ তো করলেনই, সে বিষয়ে আরও যে সব বই বাজারে ছিল তাও আনিয়ে পড়ে ফেললেন একে একে। এতে কিন্তু ফল শেষ পর্যন্ত ভাল হল না। কারণ সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন অন্য একজন লোক।

তিনি এতবড় একজন দিগ্‌গজকে পরীক্ষার্থী রূপে পাবেন আশা করেন নি। কোন কোন বিষয়ে অর্জুনকাকার জ্ঞান তাঁর চেয়েও বেশী এটা বরদাস্ত করা শক্ত হল তাঁর পক্ষে। তিনি সহজ সরল উত্তর প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু অর্জুন কাকা অনেক বই পড়েছেন, একই প্রশ্নের নানা বিচিত্র উত্তর জানা ছিল তাঁর। প্রত্যেক ব্যাণ্ডেজের উদ্ভব, উপযোগিতা, ইতিহাস, সুবিধা অসুবিধা তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন তিনি। বড় বেশী কথা বলছে দেখে পরীক্ষক ধমক দিলেন। অর্জ্জুনকাকা ধমকে নিরস্ত হবার লোক নন। রাত জেগে অনেক বই পড়েছেন, সমানে তর্ক করতে লাগলেন। পরীক্ষকের সঙ্গে তর্ক করা ডাক্তারি লাইনে শ্রেষ্ঠতম অপরাধ। ফেল হয়ে গেলেন তিনি। ফেল হয়ে অর্জ্জুনকাকা যে দিন ফিরে এলেন সেদিনও ওইরকম মুখভার দেখেছিলাম তাঁর। হতাশা জেদ ক্ষোভ এবং সমস্তটার জন্য দায়ী যে দুরতিক্রম্য নিয়তি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—এই সবগুলো একসঙ্গে যেন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখভাবে, চোখের দৃষ্টিতে। সমস্ত দিন ঘর থেকে বেরুলেন না। মাঝে মাঝে সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠেছে, চালে গোঁজা আয়নাটা পেড়ে অতি কুৎসিত ভাবে ভ্যাংচাচ্ছেন নিজেকে। অবশ্য ওই একদিন মাত্র; পর দিন থেকেই আবার কাজে লেগে গেলেন পূর্ণ-উদ্যমে। যেন কিছুই হয়নি।

পরের বার পাশ করলেন। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যে স্কলারশিপও পেলেন। কিন্তু একটা মুশকিল হল। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্য কটক যেতে হবে। পরিবার রেখে যাবেন কার কাছে? দিন কয়েক ছুটি নিলেন। ছুটির পর ফিরে এসে কিন্তু তিনি যে খবর দিলেন তা অভাবনীয়। পাশের গ্রামেই অর্জুন কাকার স্বজাতি বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল একঘর। বেশ ভাল অবস্থা, ছোটখাটো জমিদারী আছে।

তাঁর সাত ছেলে। তিনি না কি তাঁর সাত ছেলের সঙ্গে অর্জ্জুন কাকার সাত মেয়ের বিয়ে দিতে চান। হাঁসপাতালে চাকরি হওয়াতে এবং আমাদের সম্পর্কে আসাতে অর্জ্জুনকাকার একটা খ্যাতি রটে গিয়েছিল নিজেদের সমাজে। এ প্রস্তাবে আনন্দিত হওয়ার কথা, কিন্তু অর্জ্জুন কাকা এতে বিপন্ন বোধ করলেন।

"এ এক মহা আফৎ হল"

অর্জ্জুন কাকা 'আপদ' কে'আফৎ' বলতেন।

বাবা বললেন, "আমার তো মনে হচ্ছে ভালই হল। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে চলে যাও তুমি। মেয়েরা তোমার সুখেই থাকবে। ওরা বড়লোক"

"বড়লোক বলেই আমার আপত্তি। বড়লোক মানেই পাজি, বদমাস, চোর লম্পট লুচ্যা—"

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অর্জ্জুনকাকা।

"আপনি তো সবই জানেন ডাক্তারবাবু। এই জমিদার শালারাই দেশকে চুষে খেয়ে ফেললে। আমার কি হাল হয়েছিল আপনি তো সবই জানেন, আপনি না থাকলে আমাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলত শালারা—"

"সবাই খারাপ নয়। এরা লোক ভাল"

"আপনি বলছেন?"

অর্জ্জুনকাকার মুখভাব আবার সেইরকম হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশঃ। বড়লোকদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার ইচ্ছে নেই তাঁর, কিন্তু বাবা যখন এতে মত দিচ্ছেন তখন তা অমান্য করবার সাধ্যও নেই। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি!

বাবা বললেন, তোমার মেয়েদের যদি নাও দাও তাহলে কার কাছে রেখে যাবে এদের? মাসখানেকের মধ্যেই তো কটক যেতে হবে তোমাকে"

"তার জন্তে আমার ভাবনা ছিল না, আমার এক খুড়তুতো ভায়ের কাছে রেখে যাব ভেবেছিলাম। তাকে আনবার জন্যেই কসবায় গয়েছিলাম ছুটি নিয়ে"

"তোমার যা খুশী করতে পার। কিন্তু আমার মনে হয় মেয়েদের বিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল"—এই ব'লে বাবা উঠে গেলেন। অর্জ্জুন কাকা চুপ করে' বসে রইলেন। ক্রমশঃ তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হতে লাগল। চোখ দুটো নিস্পলক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পলক ফেলে জিবটা চিবুতে শুরু করলেন তিনি।

বিয়ের দিনও এক কাণ্ড ঘটল। অর্জ্জুনকাকা তাঁর জমিদার বেয়াইকে জানিয়েছিলেন যে তিনি গরীব মানুষ, বেশী বরযাত্রীর হাঙ্গামা বরদাস্ত করবার শক্তি নেই তাঁর, কুড়ি জনের বেশী বরযাত্রী যেন আনা না হয়। বিয়ের দিন দেখা গেল পঞ্চাশটা ঢোল, কুড়িটা রাম-শিঙে, পনেরটা কাঁসি এবং দশটা শানাই সমভিব্যাহারে এক বিরাট জনতা চতুর্দ্দিক সচকিত করে' অর্জ্জুনকাকার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্জ্জুনকাকা সোজা থানায় চলে গেলেন। দারোগাকে গিয়ে বললেন— হুজুর, আমার বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, বাঁচান আমাকে। দারোগা সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে সত্যিই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন অকুস্থলে। ব্যাপারটা অবশ্য পরিহাসেই পর্যবসিত হল শেষ পর্যন্ত। অর্জ্জুনকাকার বেয়াই শুধু লোকজনই আনেন নি, তাদের বসবার, শোবার, খাবার সমস্ত আয়োজনই সঙ্গে করে' এনেছিলেন। অর্জ্জুনকাকা কিন্তু এতে খুশী হলেন না। অপমানিত বোধ করলেন। ধনী-হস্তের এই অভিনব অস্ত্রে আহত হয়ে চুপ করে' রইলেন। কারণ এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলে না। গুম হয়ে বসে রইলেন কেবল। হয়তো নির্জ্জনে মুখ-ভঙ্গী করে' নিজেই নিজেকে ভেংচেছিলেন, কিন্তু সে খবর আমরা জানি না।

মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল। অর্জ্জুনকাকা নিজের স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কটক চলে গেলেন।

এর পর বছর দুই অর্জ্জুনকাকার কোন খবর পাই নি। মাইনার পাশ করে' আমরা শহরের হাইস্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হলাম। অর্জ্জুন কাকা কটকে কম্পাউণ্ডারি পড়ছেন এইটুকু শুধু জানতাম। মাঝে কার মুখে যেন শুনেছিলাম অর্জ্জুনকাকা সেখানেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বছর দুই পরে অর্জ্জুনকাকা হঠাৎ এসে হাজির হলেন

একদিন। সঙ্গে তাঁর সাত জামাই। তাদের স্কুলে ভর্ত্তি করে' দিয়ে গেলেন। আমাদের অনুরোধ করলেন আমরা যেন একটু দেখা-শোনা করি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বললেন, "বলছি বটে কিন্তু কিচ্ছু হবে না। বড় বিলাসী। আর আফৎ জুটেছে এক পিসি—"

মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে'। পরের ট্রেণেই চলে গেলেন।

আমরা বোর্ডিংয়ে থাকতাম। অর্জ্জুনকাকার জামাইরা একটা বাসা ভাড়া করে' রইল। সঙ্গে এল এক পিসি। তিনিই হলেন গার্জ্জেন। জমিদারি থেকে প্রচুর দুধ দই মাছ ঘি আম কাঁঠাল সরবরাহ হ'তে লাগল, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক তাদের প্রাইভেট পড়াতে লাগলেন, স্থানীয় মনোহারী দোকানটার বিক্রি বেড়ে গেল, অর্জ্জুনকাকার জামাইদের নিত্য নূতন সাজ-সজ্জায় আমরা ঈর্ষান্বিত হতে লাগলাম। কিন্তু অর্জ্জুনকাকা যা বলেছিলেন শেষ পর্য্যন্ত তাই হ'ল। অর্থাৎ জামাই-দের কিচ্ছু হল না। জামাইরা প্রমোশন পেলে না। একদিন হঠাৎ আবার শুনলাম অর্জ্জুনকাকা এসেছেন। শুধু এসেছেন নয়, এসে গো-বেড়েন করেছেন প্রত্যেকটি জামাইকে! বেচারাদের আর্ত্তনাদে পাড়ায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে না কি! দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি বাইরের বারান্দায় ভাঙা আয়না, চিরুণী, স্নো, পাউডার, সিগারেটের বাক্স, কয়েকটা শৌখীন জামা, শাল প্রভৃতি ইতস্তত ছড়ানো। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বাইরের দিকে একটা জানালা ছিল। উঁকি দিয়ে দেখি অর্জ্জুনকাকা! পিছনে দুহাত রেখে ক্রমাগত পায়চারি করছেন আর জিব চিবুচ্ছেন। মুখভাব ভয়াবহ। চুপি চুপি সরে' পড়লাম। অর্জ্জুনকাকা সেই দিনেই চলে গেলেন। তার পর দিন জামাইরাও স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে চলে গেল। এ নিয়ে শুনেছি বেয়াইয়ের সঙ্গে ঘোরতর মনোমালিন্য হয়েছিল অর্জ্জুন কাকার, কিন্তু বাবা মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিয়েছিলেন সব।

আমি ক্রমশ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে' কলেজে ভর্ত্তি হলাম। তারপর আই. এস. সি. পাশ করে' গেলাম মেডিকেল কলেজে। অর্জুনকাকার খবর অনেক দিন পাই নি। এইটুকু শুধু শুনেছিলাম যে

তিনি কম্পাউণ্ডারি পাশ করে' ডিষ্ট্রীক্‌ট্‌ বোর্ডের নানা হাঁসপাতালে চাকরি করে' বেড়াচ্ছেন। একবার ছুটিতে বাড়ি এসে দেখলাম অর্জুন কাকা আমার অপেক্ষায় বসে' আছেন। আমার জন্তেই বিশেষ করে' ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। কেন এসেছেন শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে তিনি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং ফার্মাকোলজি বিষয়ে জ্ঞান-আহরণ করতে চান।

"তুমি তো পড়ছ এ সব, আমাকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দাও।"

বলা বাহুল্য, বিপন্ন হলাম। কিন্তু অর্জুনকাকাকে নিরস্ত করার সাধ্য আমার ছিল না। একবার শুধু ইতস্তত করে বললাম, "এখন আর কি করবেন এসব পড়ে"

তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমার কথা শুনে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে, যেন আমি হাস্যকর অদ্ভুত কিছু বলেছি একটা।

"কি করব! বাঃ"

একটু থেমে তারপর বললেন, "শিখব। শিখতে দোষ কি আছে! তা ছাড়া চাকরি করার আর ইচ্ছা নাই। সব শালা চোর! প্র্যাকটিস করব ঠিক করেছি। আমাকে ডাক্তারিটা ভাল করে' শিখিয়ে দাও তুমি!"

যতদিন বাড়িতে ছিলাম অর্জুনকাকার সঙ্গে পড়তে হত। নিজের অক্ষমতায় লজ্জা হ'ত আমার! ওই বৃদ্ধের উৎসাহের সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারতাম না। প্রত্যহ রাত্রে এগারোটায় শুয়ে ভোর চারটের সময় ওঠবার শক্তি ছিল না আমার। কিন্তু অর্জুনকাকা না ছোড়। রোজ ডাকাডাকি করে' ঠিক তুলতেন আমাকে। দুপুরটা কেবল ছুটি পেতাম। অর্জুনকাকা সেই সময়ে আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে আশ্রয় নিতেন। খিল দিয়ে দিতেন ভিতর থেকে। আমি মনে করতাম ঘুমোন বোধ হয়। একদিন জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি পিছনে দু'হাত রেখে পরিক্রমণ করে' বেড়াচ্ছেন সারা ঘরটা। জিব চিবুচ্ছেন। ক্ষোভ দুঃখ ঘৃণা ব্যঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখে।

হাতে ছোট আয়না খানা। মাঝে মাঝে সেটা তুলে ধরছেন মুখের সামনে আর ভ্যাংচাচ্ছেন নিজেকে।

ছুটি ফুরোতে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। কোলকাতায় ফিরেই কিন্তু অর্জুনকাকার বড় বড় স্পষ্টাক্ষরে লেখা চিঠি পেলাম একখানা। "আনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি এবং মেটিরিয়া মেডিকা বিষয়ক বাংলা ভাষায় এবং সহজ-বোধ্য ইংরাজি ভাষায় লেখা যত বহি সংগ্রহ করিতে পার অবিলম্বে আমার নামে ভি. পি. যোগে পাঠাইয়া দিও।" যা পেলাম পাঠিয়ে দিলাম।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম অর্জুনকাকা সত্যিই চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করেছেন। তারও কিছুদিন পরে আমার মেসে' এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে ছ'সাত বছরের একটি ছেলে। বললেন—"এটি আমার নাতি। আমার মেয়ের ছেলে। একে একটা ভাল স্কুলে ভরতি করব বলে' এনেছি। ওখানে কিছু হবে না। তুমি একটা ভাল স্কুল বেছে দাও। শুনেছি মর্টন স্কুলে খুব কড়া শাসন, সেখানে দিলে কেমন হয়?"

"কি হবে অত কড়া শাসনে রেখে?"

"তুমি বুঝ না, কড়া শাসনই দরকার। তা না হলে এসব ছেলের কিছু হবে না।"

তারপর একটু হেসে কবি হেমচন্দ্রের সাহায্য নিয়ে বললেন "হেঁ হেঁ এসব দৈত্য নহে তেমন—"

চকিতের মধ্যে মুখের পেশীগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল জিবটাও যেন নড়ে উঠল মুখের মধ্যে একবার। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি নাম তোমার"

"চিতুয়া"

অর্জুন কাকা ধমক দিয়ে উঠলেন।

"চিত্তরঞ্জন বলতে পার না?"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—"এমন অসভ্য এরা, ভাল একটা নাম রাখলাম চিত্তরঞ্জন সে নামকে করে' ফেললে চিতুয়া। সবাই ডাকছে

চিতুয়া, চিতুয়া। চিত্তরঞ্জন শব্দ মুখ দিয়ে বাহিরই হয় না, কি করবে বেচারারা—" অর্জুন কাকার ওপরের ঠোঁটটা একটু কেঁপে থেমে গেল।

চিত্তরঞ্জনকে মিত্র ইনষ্টিট্যুশনে ভরতি করে দিলাম।

মর্টনের উপরই অর্জুন কাকার ঝোঁক বেশী ছিল, কিন্তু আমি মানা করাতে আমার কথাটা রাখলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—"টাকার কোন অভাব হবে না, এর বাবা না দেয় আমি টাকা দিব, কিন্তু পড়া-শোনার ভাল ব্যবস্থা হওয়া চাই। বিলাসিতা না করে' সেইটি দেখিও—"

আমি যতদিন কোলকাতায় ছিলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম চিতুয়া যাতে চিত্তরঞ্জন নামের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন প্রতিকূলতা করতে লাগল। চুম্বক যেমন লৌহকণা আকর্ষণ করে চিতুয়া তেমনি নানা কুসঙ্গী জোটাতে লাগল তার চারিদিকে। ক্লাশ প্রমোশন অবশ্য পেলে কিন্তু তা নিজের জোরে নয়, আমার তদ্বিরে।

…এরপর অর্জুন কাকার যে স্মৃতিটা আমার মনে পড়ছে তা আমার বিলেত যাওয়ার ঠিক আগের ঘটনা। ভাল ডাক্তার হতে হলে এখানকার ডিগ্রিই যে পর্যাপ্ত নয় এ ধারণা তখন আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। এখন যদিও ধারণাটা বদলেছে, তখন কিন্তু নামের পিছনে একটা বিলিতি ডিগ্রি লাগাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছিলাম। বাবাকে বললাম। তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু। ছেলেকে বিলেতে পাঠাবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। কিন্তু আমাকে সোজা 'না'-ও বলতে পারলেন না। ছেলে পড়তে চাইছে, অর্থাভাবে তার পড়া হবে না, ব্যাপারটা কষ্টদায়ক হয়ে উঠল তাঁর কাছে। তিনি ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় আমাদের এক আত্মীয় এসে খবর দিলেন যে একজন বড়লোক আমার বিলেত যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করতে প্রস্তুত আছেন আমি যদি বিলেত যাওয়ার পূর্বে তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করি। আমরা চিরকাল পণ-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে' এসেছি, সুতরাং এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারলাম না। এই সব নিয়ে বাড়িতে আলাপ

আলোচনা চলছে, হঠাৎ অর্জুনকাকা এসে উপস্থিত হলেন। আমি বাড়ি এসেছি খবর পেলেই তিনি আসতেন এবং ডাক্তারি নানা তথ্য আহরণ করতেন আমার কাছ থেকে। তিনি আমাদের বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও শুনলেন সব। শুনে চুপ করে' রইলেন খানিকক্ষণ। সবাই চলে গেলে আমাকে বললেন, "বিয়ে করে' বিলেত যাও না, ভালই তো। শ্বশুরের টাকা নিতে তোমার আপত্তি কেন"

"ওর মধ্যে বড়লোকের দম্ভ প্রচ্ছন্ন আছে একটা, তা আমি সহ্য করতে পারব না।"

"বাঃ—"

অর্জুনকাকা প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে বললেন, "বিলেত যেতে কত টাকা লাগে।"

"পাঁচ ছ' হাজার।"

"মোটে ? আমি দিব তোমাকে টাকা।"

"আপনি ?"

"হাঁ—ছ'হাজার টাকা পোস্টাফিসে আছে আমার। কালই বাহির ক'রে আনতে পারি। তুমিই নাও টাকাটা। তোমাদের জন্যই তো আমার সব। আমার তো কিছুই ছিল না।" চুপ করে' রইলাম।

"কাল, তাহলে টাকাটা বাহির করি ?"

"না, থাক !"

"কেন, আপত্তি করছ কেন।"

"থাক না আপনার টাকা। আপনার নাতিরা মানুষ হয়নি এখনও।"

"হবেও না। সব শালা গুণ্ডা হচ্ছে। তাছাড়া ওদের টাকার অভাব কি। ওদের আমি দিব না কিছু। তুমিই নাও, ভাল কাজে খরচ হলে তৃপ্তি হবে আমার। কি বল, বাহির করি ?" অর্জুনকাকার চোখে আগ্রহ ফুটে বেরুতে লাগল যেন।

"না, থাক।"

"কেন আমাকে পর ভাবছ ?"

একটু মুচকি হেসে আমি উঠে গেলাম। অর্জুনকাকা একা বসে রইলেন। ফিরে এসে দেখি তিনি পায়চারি শুরু করেছেন। উত্তর দিকের বারান্দাটায় ক্রমাগত চক্কোর দিচ্ছেন। পিছনে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ, চোখের দৃষ্টি দিয়ে যা বিস্ফুরিত হচ্ছে তা অবর্ণনীয়। আমাকে দেখতে পেলেন না, আমিও সরে গেলাম সেখান থেকে।

কিছুদিন পরেই একটা জাহাজের চাকরি নিয়ে আমি বিলেত চলে যাই। অর্জুনকাকার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দেখা হল' বিলেত থেকে ফেরবার পর। হঠাৎ একরাত্রে এসে হাজির। কিন্তু, সকালে উঠে দেখি অর্জুনকাকা নেই। তাঁর উনুনটি বাইরের বারান্দার নীচে ধোঁয়াচ্ছে। চাকরটা বললে, বুড়ো বাবু আমার কাছ থেকে কিছু কয়লা আর ঘুঁটে নিয়ে নিজের হাতে উনুনে আঁচ দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। এখুনি ফিরবেন। হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না, তাঁর অপেক্ষাতেই বসে রইলাম। বিলিতি ডিগ্রিও সত্ত্বেও চাকরি পাইনি, প্র্যাক্‌টিসও জমাতে পারি নি। কোটিপতি হবার আশায় কোলকাতা সহরে গিয়ে বসেছিলাম কিছুকাল। কিছু হয় নি। এখন এই মফঃস্বল শহরে এসে বসেছি। কোটিপতি হবার সম্ভাবনা না থাকলেও গ্রাসাচ্ছাদন জুটবে বলে মনে হচ্ছে। দশটার সময় একজায়গায় যেতে হবে, তার আগে হাতে কোন কাজ নেই। অর্জুনকাকার অপেক্ষায় বসে রইলাম। একটু পরেই অর্জুনকাকা শিবস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে এলেন। শুধু গা, শুধু পা। এক হাতে এক ঘটি জল, অন্য হাতে ভিজে কাপড়, গামছা।

"অর্জুনকাকা, এত ভোরে কষ্ট করে' গঙ্গা নাইতে গেলেন কেন! চাকরটাকে বললেই সে বাথরুম দেখিয়ে দিত—"

"কষ্টটা আর কি। এতেই অভ্যস্ত আমি।"

ভিজে কাপড় গামছা জানলার গরাদেতে বেঁধে শুকুতে দিলেন। তারপর এক হাতেই জলন্ত উনুনটা তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়। "বারন্দায় উনুন রাখতে তোমার আপত্তি নাই তো?"

"না। উনুন নিয়ে কি করবেন।"

"দেখ না"—বলেই জলের ঘটিটা বসিয়ে দিলেন তা'তে। তারপর উনুনের ধারে ছোট মোড়াখানা টেনে এনে তার উপরে বসে' গা হাত পা সেকতে লাগলেন।

"তুমিও সরে এসে ব'স না। সোয়েটারই পরো আর শালই গায়ে দাও, এর কাছে কিছু নয়।"

অর্জুন কাকা হাত গরম করে' করে' দুইগালে দিতে লাগলেন। দু' পা ফাঁক করে' উনুনটাকে দুই পায়ের মাঝখানে রেখে দাঁড়ালেন দু'একবার। চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল। অর্জুন কাকার সঙ্গে যে আমার কি সম্পর্ক তা স্ত্রীকে সবিস্তারে বলেছিলাম। ট্রের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝলাম সম্মানিত অতিথির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে সে।

অর্জুন কাকা সবিস্ময়ে বললেন—"এ সব কি !"

"একটু চা খান।"

"আমার কথা সব ভুলে গিয়েছ দেখছি।"

"চা তো আপনি খেতেন।"

"চা তো খাবই, ওই তো জল হচ্ছে। চা দুধ চিনি আনতে বল—আমার বাক্সে সব আছে—কিন্তু তোমার এখানে এসেছি, তোমারটাই খাব আজ। শৌখিন পেয়ালার এক আধ চুমুক খেয়ে কিছু হবে না আমার—"

"বেশ ত, বেশী করেই খান না"

"আমিই নিজের হাতে করব—নিজে খাব, তোমাকেও খাওয়াব"

"খাবার টাবার গুলো ?"

"আমি তো সকালে কিছু খাই না, তুমি জান। আগে দই চিড়া খেতাম, এখন তা-ও ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল একবার খাই, শুধু দুপুরে, তা-ও নিরামিষ"

"এত খাবার কি হবে তাহলে, আপনার জন্যে এনেছে—"

"বেশ, আমিই তোমাদের দিচ্ছি। তুমি খাও, তোমার ছেলে মেয়েদের ডাক। ছেলে পিলে কটি তোমার"

"একটিও হয়নি এখনও"

"কেন!"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন অর্জুনকাকা। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক যুক্তি অনুসারে আমি যে জন্ম-নিরোধ ব্যাপারে লিপ্ত আছি তা আর তাঁকে বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

অর্জুনকাকা চাকরটাকে বললেন, "তুমি এসব নিয়ে যাও। যাকে বলো কিছু চা চিনি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে তোমার বাবুর জন্যে একটা কাপ রেখে যাও খালি"

চাকর নিয়ে এল সব। অর্জুনকাকা চায়ের পাতা শুঁকে বললেন —"এ চা ভাল নয় তোমার। ঠকিয়েছে তোমাকে"

একটু লজ্জিত হইলাম। সত্যি কথাই বলেছেন অর্জুনকাকা। ঠকায়নি—অর্থাভাবে শস্তা দামের চা-ই ব্যবহার করি। শহরে অধিকাংশ বাড়িতেই পেয়ালারই চাকচিক্য, চা খেলো!

অর্জুনকাকার ঘটির জল ফুটে উঠল। তোরঙ্গ থেকে তিনি কুচকুচে কালো পাথরের বেশ বড় একটি গ্লাস বার করলেন। একটি পিতলের ছাকনিও। চা তৈরি করলেন, আমাকে এক কাপ দিলেন, নিজে এক গ্লাস নিলেন। চা খেতে খেতে নিজের কথা বলতে লাগলেন। মূর্খ জামাইদের সঙ্গে বনিবনাও হয় নি তাঁর। নাতিও মনের মতো হয় নি। স্ত্রী মারা গেছেন। প্র্যাকটিস করতেও আর ভাল লাগে না। দুনিয়ার কারও সঙ্গেই বনল না। বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই ঠিক করেছেন শেষকালে।

"তোমার প্র্যাকটিস হচ্ছে কেমন"

"চলে যাচ্ছে"

"হবে, তোমার ঠিক হবে। আম গাছে আমই ফলবে"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

"আচ্ছা, তুমি ব'স। আমি বাজারটা ঘুরে আসি"

অর্জুনকাকা চলে গেলেন।

আমিও রোগী দেখতে বেরুলাম।

…যখন ফিরলাম তখন বেলা বারোটা। ফিরে দেখি অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় অর্জুনকাকা বসে আছেন।

"খুব অদ্ভুত জিনিস দেখলাম একটা"

"কি"

"দেখবে? চল না, কাছেই"

"বলুন না কি"

"না দেখলে সে ঠিক বুঝবে না। পাঁচ মিনিটের পথ, চল না"

যেতেই হল। অর্জুনকাকা আমাকে নিয়ে গেলেন এক লোহার দোকানে।

"ওই দেখ!"

"কি"

বিস্ময়কর কিছু দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হচ্ছিলাম

"লোহার চাদরটা দেখছ না! হাত দিয়ে দেখ কত মোটা"

কোট প্যাণ্ট পরা ছিল, ঝুঁকতে একটু কষ্ট হল, তবু অর্জুনকাকার আগ্রহাতিশয্যে ঝুঁকে লোহার চাদরের ঘনত্ব অনুভব করলাম।

"ভাল নয়?"

"হ্যাঁ, বেশ পুরু মনে হচ্ছে"

"পুরুই দরকার"

"কি করবেন এ নিয়ে?"

উনুন। চমৎকার উনুন হবে এতে। তোমার জন্যও একটা করতে দি, কি বল"

"দিন"

উনুনের দরকার ছিল না, কিন্তু অর্জুন কাকাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলাম না। অর্জুন কাকা সোৎসাহে আরও খানিকটা লোহার চাদর, শিক, আংটা প্রভৃতি কিনে নিজেই সেগুলি কামারের ওখানে বয়ে নিয়ে গেলেন। কুলি করতে দিলেন না। কামারকে বললেন—"আর একটা উনুনও করতে হবে। বেশ, ভাল মজবুত করে' কোরো, বুঝলে"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাজারে যে সব তৈরি তোলা উনুন পাওয়া যায় সে সব বড় অমজবুত। এ দেখো কি রকম হবে"

ফিরবার পথে বললেন, "এখানে কাঠও বেশ পাওয়া যায়। কাঁঠাল কাঠের দর করে' এসেছি, একটা সিন্দুকও করিয়ে নেব ভাবছি"

তারপর দিন শুধু কাঁঠাল কাঠ নয়—ইস্ক্রুপ, কবজা, কাঁটি, লোহার পাত এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক ছুতোর মিস্ত্রিও এসে হাজির হল। অর্জুন কাকা সোৎসাহে সিন্ধুক করাতে লেগে গেলেন।

আমাকে বললেন, "সিন্দুকটা এমন ভাবে করাব যাতে আমার সব কুলিয়ে যায় ওতে। বিছানা পত্তর, খাওয়া দাওয়ার জিনিস, উনুনটা, বাসন দু'একখান', বই টই—পাঁচটা পুটুলি করে' আর কি হবে। আমার ক'টা জিনিসই বা আছে! একটু বড় করেই করাব, রাত্রে যাতে ওর উপর শুতেও পারি...কি বল"

"বেশ তো"

উঠে পড়ে লাগলেন তিনি। সকাল থেকে আরম্ভ করে' সন্ধ্যা পর্যন্ত মিস্ত্রিটার সঙ্গে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি চলত।

"ভাল করে' র‍্যাঁদা দাও না, ওর নাম কি র‍্যাঁদা দেওয়া! বার্নিশ হবে। ওকি করছ তুমি"

"একটু ভাল করে' খেটে-খুটে কর বাবা, মজুরি ছাড়া বখশিসও দেব তোমাকে। ফাঁকি দিও না"

"হাঁ, ঠিক করে মেপে নাও—থাম থাম, আমি ধরছি"

"আরে বাবা কতবার বলব তোমাকে, ভিতরে বড় বড় চারটে খোপ হবে, হাঁ চারটে—"

"হাঁ হাঁ হাঁ প্যাঁচ কোষো না এখন, দাঁড়াও দেখি—"

এই জাতীয় নানা উক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যেত। অর্জুন কাকা মেতে উঠলেন সিন্দুক নিয়ে। একেবারে শ্রান্তি ক্লান্তিহীন। জলের মতো পয়সাও খরচ হতে লাগল। পিতলের বড় বড় ভুমো ভুমো পেরেক কিনে আনলেন সিন্দুকের শোভাবৃদ্ধির জন্য। কোনে কোনে লোহার পাত দিলেন মজবুত করবার জন্য। মিলটন কাপড় কিনে

সিন্দুকের ভিতর অন্তর দিলেন। যত খরচই হোক জিনিসটা মনোমত করতে হবে। জীবনে কোন জিনিসই মনোমত হয় নি; এটাকে নিখুঁত করতেই হবে—আমার মনে হল এই ধরণের একটা জেদ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। অন্তত একটা কাজেও তিনি যে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন এই সান্ত্বনাটুকুকে আঁকড়ে তিনি তীর্থবাস করতে চান। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত আগ্রহ যেন সিন্দুকটার উপর প্রয়োগ করছেন তাই।

সিন্দুকটা হলও চমৎকার। যেমন প্রশস্ত, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর দেখতে।

অর্জুনকাকা বললেন—"এর উপর উঠে লাফাও তুমি"

"কেন!"

"দেখ, কত মজবুত"

"মজবুত হয়েছে বই কি"

"আহা, উঠে দাঁড়াও না তুমি"

অনিচ্ছা সহকারেও সিন্দুকটার উপর উঠে দাঁড়াতে হল।

"পা ঠুক"

পা ঠুকলাম দু'-একবার।

"খুব মজবুত হয়েছে"

অর্জুনকাকার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

উম্নুন এসে গেল। অর্জুনকাকা তোরঙ্গটাও আমাকে উপহার দিলেন। তোরঙ্গের জিনিসপত্র সিন্দুকে পুরলেন। আরও নানারকম জিনিস কিনে ভরতে লাগলেন সিন্দুকে। গোটা দুই তালা কিনলেন ভাল দেখে।

...ক্রমশঃ যাবার দিন ঘনিয়ে এল। অর্জুনকাকা প্রথমে যাবেন প্রয়াগ, মাঘ মাসটা সেখানে কাটাবেন, তারপর থাকবেন কাশীতে এসে।

অর্জুনকাকাকে তুলে দিতে স্টেশনে গেলাম। একটা কুলি সিন্দুকটা তুলতে পারলে না। দু'জন লাগল।

ট্রেন এল। কুলি দু'জন প্রাণপণে চেষ্টা করলে সিন্দুকটাকে

গাড়িতে তুলতে, কিন্তু কিছুতেই পারলে না। সিন্দুকটা এত বেশী বড় হয়েছিল যে ট্রেণের দরজা দিয়ে কিছুতেই ঢুকলনা। স্যুটকেস নিয়ে কত লোক উঠল নাবল কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুন কাকা উঠতে পারলেন না। ট্রেণ ছেড়ে গেল।

...অর্জুন কাকার দিকে চেয়ে দেখলাম—তাঁর সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, ঘনঘন জিব চিবুচ্ছেন তিনি।

নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহেবের নাম এন, এ, ফারমুর। নীলগঞ্জের নীল কুঠিয়াল সাহেবদের বর্ত্তমান বংশধর। আমি বাল্যকাল হইতেই সাহেবকে চিনি। যখন স্কুলে পড়ি, সাহেবদের কুঠীতে একবার বেড়াইতে যাই। ফারমুর সাহেবকে এদেশের লোক ফালমন্ সাহেব বলিয়া ডাকে। আমার বাল্যকালে ফালমন্ সাহেবের বয়স ছিল কত? পঞ্চাশ হইবে মনে হয়। সাহেবদের কুঠীতে যাইয়া দেখিতাম সাহেব দুধ দোয়াইতেছেন। অনেক গুলি বড় বড় গাই ছিল কুঠীতে, বিশ ত্রিশ সের দুধ হইত। নৌকা করিয়া প্রতিদিন ওই দুধ মহকুমার সহরে প্রেরিত হইত। আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। আমাকে দেখিয়া বলিতেন—সকাল-বেলাতেই এসে জুটলে? খাবা কিছু?

—খাবো।

—কি খাবা? দুধ?

—যা দেবেন।

—ও মতি, ছেলেটাকে গুড় দিয়ে মুড়ি দাও আর দু' উড়কি দুধ দাও।

আমি এই মাত্তর খেয়ে আলাম—

বোসো খোকা বোসো।

নীলকুঠীর আমলে ফালমন্ সাহেবের বাবা লালমন্ (লালমুর) সাহেবের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এদেশে। নীল চাষ উঠিয়া যাইবার পরে বিস্তৃত জমিদারীর মালিক হইয়া এ দেশেই তিনি বসবাস করিতে থাকেন। ক্রমে জমিদারিও চলিয়া যায় অনেক, লালমন্ সাহেবও মারা যান। ফালমন্ বিস্তৃত আউশ ও আমন ধানের জমি চাষ করিতে থাকেন, বড় বড় গরু পুষিতেন, সেই সঙ্গে হাঁস, মুরগী, ছাগল ও ভেড়া। যাইতে দেখা গেল। দৃষ্টিপথ সুগমতর করার অভিপ্রায়ে ফালমন্ সাহেব

কুঠীতে সারি সারি ধানের গোলা ছিল বিশ ত্রিশটা। জমিদারীও ছিল, কুঠীর পূবদিকের বড় হলদে ঘরে (যার সামনে বেগুনি প্যাটেন ফুলের প্রকাণ্ড গাছ, কি ফুল জানি না, আমরা বলতাম 'প্যাটেন' ফুল) কুঠিয়াল সাহেবদের নায়েব ষড়ানন্ বক্সি কাছারি করিতেন, এবং প্রজাপত্র ঠেঙ্গাইতেন। লালমন্ সাহেব কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছিলেন বলিতে পারিব না, তবে তাঁহার বৈঠকখানায় একখানা বড় ছবির তলায় লেখা ছিল "T. Larmar of Bournemouth, England." লালমনের জন্ম নীলগঞ্জেই। তাঁহাদের সকলেই যশোর জেলার পাড়াগায়ের কৃষকশ্রেণীর ভাষায় কথা বলিতেন।

—কি পড়ো ?

—মাইনর সেকেন্ ক্লাসে।

—ইউ, পি পাশ করেচ ?

—হ্যাঁ।

—বিত্তি পেয়েছিলে ?

—না।

—আমার ইস্কুলে পড়ো ?

—আপনার ইস্কুলে না। জেলাবোর্ডের স্কুলে, চেতলমারির হাটতলায়।

—ও বুঝিচি। তবে তোমার বাড়ী এখানে না ?

—আজ্ঞে না। আমার পিসির বাড়ী এখানে।

—কেডা তোমার পিসে ?

—৺ভূষণচন্দ্র মজুমদার।

—আরে মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী এসেচ তুমি ? বেশ বেশ, নাম কি ?

—শ্রীরতনলাল চক্রবর্ত্তী।

—পিতার নাম ?

—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

—তুমি মাখনলাল মাষ্টারের ছেলে ? চেতলমারীর ইস্কুলির ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাই বলো। মাখম মাষ্টার তো আমাদের বন্ধু লোক। বেশ, বসো দুধ দিয়ে মুড়ির ফলার ক'রে খাও।

ফালমান্ সাহেবের সঙ্গে এই ভাবেই আলাপ সুরু। তা'বাদে মাঝে মাঝে সাহেবকে চিতলমারির খড়ের মাঠে আমীনকে সঙ্গে লইয়া জমি মাপিতে দেখিয়াছি। কতদিন নৌকায় লোকের সাহায্যে পটল কুমড়ো বোঝাই করিতে দেখিয়াছি। লম্বা, একহারা, সাহেবী চেহারা। ভুঁড়ি একদম নাই, গায়ে এক আউন্স চর্ব্বি নাই কোথাও। গোপ জোড়াটা বড্ড বম্বা, নীল চোখ, দৃঢ় চোয়াল সবই ঠিক সাহেবী ধরণের। কিন্তু পোষাকটা সব সময় সাহেবের মত নয়, কখনো ধুতি, কখনো কোটপ্যান্টের উপর মাথায় তালপাতার টোকা। শেষোক্ত বেশটা দেখা যাইত যখন ফালমন্ সাহেব মাঠের চাষবাসের তদারক করিতেন। কৃষাণ ছিল সংখ্যায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, লাঙ্গল গরু চল্লিশখানা, আট দশখানা গরুর গাড়ী। অত বড় ফলাও চাষ সাধারণ কোনো বাঙালী গৃহস্থ চাষী কল্পনাও করিতে পারে না। তালপাতার টোকা মাথায় কৃষকদের কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করিতেন বটে, কিন্তু হুকোয় তামাক খাইতে কখনো দেখি নাই—পাইপ সর্ব্বদা মুখে লাগিয়াই থাকিত। কৃষাণদের বলিতেন,—বাবলাতলার জমিগুলোন্‌তে দোয়ার (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার চাষ) দেবা কবে ও সোনাই মণ্ডল? তা গ্যাও। আর দেরি করবা না। রস টেনে গেলি ঘাস বেধে যাবে আনে। তখন লাঙ্গল বেশী লাগবে। এখনো ভুঁইতে রস আছে। সোনাই মণ্ডল হয়তো বলিল—বাবলাতলার ভুইতে পানি আর কনে, সায়েব? কে বল্লে আপনারে?

—নেই? কাল সাঁজের বেলা আমি আর প্যাট্ (সাহেবের শালা, এখানেই বরাবর থকিত দেখিতাম, চাষবাসের কাজ দেখে) যাইনি বুঝি? ঝা পানি আছে তাতে কাজ চলে যাবে আনে।

—ছোলা কাটতি হবে এবার।

—এখনো দানা পুরুষ্টু হইনি, আর চার পাঁচটে রোদ খাক্। সময় হলি ব-অ-ল-বো—

এই সময় নদীপপুরের গোপেশ্বর বৈরাগীকে মাঠের পাশের পথ দিয়া

মাথার টোকাটা কপালের উপর হাতে দুই আঙুল দিয়া একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিলেন—ও গোপেশ্বর—শোনো—গোপেশ্বর—

গোপেশ্বর আসিয়া বলিল—সেলাম সায়েব—

সাহেবের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ এ অঞ্চলে, কারণ অধিকাংশই তাহার প্রজা।

—যাচ্ছ কনে?

—যাবো একবার পানচিতে। মেয়ের খবর পাইনি অনেক দিন। জামাইডা কেমন আছে দেখে আসি, পেট জোড়া পিলে তার। গত অঘ্রান মাসে যায় যায় হইছিল—

—ম্যালেরিয়া?

—তা আমরা কি বুঝি? তাই হবে।

—বেশ। একটা কৃষ্ট বিষয় গান করে শুনিয়ে যাও দিকি?

—কৃষ্ট বিষয়?

—কিংবা শ্যামা বিষয়। না, তুমি বোষ্টম টুম টুম আবার বুঝি শ্যামা বিষয় গাইবা না। ঝা মন চায় একখানা শোনাও। বড্ড রোদ পড়চে, শরীলির কষ্ট হয়েচে বড্ড। বোসো, এই পিটুলিতলায় ছাওয়া পানে।

গোপেশ্বর গান গাহিতে বসিয়া দুবার কাশিল, সাহেবের দিকে লাজুক দৃষ্টিতে দু' একবার চাহিয়া পরে গান আরম্ভ করিল—

কোনটি তোমার আসল রূপ শুধাই তোমারে—

ফারমন্ সাহেব হাতে তালি দিতে দিতে বলিলেন—বাঃ বাঃ—বেশ গলা—দাশুরায় না নীলকণ্ঠ?

—নীলকণ্ঠ।

—দাশুরায় একখানা হোক না?

সাহেবের আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই এ অঞ্চলে, সুতরাং গোপেশ্বরকে আর একখানা গান গাহিতেই হইল।

ভয়ে আকুল বসুদেব
দেখে আকুল যমুনা।
কূলে বসে দুনয়নে বারি ঝরে
কোলে অকূলের কাণ্ডারী তাও জানে না।

একবার ভাব যদি ধর্ত্তমান কংসের পদে
দৈবে দয়া যদি হোত পাষাণ হৃদে—
তা হয়না আর
গেল একূল ওকূল দুকূল
অকূল পারে গোকুল
কুলের তিলক রাখতে কূল পেলেম না।
ভয়ে আকুল বসুদেব
দেখে অকূল যমুনা—

ফালমন্ সাহেব চক্ষু মুদিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গান শুনিতেছিলেন। আবার বলিলেন গেপেশ্বরের পিঠ চাপড়াইয়া—বলিলেন—বাঃ বাঃ—দাশুরায়ের গানের কাছে আর সব কিছু লাগে না। কি রগম—কি ওরে বলে গোপেশ্বর ?

—অনুপ্রাস ?

—ওই যা বল্লে। ভারি চমৎকার, লাগতিই হবে যে। দাশুরায় হুঁ :—

—আজ্ঞ উঠি সাহেব।

—আচ্ছা এসো

ফালমন্ সাহেবের কাছারি ঘরে রাম শ্যামকে মারিয়াছে, শ্যামের গরু যদুর পটলের ক্ষেত নষ্ট করিয়াছে—এই সব গ্রাম্য মামলার বিচার হতো। বিচার সাধারণতঃ করিত নায়েব ষড়ানন্ বকসি, তবে গুরুতর মোকর্দমায় ফালমন্ সাহেব নিজে বিচারাসনে বসিতেন।

আমি দেখিয়াছিলাম যে দিন গুড়ে জেলের ভাই বৌ রেমো ধোপার ছেলে অতুলের সঙ্গে সোজা চম্পট দেওয়ার পরে আড়ংঘাটা ষ্টেশনে ধরা পড়িয়া পুনরায় গ্রামে আনীত হইল, সেদিন ফালমন্ সাহেবের বিচার। গ্রামে হৈ চৈ কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ দু'দশ বছরে এধরনের ব্যাপার কেহ এ অঞ্চলে দেখে নাই, শোনেও নাই।

ফালমন্ সাহেব অতুলকে কড়া সুরে প্রশ্ন করিলেন—জেলে বৌয়ের বয়সটা কত ?

অতুল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—তা জানিনে সাহেব।

—তোমার চেয়ে বড় না ছোট ?

—আমার চেয়ে বড়।

—তোমার বয়েস কত ?

—আজ্ঞে, এই তেইশ।

রেমো ধোপার দিকে চাহিয়া সাহেব বলিলেন—এই রেমো, বয়েস ঠিক বলচে তো ?

রেমো বলিল—হাঁ, সাহেব।

—আর জেলে বৌয়ের বয়েস কত ?

গুড়ে জেলে বলিল—আজ্ঞে, বত্রিশ।

—বত্রিশ ?

—আজ্ঞে।

সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে অতুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোর বড় দিদির বয়সী যে-রে হারামজাদা—তোর লঘু-গুরু জ্ঞান নেই? মারো দশ জুতো সকলের সামনে—আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, যাও—

ব্যস্ বিচার শেষ।

আর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ বা ওকালতি খাটিবে না।

The great Khan has spoken—মিটিয়া গেল।

সেকালের নীলকুঠীর অটোক্র্যাট্ ভূম্যাধিকারীর রক্ত ছিল ফার্লমন্ সাহেবের গায়ে, প্রজাপীড়ন ও শোষণে তিনি তেমনি পটু, তবে যুগ প্রভাবে নখ-দন্ত অপেক্ষাকৃত ভোঁতা—এইমাত্র।

সেবা'র মস্ত বড় দাঙ্গা বাধিল বাগদী ও জেলে প্রজাদের মাৎলার বিলের দখল লইয়া। মাৎলার বিল বরাবর বাগদী প্রজাদের কাছে বন্দোবস্ত করা ছিল রানী রাসমণি এষ্টেটের স্বরূপনগর কাছারী থেকে। কখনো এক পয়সা খাজনা আদায় হইত না। মামলা মোকর্দ্দমা করেও কিছু হয় না—তখন রানী এষ্টেটের নায়েব ভৈরব চক্রবর্ত্তী মাৎলার বিল দশ বৎসরের জন্ম ইজারা দিলেন ফার্লমন্ সাহেবকে। সেলামি এক পয়সাও নয়, কেবল শালিয়ানা আড়াইশো টাকা খাজনা। কারণ দুর্দ্ধর্ষ জেলে ও বাগদী প্রজাদের কাছ থেকে বিলের দখল পাওয়াই ছিল সমস্তা—সাহেবের দ্বারা

সে সমস্যা পূরণ হইবে, ভৈরব চক্রবর্ত্তীর এ আশা ছিল এবং সে আশা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নয় বিল ইজারা দেওয়ার এক পক্ষ কালের মধ্যেই পদ্মফোটা মাৎলা বিলের রক্ত রঞ্জিত জল তার প্রমাণ দিল। প্রকাশ ফালমন্ সাহেব স্বয়ং টোকা মাথায় দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া দাঙ্গা পরিচালনা করিয়াছিলেন। যদিও পুলিশ রিপোর্টে পরে প্রকাশ হোল দাঙ্গার সময় ফালমন্ সাহেব তাঁর বড় মেয়ে মার্জ্জারির টন্‌সিল অস্ত্র করিবার জন্তে তাহাকে লইয়া কৃষ্ণনগর মিশন হাসপাতালে যান।

মামলাবাজ ওধরণের আর একটি লোক সারা জেলা খুঁজিলে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

প্রায়ই মহকুমায় মামলা থাকিত।

সাহেবের চারদাঁড়ের ডিঙি সাতটার সময় ছাড়িত কুঠিঘাট থেকে। ছইয়ের মধ্যে ফালমন্ সাহেব ও তাঁর খাওয়ার জন্তে ফলের ঝুড়ি, জলের কুঁজো, দুধের বোতল, নায়েব ষড়ানন্ বাবু ও তাঁর বিছানাপত্র, দুজন মাঝি (তার মধ্যে একজনের নাম গোপাল পাইক, জাতে বাগ্দী, খুব ভাল গান গাহিতে পারে) এই লইয়া তীরবেগে নৌকা ছুটিত দশ মাইল দূরবর্ত্তী মহকুমার সহরের দিকে। হু হু করিয়া মুখোড় বাতাস বহিত। গাঙে সাহেবের প্রিয় অনুচর গোপাল পাইক প্রভুর ইঙ্গিতে নৌকার গলুইয়ের কাছ থেকে ছইয়ের কাছে সরিয়া আসিত। সাহেব বলিতেন—একটা কৃষ্ণ বিষয় কিম্বা শ্যামা বিষয় গাও গোপাল—

গোপাল অমনি ধরিত—

নীল বরণী নবীনা রমণী নাগিণী জড়িত জটা সুশোভিনী নীল নয়নী জিনি ত্রিনয়নী কিবা শোভে নিশানাথ নিভাননী—

তারপর গাহিত :—

কি কর কি কর শ্যাম নটবর, ছাড় যাই নিজ কাজে—

গোপাল পাইক যাত্রাদলে অল্প বয়সে গাহিত, সাহেবের সঙ্গীত-প্রিয়তার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ পুরস্কার আশায় একদিন সে নীলগঞ্জের কুঠিতে গাহিতে আসে—গান শুনিয়া সাহেবের বড় ভাল লাগিল এবং সেই হইতে গোপাল সাহেবের এষ্টেটের চাকুরীতে বহাল হইয়া গেল।

এক পয়সা খাজনা বাকি থাকিলেও যেমন সাহেবের এষ্টেট হইতে নালিশ হইত, আবার ধরিয়া পড়িলে ক্ষমা করিতেও ফালমন সাহেব ছিলেন বিশেষ পটু। কতবার এরকম হইয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি প্রজা ভবিষ্যত না ভাবিয়া কিংবা উকিল মোক্তারদের উৎসাহে নীলগঞ্জ এষ্টেটের বিরুদ্ধে মামলা লড়িয়াছে। একবার ফৌজদারী, তারপর স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী দেওয়ানী, মহকুমা হইতে সব্‌জজ-কোর্ট, সেখান হইতে আবার পুনর্বিচারের জন্য মহকুমার মুন্সেফকোর্ট—এই করিতে করিতে প্রজা এষ্টেটকে হয়রান করিয়া এবং নিজেও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিল, তখন হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শে কোর্টের বটতলাতেই একেবারে ফালমান সাহেবের পা জড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল পায়ে।

—আরে কি কি কি?

—আজ্ঞে আমি মুকুন্দ বিশ্বেস।

সাহেব পায়ের ঝটকা মারিয়া বলিলেন—বেরো হারামজাদা—বেরো—বেরো—

ফালমন্ হিন্দী কথাই জানিতেন না, খাঁটি বাংলা ইডিয়মযুক্ত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সে শুধু এইজন্য যে নীলগঞ্জের কুঠীই তাঁহার জন্মস্থান, এই গ্রাম্য আম জামনিকুঞ্জ ছায়ার শ্যামলতায় ও কৃষকদের সাহচর্যে তিনি আবাল্য লালিত, পালিত, ও বর্দ্ধিত, ডরসেট সায়ারের ইংরাজরক্ত ধমনীতে থাকিলেও মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালী, উনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চিন্ত শান্তি ও আলস্যের মধ্যে যাঁহার যৌবন কাটিয়াছে, সেই স্বচ্ছল বাঙালী জমিদার। মুকুন্দ বিশ্বাস ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাপার দেখিতে লোক ছুটিয়া ভিড় বাধাইল। সকলেই ভাবিল সাহেব কি অত্যাচারী! গরীব প্রজাকে কি করিয়া পীড়ন করিতেছে ছাখো। একেবারে এইভাবেই সর্ব্বস্বান্ত করিতে হয় ছিঃ—

কেহ বুঝিল না কিরূপ তেঁদড় ও ঢুঁদে প্রজা মুকুন্দ কলু।

—কি চাই? কি?

—সাহেব মা বাপ--ধরম—বাপ—মোরে বাঁচাও ধরম বাপ—

—কেমন? মোকদ্দমা করবিনে? কর ছানি—শোন-চোন ও হরিশবাবু শোনেন-ই দিকে।

চোগা চাপকান্ পরণে বড় উকিল হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলী ঘটনাস্থলের কিছুদূর দিয়া যাইতেছিলেন। সাহেবের আহ্বানে নিকটে আসিতে আসিতে বলিলেন—গুড্ মর্ণিং মিঃ ফারমুর, বলি ব্যাপার কি?

—আরে দ্যাখেন না কাণ্ডখানা। চেনেন না মুকুন্দ বিশ্বাসকে? পাচপোতার মুকুন্দ বিশ্বাস। বদমায়েসের নাজির, ওর বদমায়েসী দেখতে দেখতে মাথার চুল আমি পাকিয়ে ফ্যাললাম হরিশ বাবু, ওরে আর আমি চিনিনে? শুনুন তবে—আরে নায়েব মশায়, বলুন দিকি সব খুলে—

সব শুনিয়া হরিশ বাবু মুকুন্দ কলুকে ধমক দিয়া কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিলেন। সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা! তাহার মত ট্যানাপরা লোকের লোকের পক্ষে? যাক্, যাহা হইবার হইয়াছে, সাহেব, নিজগুণে এবারটি গরীবকে মাপ করিয়া দিন।

সাহেবকে হরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ বুঝি ডিক্রির দিন?

—নিশ্চয়। ও এতদিন আমার সঙ্গে একটা কথা কইতো না। আজ একেবারে পায়ে ধরেছে।

ষড়ানন বক্সি বলিল—শুধু পায় ধরা নয় একেবারে মড়াকান্না কেঁদে লোক জড়ো করে ফেলেছে—

সাহেব জনতার উদ্দেশ্যে বলিলেন—এই, যাও সব এখান থেকে। এখানে কি? চলে যাও সব—

হরিশ বাবু উকিলও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, তোমরা কেন এখানে বাপু? কাছারির সামনে ভিড় কোরো না—হাকিম চটবেন—যাও এখন—এখানে কি ঠাকুর উঠেছে?

হিসাব করিয়া ষড়ানন বক্সি সাহেবকে জানাইল এই মামলায় এ পর্যন্ত সাতশো, সাড়ে সাতশো টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। সাহেব বলিলেন—আচ্ছা যা, মাপ করলাম। নায়েব বাবু মামলা মিটিয়ে নেবেন।

ষড়ানন বক্সি বলিল—খরচার টাকা?

—ওর সঙ্গে না হয় ষড় করে নেবেন। তবে বলে দিন আমার

কুঠীতে গিয়ে নাকে খত দিতে হবে ওকে। নইলি আমি ওকে ছাড়বো না। ও নাকে খত দিতে রাজি কিনা?

মুকুন্দ বিশ্বাস খুব রাজি। সে এখনি নাকে খত দিতে প্রস্তুত আছে। সাহেবের আশ্বাস পাইয়া সে চলিয়া গেল।

সেবার শীতকালের মাঝামাঝি মিসেস্ ফালমন লিভারের অসুখে ভুগিয়া কলিকাতার হাসপাতালে মারা গেলেন। দিন সাতেক পরে নীলগঞ্জের চারিপাশের পাঁচ ছয় খানি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদিগের তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইল—মেম সাহেবের আত্মার মঙ্গল কামনায় যদি ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হয়, তাঁহারা খাইবেন কিনা। তখনকার দিনে এসব ধরণের খাওয়ায় সামাজিক কড়াকড়ি অনেক বেশী ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের রাজি না হইয়া এক্ষেত্রে উপায় ছিল না। সাহেবকে চটাইতে কেহই রাজি নয়।

নীলগঞ্জের কাছারি ঘরের সামনে তূঁত তলায় দু'দিন ধরিয়া কালী ময়রা সন্দেশ, বঁদে, পানতুয়া ভিয়ান করিল। কাছারি বাড়ীর হলে ব্রাহ্মণ ভোজনের যে বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছিল, এ অঞ্চলে সে রকম খাওয়ানো কখনো কেহ দেখে নাই।

ফালমন্ সাহেব কুঠীর গেটে নিজে দাঁড়াইয়া প্রত্যেককে বলিতেছিলেন—পেট আপনাদের ভরেছে? কষ্ট দেলাম আপনাদের এনে। কিছু মনে করবেন না—

আমিও সে দলে ছিলাম, তখন স্কুলের বালক, ভুরিভোজন করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলাম। দীর্ঘাকৃতি ফালমন্ সাহেবের সে বিনীত মুখভাব, সৌজন্যপূর্ণ সহৃদয় দৃষ্টি এখনো মনে আছে। মানবতার উদার গতিপথের পার্শ্বে অবস্থিত এই ছবিখানি আজকার এই হিংসা দ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের দ্বন্দ্বের দিনে বেশি করিয়া স্মরণে উদিত হয়।

বারোয়ারি যাত্রার আসরে ফালমন্ সাহেব সকলের সামনে চেয়ার পেতে বসতেন। যাত্রা গানের অমন ভক্ত দুটী দেখা যাইত না।

—ও বেয়ালাদার, একটা একা'লে গৎ ধরো বাবা—জুড়িদের এগিয়ে দাও—

সাহেবের ফাইফরমাজ খাটিতে খাটিতে যাত্রাদলের গাইয়ে বাজিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

আর কৃষ্ণ সাজিয়া আসিয়া গান ধরিলেই হইল, অমনি মেডেল ঘোষণা।

সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিবেনই—এই যে ছোঁড়াডা কৃষ্ট সেজে এসে গানখানা করে গেল, ওরে আমি একটা রূপোর মেডেল দেবা—কথা শেষ করিয়াই চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসিমুখে চাহিয়া বলিতেন—হাততালি—হাততালি—

অমনি চট্‌পট্ করিয়া চতুর্দ্দিকে হাততালি পড়িবে। নিজে সকলের আগে হাততালি দিবেন।

কোন করুণ ভক্তি রসের ব্যাপার ঘটিলে সাহেব সকলের সঙ্গে 'হরিবোল' দিয়া উঠিবেন। বারোয়ারিতে চাঁদা নিতে সাহেব যেমন মুক্তহস্ত, তেমনি রক্ষাকালীপূজা বা শীতলা পূজার অনুষ্ঠানে। তখনকার দিনে বারোয়ারি দুর্গাপূজা বা শ্যামাপূজার রেওয়াজ ছিল না।

মিসেস্ ফালমন্ মারা যাওয়ার পরে নীলগঞ্জের কুঠীর রাঙা 'প্যাটেন' ফুলের গাছ, নদীর ধারের অত বড় বাড়ী, লেবু ও আমের বাগান, পসার প্রতিপত্তি, অর্থসম্পত্তি সব কিছু শ্রীহীন হইয়া পড়িল। বাড়ীর এক নিম্নজাতীয়া দাসীর সঙ্গে সাহেবের নাম জড়িত হইয়া চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল। মার্জ্জারি ও ডোরা বিবাহ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সাহেবের যে ছেলে বিলাতে পড়িত, সে আর এদেশে আসিলই না। শোনা গেল ইংলণ্ডেই বিবাহ করিয়া সেখানেই সংসার পাতাইয়া সে ইংলণ্ডের প্রজাবৃদ্ধির দিকে মন দিয়াছে।

এই সময় নীলগঞ্জের কুঠীতে এক ঘটনা ঘটিল।

বাহির হইতে কে একজন সাহেব আসিয়া কিছুদিন কুঠীতে রহিল এ সময়ে প্যাটও কুঠী হইতে চলিয়া গিয়াছিল। নবাগত সাহেবের নাম মিঃ মুডি। এ অঞ্চলে তাহাকে "মুদি সাহেব" বলিত সবাই। মুদি সাহেব একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খাইত।

একদিন কি ঘটিয়াছিল কেহ জানে না, গভীর রাত্রে মিঃ ফালমনের সঙ্গে মুদি সাহেবের বচসার শব্দ শোনা গেল। বাহির হইতে চাকরে

বাকরে কিছু বুঝিল না। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখে মুদি সাহেবের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ ঘরের মেজেতে লুটাইতেছে এবং ঘরের কোণে সেই নীচ জাতীয়া দাসীটা দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

পুলিশ তদন্ত হইল। মিঃ ফাল্‌মনের কিছু হয় নাই, ব্যাপার নীলকুঠীর শক্ত কম্পাউণ্ডের বাহিরে এক পাও গড়ায় নাই।

এই ঘটনার পরেও ফালমন্‌ সাহেব অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। একাই থাকিতেন। পুত্র কন্যা কখনো আসিতও না। সাহেবের এক ভাই শোনা যায় ইংলণ্ড হইতে কতবার তাহাকে সেখানে যাইতে লিখিয়াছিল, ফালমন্‌ সাহেব বলিতেন—এদেশেই জন্ম, এদেশ ভালবাসি। যাবো কোথায়? যখন মরে যাবো ওই নিমতলাডায় কবর দিও, বাবা আর মায়ের পাশে। এদেশেই জন্ম, এদেশেই মাটি মুড়ি দেবো।

ফালমন্‌ সাহেব এদেশেই মাটি মুড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে। নীলগঞ্জের কুঠী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। এখন সেখানে দিনমানেও বাঘ বুনো শূয়োরের ভয়ে কেউ যায় না। কুঠীর নিমতলায় ঘন বুঁচকাঁটায় দুর্ভেদ্য ঝোপের ছায়ায় খুঁজিলে ফালমন্‌ সাহেবের কবরের ভগ্নাবশেষ এখনো কৌতূহলী রাখাল বালকদের চোখে পড়ে। আলমপুর পরগণার বড় তরফের দে চৌধুরী জমিদার বাবুরা নীলগঞ্জের জমিদারি গবর্ণমেণ্টের নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন।

কুইট্ ইণ্ডিয়া

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ওটি আর'এর একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ি আসিতেছে গোরক্ষপুরের দিক থেকে। ভিড় যথেষ্ট আছে, তবে প্রথম শ্রেণীর কামরাটা একেবারে খালি, মাত্র আমি আছি আর একটি ইংরাজ যুবতী; ইংরাজ বলিয়াই যুবতী বলিলাম, বয়স প্রায় সাতাশ আটাশ হইবে। গোটা-দুই ষ্টেশন একত্রে আসার পর তিনি একটু গল্প-প্রবণ হইয়া উঠিলেন।

অনেকগুলি কারণ ছিল; প্রথমতঃ অন্য সঙ্গীর অভাব, দ্বিতীয়তঃ আমি সামরিক পোষাক পরিহিত, সুতরাং অতটা অপাঙ্‌ক্তেয় নই, তৃতীয়তঃ, যাহা কথাবার্তায় টের পাইলাম, তিনি সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছেন, এদেশটা সম্বন্ধে কৌতুহলও টাটকা আর এখনও কৃষ্ণবিদ্বেষটা উগ্র হইতে পায় নাই। নাম বলিলেন মিস ফ্লোরা গ্রেস। ছাপরার কাছাকাছি একটা জায়গায় কে একজন মিষ্টার ট্রেভার কিছু জমিদারী এবং কৃষিসম্পত্তি লইয়া আছেন, তাঁহারই সাক্ষাৎকারে যাইতেছেন। মিস্ গ্রেস্ নিজে মাসকয়েক হইল দেরাদুনের নিকটবর্তী কোন একটি জায়গায় একটি ইংরাজ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা লইয়া আসিয়াছেন। মিষ্টার ট্রেভার সম্প্রতি সেখানে শৈলবিহারে গিয়াছিলেন, আলাপ হয়, নিমন্ত্রণ রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

অর্থাৎ কোর্টশিপ চলিতেছে। আন্দাজের কথাটা আমিই বলিলাম, তবে অত স্পষ্ট করিয়া নয়, একটু হাসিয়া বলিলাম—"মিষ্টার ট্রেভারের সৌভাগ্যে তাঁকে অভিনন্দিত করছি যে, এই নিদারুণ গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য করে আপনি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন।"

মিস্ গ্রেসের হাসিতে একটু লজ্জা জড়াইয়া পড়িল, বলিলেন—"কিন্তু আমি তাঁর সৌভাগ্যকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পাচ্ছি না মিষ্টার মুখার্জি —যদি সৌভাগ্যই হয় সেটা—উঃ, কী অসহ্য গরম—নরক একেবারে!"

সত্যই অসহ্য গরম। জুন মাস, তায় সময়টাও দুপুরের কাছাকাছি। পাখা চলিতেছে—কে যেন অদৃশ্য আগুন লইয়া দেয়ালীর আঁজি বাজি খেলিতেছে। বলিলাম—"কিন্তু মিষ্টার টেভারেরই তো এই সময় শৈল-নিবাসে থাকা উচিত ছিল, তা না করে আপনাকে সুদ্ধ এই অগ্নি পরীক্ষায় টানলেন যে?"

মিস গ্রেসের মুখটা গম্ভীর হইয়া গেল, জানালার দিকে ফিরাইয়া লইয়া নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম, কি বেফাঁস হইয়া গেছে নাকি? অথচ আসল যেখানে ঠাট্টা করিলাম সেখানে তো বিরক্তির কোন লক্ষণই দেখা গেল না, বরং ইঁহারা বেশ সময়মত ঠাট্টাগুলা যেমন প্রীতিভরেই গ্রহণ করেন, সেইভাবেই করিলেন গ্রহণ। কিছু বলিয়া সামলাইতে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় মিস গ্রেস্ মুখটা আবার ফিরাইয়া আনিলেন। রাগ নয়—কপট রোষের অভিনয় করিয়া বলিলেন—"শুনুন মিষ্টার মুখার্জি, সত্যি কথাটা যদি বলতেই হয়, এর জন্যে দায়ী আপনারাই।"

একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কি করে তা জানতে পারি কি?"

"সব দিক দিয়েই, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারাবন। আমরা আপনাদের যা শান্তি আর স্বচ্ছন্দতা দিয়েছি, তার বদলে আপনারা আমাদের শান্তি হরণ করতে বসেছেন। বেশি দিনের কথা নয় যে আপনাদের স্মৃতিপথ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে,—এই কিঞ্চিদধিক শ' দেড়েক বৎসর—একবার ভেবে দেখুন কি অবস্থা ছিল এই দেশের—যুদ্ধ বিগ্রহে দেশ ছিন্ন ভিন্ন, প্রতিটি রাজদরবার চক্রান্তের কেন্দ্র, রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে, যা বা আছে দিনে ব্যবহারের জন্যও নিরাপদ নয়, যানবাহন সেই আদম ঈভের সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—আপনারা যে জগতের সর্ব পুরাতন জাতিদের অন্যতম একথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু যে-অবস্থায় আপনারা ছিলেন, তখন তাতে আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিদের চেয়ে খুব বেশি প্রভেদ ছিল না। এর জায়গায় আমরা কি দিয়েছি একবার ভেবে দেখুন মিষ্টার মুখার্জি—শক্তিমান কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে প্রথমতঃ দরবারে দরবারে চক্রান্ত আর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ

বিগ্রহের নিরসন করেছি। রাস্তাঘাট এখন সুগম এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ, যানবাহনে আপনারা বোধ হয় পৃথিবীর সভ্যতম জাতির সমকক্ষ—সভ্যতা আর কৃষ্টির দিক দিয়েও দেখুন আমাদের প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট আপনাদের কবি, বৈজ্ঞানিক জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত অর্জন করে নিয়ে এসে আপনাদের দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। অনধিক দেড় শতাব্দীর ব্যবধানের ভারতবর্ষের এই দুটি রূপ, অথচ আজ আপনারা এইভাবে তোয়ের হয়ে নিয়ে আমাদেরই বলছেন—'কুইট ইণ্ডিয়া' ! আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করবেন মিষ্টার মুখার্জ্জী, কিন্তু আমি একটা কথা জিগ্যেস করি—অকৃতজ্ঞতা কি এর চেয়ে বেশী দূরে যেতে পারে ?"

দেখিলাম সংযমের জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও মিস গ্রেস উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। বেশ একটু ফাঁপরে পড়িলাম—স্ত্রীলোক, তায় গাড়ীর মধ্যে নিঃসঙ্গ, ওঁর বাঁধা গতের মত তর্কগুলার উত্তর দিতে তো পারিলাম না, এমন কি নোবেল প্রাইজ পাওয়া লইয়া যে সাংঘাতিক ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে সেটাও দূর করিতে কেমন যেন একটা দুরূহ সঙ্কোচ বোধ হইল। ঠাণ্ডা করিবার জন্যই বলিলাম—"একটা জাত স্বাধীনতার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মিস গ্রেস—তাদের দোষ ত্রুটি বা আতিশয্যগুলো আপনাদের মতো স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষদের একটু ক্ষমার চক্ষেই দেখা উচিৎ নয় কি ?"

মনটা বোধ হয় একটু ভিজিয়া থাকিবে, কেননা মিস গ্রেস্ আরম্ভ করিলেন একটু নরম স্বরেই, কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেইরকম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—হয়তো একটু বেশিই, বলিলেন—"তর্কের খাতিরে আপনার কথাটা মেনে নিলেও এটা আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়াই ভালো মনে করি মিষ্টার মুখার্জি যে আপনারা একটা ধুয়ো তুলেছেন বলেই যে আমরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাব এটা আপনারা যেন স্বপ্নেও না ভাবেন। আপনাদের গলার জোর থাকতে পারে কিন্তু তর্কের মধ্যে কোন জোর নেই। আর আমাদের জাত যদি কোন জিনিসকে মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত থাকে তো তা তর্কের সারবত্তা, কণ্ঠের শক্তি নয়। কণ্ঠশক্তি নিয়োগ করার মধ্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে মিষ্টার মুখার্জি, ভয় দেখানো; যে জাত নিজের শক্তি আর

অধ্যবসায়ের গুণে অর্ধেক পৃথিবীতে তার উপনিবেশ স্থাপন করলে সে কি এতই ভয়প্রবণ যে, আপনাদের গলাবাজিতেই তাদের অধিকার ছেড়ে পালিয়ে যাবে ?"

একটু না টুকিয়া পারিলাম না, তবে যতটা সম্ভব রমণীশ্রুতির উপযোগী করিয়াই বলিলাম—"মাপ করবেন মিস্ গ্রেস্—পৃথিবীতে আপনাদের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য। জাতি হিসাবে সবচেয়ে বড় বিধান দাতা (Law giver) বলে আপনাদের একটা খ্যাতিও আছে—তাই জিগ্যেস করছি অধিকার জিনিসটা এলো আপনাদের কোথা থেকে। আপনি বিদুষী,—অধিকারের মূলে যা যা থাকে তা তো নিশ্চয় আপনার অজ্ঞাত নয়…"

উল্টা ফল হইল, মিস গ্রেস্ এক রকম অসংযত হইয়াই উঠিলেন, মুখ একেবার সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধরও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, যে তর্কের সারবত্তার ওপর এত শ্রদ্ধা তাহার ধার দিয়াও না গিয়া বলিলেন—"দেখুন মিষ্টার মুখার্জি, অধিকার সম্বন্ধে পাঠ আমাদের অন্যের কাছ থেকে নিতে হবে না, সে জ্ঞান আমাদের যথেষ্টই আছে এবং আমাদের অধিকার কি করে রক্ষা করতে হয় তা আমরা ভালো রকমই জানি। তাহলে কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করেই বলি—মিষ্টার ট্রেভার আর আমার মধ্যে বাগ্‌দান হয়ে গেছে। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট ফিরে আসায় আবার 'কুইট ইণ্ডিয়া' রব ওঠায় এবং আপনি যে ঐ অধিকারের কথা বললেন, সে প্রশ্ন নিয়েও চারদিকে গুসতান ওঠায় তাঁকে তাড়াতাড়ি এই অগ্নিকুণ্ডে নিজের জমিদারিতে ফিরে আসতে হয়েছে। আশা ছিল যুক্তির জয় হবে, তা তাঁর যে কখানি চিঠি পেয়েছি তার প্রত্যেকটিতেই এই খবর যে, অবস্থা দিন দিনই খারাপ হয়ে উঠছে। শেষে আমি পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে এই চলেছি। কেন তা আন্দাজ করতে পারেন ?"

দীর্ঘ উচ্ছ্বাসে বেশ বিপর্যস্তই হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—"আজ্ঞে না, কৈ আন্দাজ করতে পারছি না তো কিছু।"

অর্থাৎ এবার ভালোমন্দ কিছুই বলিলাম না, যদি এভাবেই উত্তাপটা কমে। কিছু না। মিস গ্রেস্ এবার দৃষ্টিতে খানিকটা শাসনের ভাব

মিশাইয়া বলিলেন—"ইংরাজ রমণী হিসাবে আমি তাঁর বিপদে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছি মিষ্টার মুখার্জি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা সঙ্কল্প নিয়ে—যদি তিনি ভয়ে বা অন্য কোন কারণে এদের অন্যায় আবদারে নিজের অধিকার ছেড়ে সড়ে দাঁড়ান তো তাঁকে আরও একটি জিনিসের মায়া ছাড়তে হবে······"

মিস গ্রেস আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—অর্থাৎ আমায়; আমি যাচ্ছি, হয় আমাদের এনগেজমেণ্ট দৃঢ় করে আসব, না হয় একেবারেই চিরতরে ভেঙে দিয়ে আসব। তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় আমি অভ্যস্ত নই। আপনাদের অধিকার আমাদের চেয়ে যে বেশি, তা সাব্যস্ত করতে হলে আমরা খুব বিশ্বাসজনক প্রমাণ চাই মিস্টার মুখার্জি; যদি মনে করেন, মুখে "কুইট ইণ্ডিয়া" বললেন, আর আমরা তল্পি-তল্পা বেঁধে···"

এমন সময় গাড়িটা একটা স্টেশনে আসিয়া পড়িল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কামরায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। গাড়ীর দুই পাশের দোর-জানালা দিয়া দুইটা যাত্রীদল পিল পিল করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া গাড়িটা একেবারে ভর্তি করিয়া ফেলিল—কেহ নিজের শক্তিতে উঠিল, কাহাকেও ভিতর থেকে টানিয়া তুলিল, কাহাকেও বাহির হইতে ঠেলিয়া তুলিল; নানা রকমে ছোটবড় জিনিসপত্র আসিয়া যেখানে সেখানে পড়িতে লাগিল এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে অমন যে খালি কামরাটা তাহাতে তিল ফেলিবার ঠাঁই রহিল না। ছোট স্টেশন, ইতিমধ্যে ট্রেনটা হুইসিল দিয়া ছাড়িয়া দিল এবং গোলমাল যে হইতেছিল, সেটাকে ছাপাইয়া ভিতর এবং বাহির থেকে একটি চীৎকার উঠিল—"বর ওঠে নি—বর ওঠে নি!···বর ছেড়ে গেছে!···"

কয়েকজন দুইধার থেকে এলার্ম চেন টানিয়া ধরিল এবং গাড়ীটা ভালো করিয়া থামিবার পূর্বেই দুই দিকের জানলা গলিয়া দুইটি বর দুই দিক হইতে হাতে হাতে, পাঁজায়-পাঁজায় গাড়ির মাঝখানে আসিয়া পড়িল। গাড়ি আবার ছাড়িতে যেটুকু বিলম্ব হইল, তাহাতে সবাই আরও ডককগুলা লোককে গাদিয়া গাদিয়া দুই দিক হইতে চালান করিয়া দিল।

মিস গ্রেস একেবারে হতভম্ব হইয়া গেছেন খানিকটা যে ভীতও, সেটা বেশ বোঝা যায়। অত যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মুখে একেবারে রা নাই। শুধু বিস্ফারিত নেত্রে সব দেখিয়া যাইতেছেন। ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাকে কোণের জায়গাটিতে বসাইয়া নিজে পাশে বসিয়াছি এবং মাঝখানে আমাদের দুইজনের সুটকেস রাখিয়া একটা অন্তরালের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি। এতক্ষণ ভিতরের ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছিলেন, গাড়িটা একটু অগ্রসর হইলে একবার বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া ত্রস্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মিস্টার মুখার্জি, একবার বাইরে চেয়ে দেখুন! এ কি! এমন দৃশ্য তো জীবনে দেখিনি!..."

গলা বাড়াইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা অভিনব বটেই। গাড়ির পা'দানে আগে থাকতেই বেশ কিছুটা লোক ছিলই—আগাগোড়া—এখন সেখানেও রীতিমতো ভিড়, তাহার উপর যা সমস্ত দৃশ্যটাকে আরও দর্শনীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভিড়ের গায়ে বিলম্বমান নানারকম বাজনা—ঢাক, জয়ঢাক, বড় বড় করতাল, ক্ল্যারিওনেট, কর্নেট আরও সব জটিল বিলাতি বাজনা; ব্যাগপাইপ, দেশী ঢোল, ঢাক, সানাই, রামশিঙা—রকমারি ব্যাপার একেবারে!—আমাদের গাড়ির দুই দিকে একেবারে দুই-তিনখানা গাড়ি পর্যন্ত। ওদিকেও নিশ্চয় এই অবস্থা। আর এই সমস্তর উপর ছাপরা জেলার জুন মাসের ভরা দুপুরের রোদ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভিতরের হাওয়াই আগুনের হল্কা।

মিস গ্রেস সেই রকম বিমূঢ় দৃষ্টিতেই চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কিছু ঠাহর করতে পারছেন?—যেন মিলিটারী ব্যাণ্ডের মতো দেখাচ্ছে, মতলবখানা কি ওদের?"

বেশ বোঝা যায়, আগস্ট বিদ্রোহের আতঙ্কের সুর রহিয়াছে কণ্ঠে। বলিলাম—"না অন্য ব্যাপার কিছু নয় মিস্ গ্রেস, এ আমাদের দেশের একটা খুব সাধারণ ব্যাপার—বিবাহ হতে চলেছে; এর সঙ্গে বাজনা-বাদ্যি থাকাটা আমাদের একটা রেওয়াজ; আপনি সবে এদেশে এসেছেন, তাই আপনার নতুন ঠেকছে; দেখবেন, মিস্টার ট্রেভার এতে বেশ অভ্যস্ত।"

মিস গ্রেস স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, কি বলিবেন

যেন, কথা জোগাইতেছে না, শেষে ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিলেন—"এমন অসাধারণ একটা ব্যাপার এখানকার সাধারণ রেওয়াজের মধ্যে মিস্টার মুখার্জি? বলেন কি আপনি? এদের প্রাণশক্তি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি!"

আশ্চর্য হইবার তখনও অনেক কিছুই বাকি ছিল এবং এর পর যাহা দেখিলেন, তাহাতে মিস গ্রেস একরকম বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া বসিয়া রহিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মিস গ্রেসের প্রশ্ন করিবার ক্ষমতাই যেন লুপ্ত হইয়া গেল এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রশ্ন করিলে বোধ হয় আমাকেও নিরুত্তরই থাকিতে হইত।

নবাগতদের মধ্যে জায়গা লইয়া খুব একচোট কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ছাপরা জেলা, কেউ হটিবার পাত্র নয়, বচসা প্রচণ্ডতর হইতে হইতে ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল, তাহার পর ওরই মধ্যে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় সবাই এক রকম ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কতকটা ব্যবস্থাও হইল—ওদিককার বেঞ্চে ওদলের মাতব্বরেরা বরকে লইয়া একটু গুছাইয়া সুছাইয়া বসিল; এদিককার বেঞ্চেও সেই ব্যবস্থা হইল, বাকি সবাই দাঁড়াইয়া রহিল বা মালপত্রের উপর গাদাগাদি করিয়া বসিয়া রহিল, ওরই মধ্যে দুইটা দলের মধ্যে কিন্তু পার্থক্যটা বজায় রাখিয়া চলিল। আমার পাশেই যে ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে কিছু ভিতরকার খবর জোগাড় হইল। বরপক্ষীয়েরা একই জায়গার লোক, পরস্পরের জ্ঞাতি, জাতিতে রাজপুত। স্টেশন থেকে মাইল ছয়েক দূরে সিমরি গ্রামের জমিদার; একদল নামিবে ছাপরা, একদল সোণপুর। ওদিকে মোটা গোঁফ আর গালপাট্টা সমন্বিত প্রবীণ ভদ্রলোকটি ওদিককার বরের পিতা। নাম বাবু গুলজার সিং। ভয়ঙ্কর রাশভারি আর ফরিয়াদি লোক। এদিকতার কর্তা বরের বড় ভাই, এই বেঞ্চের যিনি শেষদিকে বসিয়া আছেন—মাথায় বাবরি, গোঁফ অত বড় নয়, তবে একটা রাজপুতী ঢং আছে, অত্যন্ত রগচটা মানুষ। নাম বলবন্ত সিং।

উভয় পক্ষের মধ্যে তিনপুরুষ ধরিয়া বৈরভাব চলিয়া আসিতেছে।

বলিলাম—"এরকম ফরিয়াদী আর খাপ্পা মেজাজের লোক একদিনেই বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছেন—বৈরিভাবও বলছেন বনেদী, উঠলেনও এক কামরায়, একটা হাঙ্গামা বাধবে নাতো?"

ভদ্রলোক একটু হাসিয়া নির্বিকারকণ্ঠে বলিলেন—"সেটা জগদম্বার ওপর নির্ভর করছে। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় গোটাকতক শির ধড় থেকে নামলে আপনি আমি কি রুখতে পারব বাবুজি? রাজপুতের বিয়ে—আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন? প্রায় তো লেগেছিল, জগদম্বার ইচ্ছেয় থেমে গেল তাইতো? তাঁরই মর্জি হলে আবার বেধে যেতে কতক্ষণ? দুই কর্তার মুখের ভাবটা একটু লক্ষ্য করুন না।"

সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুইজনেই বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন, অত্যন্ত গম্ভীর। ওরই মধ্যে ঘাড় ফিরাইয়া কয়েকবার পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বার দুয়েক বোধ হয় চোখোচোখিও হইয়া গেল তাহাতে মুখ দুইটা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল—ভিতরে খুব উগ্ররকম কোন চিন্তাধারা চলিতেছে।

মেমসাহেব নিথর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, বাহিরে অমন জ্বলন্ত হাওয়া তবু মুখটা এক একবার একটু বাড়াইয়া দৃশ্যটা না দেখিয়া লইয়া যেন পারিতেছেন না। ভীষণতার যে একটা মোহিনী শক্তি আছে সেটা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিছু বলিতেছেন না কিন্তু নিশ্চয় পারিতেছেন না বলিতে।

অবশ্য গাড়ির মধ্যে উভয় পক্ষ মিলিয়া খুব একটা হৈ হল্লা চলিয়াছে। তবে সেটা মিশিয়া যাইতেছে না, এদিকে-ওদিকে পার্থক্যটা মোটামুটি বজায় আছে। মিশিয়া গেলে অর্থাৎ এই অবস্থায় আবার বচসা সুরু হইয়া গেলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে ভাবিতেছি এমন সময় আমাদের দিকে হঠাৎ যেন একটা রামশিঙ্গার আওয়াজ উঠিল। মিস গ্রেস এক রকম চমকাইয়া মুখটা বাড়াইয়া তখনই টানিয়া লইলেন, চক্ষু দুইটি বিস্ময়ে আরও বিস্ফারিত হইয়া গেছে। কিছু একটা প্রশ্ন করিতেন কিন্তু আরও রুদ্ধবাক হইয়া গিয়া যেন পারিতেছেন না। ওঁর কথাটা নিজের হইতেই

"Mr. Mukherjee, I am suprised at ther stamina !"

ওঁর পরেই লক্ষণীয় ছিল দুই বরকর্তার মুখের ভাব। ঘটনাটা আমাদের দিকের, এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে কেহ রামশিঙায় ফুঁ দিতে পারে এটা বাবু বলবন্ত সিংএর রাজপুতী কল্পনারও অতীত নিশ্চয়, তিনি একবার ঝুঁকিয়া বাহিরে চাহিয়া লইয়া গোঁফে একটু তা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত হইলেও তাঁহার ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টির খানিকটা তির্যক রেখায় বাবু গুলজার সিংএর উপর গিয়া পড়িল। তিনি বোধহয় এই রকম একটা কিছু প্রত্যাশাই করিয়াছিলেন, ঘাড় ফিরাইতে একটু চোখোচোখিও হইয়া গেল দুইজনের। সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র গুম্ফ আর গালপাট্টার নীচে তাঁহার সুগৌর মুখমণ্ডল একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা দুই দিকের সবাই লক্ষ্য করিল এবং হঠাৎ সমস্ত গাড়িটাতে একটা থমথমে ভাব আসিয়া পড়িল। বাবু গুলজার সিং মুখটা খানিকক্ষণ বাহিরের দিকেই করিয়া রাখিলেন— রাগে ফুলিতেছেন। মেম সাহেব নিশ্চয় অতটা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না, রামশিঙার বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া আছেন। আমি কিন্তু দুই রাজার লড়াইয়ে উলুখড়ের নসিবের কথা চিন্তা করিয়া ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছি—বিশেষ করিয়া এই বিদেশিনীর জন্য। বাইরের লোক হিসাবে প্রয়োজন হইলে আমার এর মধ্যে পড়িয়া দুই পক্ষকে ঠাণ্ডা করিতে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় বাবু গুলজার সিং গর্জন করিয়া উঠিলেন—"তেওয়ারী !"

—এই প্রথম তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, শুনিবার জিনিস বটে !

ডাকটা সবার কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দরজার কাছে— "গরীব পরবর !" বলিয়া একটা প্রত্যুত্তর হইল এবং একটি লোক ভিড় ঠেলিয়া হন্তদন্ত হইয়া সামনে আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল—যেমনি লম্বা তেমনি আড়ে, মাথায় গোলাপী রঙের বিরাট শাফা, হাতে পেতলে-বাঁধানো লাঠি, পাশে ঘুন্টি দেওয়া পাঞ্জাবীর ওপর সোনার তাগার একটা একটা মালা।

এ তরফেও হুকুমের প্রত্যাশায় সবাই বাবু বলবন্ত সিংএর মুখের দিকে চাহিয়াছে।

শ্রাদ্ধটা কিন্তু ওদিকে গড়াইল না, সবাই একটু বেশী প্রত্যাশা করিয়া বসিয়াছিল। বাবু গুলজার সিং সেই রকম জলদ-গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"এটা বিয়ে হতে যাচ্ছে, না শ্মশানযাত্রা ?"

কথাটার তাৎপর্য্য তেমন বুঝিতে না পারিয়া তেওয়ারী শুধু আর একটা কুর্ণিশ করিয়া বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

আরও এক পর্দা চড়া সুরে প্রশ্ন হইল—"বাজনদারেরা যদি ছেড়েই গেল তা আমাদের আসবার কি দরকার ছিল—আমার ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছি কি আমায় শ্মশানযাত্রা করাচ্ছ তোমরা ?·········বলো, কথা কইছ না কেন ?"

তেওয়ারী একবার পিছনে সবাইয়ের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল এবং সে ও আরও কয়েকজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"বাজনদারেরা তো এসেছে হুজুর···চারটে দল···তাদের আগে চড়িয়ে আমরা তবে উঠেছি...কি কথা হুজুর, তাদের না চড়িয়ে আমরা উঠতে পারি কখন !"

"এসেছে যে তার প্রমাণ কি ? বাজনা কোথায় ?" সবাই চুপ করিয়া রহিল, এ অবস্থার মধ্যেও যে বাজনার প্রত্যাশা করে তাহাকে কি উত্তর দেওয়া যায় যেন ভাবিয়া পাইতেছে না ; শেষে মোসাহেবগোছের একজন একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"হুজুর, তারা সব এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে কোন রকমে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে, বাজাবার একটু কোনও উপায় থাকলে তারা ছাড়ত না, সে পাত্রই নয় তারা···"

এই সময় রামশিঙায় আর একটা আওয়াজ উঠিল এবং বলবন্ত সিং নিজের কয়েকজন লোকের উপরই দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া গোঁফে একটু চাড়া দিলেন।

বাবু গুলজার সিং মোসাহেবের কথায় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,— "এর পরের ষ্টেশনেই সবাই নেমে যাবে, ফিরে যেতে হবে ! তোমরা ভেবেছ গুলজার সিং মরেছে, কিন্তু সেটা তোমাদের ভুল ধারণা !"

এর পরে আর কিছু বলিলেন না। ভিড়ের ও-অংশে সেই রকম [illegible] রহিল শুধু তেওয়ারীকে লইয়া কয়েকজন মাতব্বর

একত্র হইয়া কি একটা পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিল, গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একটা ষ্টেশন আসিতেছে।

গাড়ী থামিলে তেওয়ারী নামিয়া গেল। ছোট ষ্টেশন, মিনিট দুয়েক থামিল গাড়ীটা, চলিতে আরম্ভ করিলে তেওয়ারী আসিয়া আবার উঠিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে এদিক পানে অনির্দিষ্ট ভাবে এমন একটা কটাক্ষ হানিল, যাহার অর্থ দাঁড়ায়—'এইবার চলে এসো।' তাহার পর রামশিঙাটি বাজিয়া উঠিতে যা দেরী, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ওদিকে চারটে দলের যত রকম যন্ত্র থাকিতে পারে—করনেট, ক্লারিওনেট, ব্যাগপাইপ, সানাই, রামশিঙা—সেই অগ্নিবর্ষী আকাশের নীচে একসঙ্গে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মিস্ গ্রেসের চোখ দুইটা বিস্ময়ে যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, আমার পানে চাহিয়া বলিলেন,—"এযে পুরোদস্তুর সঙ্গীত, মিষ্টার মুখার্জি !!

(This is full-fledged music Mr. Mukherjee !)"

অবশ্য ঠিক সঙ্গীত বলিতে যা বোঝায় তাহার কিছুই নয়,—তবে কোন যন্ত্রই বোধ হয় বাদ নাই, সুর-তালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সবগুলা যেন একটা প্রলয় তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

বাবু বলবন্ত সিঙের মুখ দেখিলাম একেবারে ছাইপানা হইয়া গেছে। বাবু গুলজার সিং জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"ফরসী !"

চিলমচি অপেক্ষাই করিতেছিল, তাওয়াদার চিলিম আর গড়গড়ার ব্যবস্থায় মোতায়েন হইয়া গেল।

সমস্ত পথ একটানা ঐ ব্যাপার চলিল। বাবু বলবন্ত সিং একবারও গাড়ির দিকে মুখ ফিরাইলেন না। ক্রোধে, অপমানে আক্রোশে জলন্ত আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া শুব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। গাড়ির গতিবেগ কমিয়া গেল, ষ্টেশন আসিল, গাড়ির শব্দ রহিত থাকায় বাজনার ঝঞ্ঝা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। বাবু বলবন্ত সিংএর সান্ত্রী একবার গাড়ির ওদিকে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিয়া গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল। গাড়িটা মিনিট দুই-তিন থামিল, বাজনা ওদিকে আরও ঝঞ্ঝাময় হইয়া উঠিল, তাহার পর গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে বাবু বলবন্ত সিংএর সান্ত্রী একলাফে

আবার গাড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল, তেওয়ারীর সেই বিজয় দৃষ্টিকে সুদে আসলে ফিরাইয়া দিয়া বেশ ঘটা করিয়া মনিবকে একটা কুর্ণিশ করিয়া আবার পাহারায় দাঁড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকের আগে পিছনের কয়েকটা গাড়ির পাদান থেকেও বিশ-পঁচিশটা বাজের সেই উৎকট ঝন্‌ঝনা।···বোধ হয় সম্বন্ধে আটকায় বলিয়া বাবু বলবন্ত সিং আর 'ফরাসী'র ফরমাসটা করিলেন না, তবে গোঁফে চাড়া দেওয়ায় যতটা সম্ভব বিশিষ্টতা ফুটাইবার চেষ্টা করিলেন এবং নিজের সান্ত্রীর দিকে এমন একটি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন যাহাতে স্পষ্টই বোঝা গেল একটা মোটা বকশিস তাহার কপালে নাচিতেছে।

বাবু গুলজার সিংএর মুখটা আবার আরক্তিম হইয়া উঠিল, বাহিরের দিকে চাহিয়া অনেকটা পথ অতিক্রম করিলেন, তাহার পর আবার মেঘমন্দ্রস্বর উঠিল—"তেওয়ারী!"

তেওয়ারী ভিড় চিরিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

"এমন গুঙা (বোবা) বাজনা কোথা থেকে জোগাড় করেছ তোমরা? জবাব দাও, চুপ করে কেন?" সবাই আবার শুব্ধ হইয়া গেল, এমন কি ওদলের লোকেরা পর্যন্ত।

অর্থটা বোধ হয় ধরিতে না পারায় তেওয়ারী একটু ব্যাকুলভাবে একবার সবার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল, শেষে সেই মোসাহেব ভদ্রলোক আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, "কেন, আওয়াজ তো হচ্ছে হুজুর।"

কর্তা হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"কিন্তু ঢাক ঢোলের আওয়াজ কোথায় মশাই? বাজনায় ঢাক নেই, বিয়েতে তো তাহলে কনে না থাকলেও চলে।"

সকলের মুখ আরও অন্ধকার হইয়া গেল।

মিস গ্রেস আমায় প্রশ্ন করিলেন—'আবার কি চায় ভদ্রলোক?"

বলিলাম—"বাজনায় ঢাকের অভাব ওকে পীড়া দিচ্ছে।"

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব মিষ্টার মুখার্জি?"

সবাই এক হাত—তাও আবার ডান হাতে হ্যাণ্ডেল বা জানালার ফ্রেম ধরিয়া আছে, অন্য হাতে বাঁশী শিঙে ধরিয়া পরিত্রাহি ফুঁ দিয়া

যাইতেছে, যো-সো করিয়া দু'একটা আঙ্গুলেই কোন রকমে এক আধটা চাবি টিপিয়া, কিন্তু ঢাক সামলাইবে কি করিয়া ?...উত্তর আর কি দিব ? বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

এবার ষ্টেশনটা খুব কাছে, অল্পের মধ্যে গাড়ির গতিবেগ স্তিমিত হইয়া আসিল। থামিলেই দুই সান্ত্রীতে পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া গাড়ি হইতে তড়াং তড়াং করিয়া লাফাইয়া পড়িল।

আমায় এর পরের ষ্টেশনেই নামিতে হইবে ; বেশী দূরেও নয় সেটা। গোছগাছ করিতেছি এমন সময় মিস গ্রেস যেন দারুণ আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন—"দেখুন ! মিষ্টার মুখার্জি, এদিকে দেখুন !! ও মাই গড !!"

একটা গাঁটরি মুক্ত করিতেছিলাম, যতক্ষণে মুখ বাহির করিয়া দেখিব যতক্ষণে গাড়িও ছাড়িয়া দিয়াছে সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া গেছে। এবার একেবারে স-ঢাক ; বাজনাও চলিতেছে সুরে তালে।

বাহিরে মুখ বাড়াইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, একেবারে কল্পনাতীত ব্যাপার ! এদিকে আমাদের গাড়ি আর আমাদের পেছনের দুইটা গাড়ির ছাত আর ওদিকে সামনের দুইটা গাড়ির ছাত আর ওদিকে সামনের তিনটা গাড়ির ছাত বোঝাই হইয়া গেছে। ঢাকি সানাইয়ে কর্ণেটি রামশিঙেওয়ালা কেহ বাদ নাই। লোকের উপর বাজনার চাপে ছাত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। গাড়ির বেগ যত বাড়িতে লাগিল, বাজনা ততই হইয়া উঠিতে লাগিল উগ্রতর। গাড়ির মধ্যের উত্তাপই বোধ হয় তখন একশ পনের ষোল ডিগ্রী। বাহিরে টিনের ছাতের উপর কত তাহা অনুমান করাও শক্ত...

একবার বেশ খানিকটা বুক পর্যন্ত বাহির করিয়া না দেখিয়া পারিলাম না। এদিকে তিনটা ছাত আর ওদিকে তিনটা। ওদিকের তিনটা ছাতে দুইটা দল পরস্পরের দিকে উগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া গলা ফুলাইয়া কপালের শির ফুলাইয়া কাসিয়া ঘামিয়া যেন সঙ্গীতের গোলা দাগাদাগি করিতেছে ; আগুনের হল্কার মতো হাওয়াটা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আবার নিজেকে টানিয়া লইলাম। দেখি বাবু বলবন্ত সিং গোঁফে তা দিতেছেন, বাবু গুলজার সিং শান্ত মর্যাদায় ফরসী সেবন করিতেছেন।

পরের ষ্টেশনে নামিলাম; কুলি নাই, তবে বরযাত্রীর লোকেরাই ভদ্রতা করিয়া জিনিসপত্র গুলা নামাইয়া দিলেন। কুলির জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেছি মিস গ্রেসও ধীরে ধীরে ছোট স্যুটকেসটি হাতে করিয়া নামিয়া আসিলেন।

বলিলাম,—"আপনার তো এখানে নামবার কথা নয়?"

বাজনার লড়াই বিপুল বিক্রমে চলিতেছে, মিস গ্রেস অন্যমনস্ক হইয়া সেইদিকে চাহিয়াছিলেন, উত্তরে বলিলেন—"আমার এর পরের ষ্টেশন মিষ্টার মুখার্জি; এইখানেই অপেক্ষা করব, মিষ্টার ট্রেভারকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি কারটা পাঠিয়ে দেবেন।···নিশ্চয় রাস্তা আছে?"

বলিলাম—"রাস্তা তো আছে, কিন্তু···"

মিস গ্রেস আবার ওই দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন, আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আর জানেন মিষ্টার মুখার্জি?—আমার সঙ্কল্পটাও বদলে ফেলেছি।"

প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম?"

"মিষ্টার ট্রেভারকে এদেশ ছাড়তে আমি বাধ্য করব আর যদি না ছাড়েন তো···"

গাড়ি ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সঙ্গীত আরও ক্ষিপ্ত, ওদিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবেই কথাগুলা এই পর্য্যন্ত বলিয়া হঠাৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া থামিয়া গেলেন। মিষ্টার ট্রেভারকে কেন যে এ দেশ ছাড়িতে বাধ্য করিবেন—অধিকারজ্ঞান হঠাৎ কেন এত শিথিল হইল, সে বিষয়ে আর কিছুই টের পাওয়া গেল না।

বাঁশের কেল্লা

মনোজ বসু

বাঃ, খাসা সাজিয়েছ তোমরা নিশিবাবু। বেছে বেছে বাঁশতলায় সভার জায়গা করেছ, ভারি ঠাণ্ডা জায়গা, রোদ লাগবে না মানুষজনের গায়ে। শেয়াকুল আর ন্যাড়াসেজির ঝাড় সাফসাফাই হয়ে গেছে, তেরঙা নিশান উড়িয়েছ দীঘির পাড়ে পোড়া-দালানের সামনে। আমরাও একটা নিশান বেঁধে দিয়েছিলাম ঐ দালানের ছাতে। সেটা অত বড় নয়—আর উড়েছিল বড় জোর পাঁচটা কি ছ-টা দিন।

যা ভাবছ, তা নয়। মাথা খারাপ হয়েছিল সত্যি জেলের মধ্যে, এখন সেরে গেছে। এখন ভালমানুষ আমি। বত্রিশ টাকা ভিজিটের বিলাতি খেতাব-ওয়ালা ডাক্তার ওষুধ দিয়েছিল, পাগলামি ক'দিন থাকে? এমনি আমি মাঝে মাঝে বাঁশবনের ধারে এসে বসি, দীঘির পাড় পোড়া-দালান আর পোড়ো ভিটেগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। চুপচাপ বসে থাকি নিশিবাবু, আজকেই তোমায় পেয়ে মীটিঙের খবরাখবর নিচ্ছি।

লক্ষ্মণ মাইতি মশায়ের জায়গা বুঝি দীঘির পাড়ে ঐ ঢিবির উপর? না—উচুতে আলাদা হয়ে কেউ বসবে না তোমাদের সভায়। সপ পেতে দেওয়া হবে একসঙ্গে সকলের জন্য। কিন্তু সপই বা কেন? বাঁশপাতা ঝরে ঝরে স্তূপাকার হয়ে আছে, ও-ই কতক এনে ছড়িয়ে দাও—গদির মতো হবে, দিব্যি আরাম করে বসা চলবে। কতদিন নিশিবাবু বাঁশপাতার বিছানায় ঘুমিয়েছি আমরা! বেশ লাগত। প্রভাসটা বাইরে থেকে এমন কাটখোট্টা—কদম-ছাঁটা চুল, গেরুয়া পরত না বটে কিন্তু হাঁটুর নীচে কাপড় নামতে দেখিনি, বছর পনের নিরামিষ ধরেছে—তার মধ্যে নুন ছোঁয় না বছর পাঁচেক—প্রভাস-মহারাজ বলে ক্ষেপাতাম আমরা, ফূর্তির জোয়ার খেলতে লাগল ঐ সময়টা যেন তারও মনে। এক টুকরো বাঁশের গোঁড়া আতার ছোটা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দোলনার মতো করে নিয়েছিল।

যেদিন পেটে ভাত পড়ত না দোল খাওয়ার শখ বেড়ে যেত-তার সেইদিন।

ফুল নিয়ে নিয়ে আসছে—ঢিবির উপর ঢালবে? কিন্তু কতক্ষণ থাকবে বলো নিশিবাবু? বাতাস এলে ঝুর-ঝুর করে বাঁশপাতা ঝরে পাতার নীচে তোমাদের ফুলসজ্জা ঢেকে দেবে। এই তো ক বছর আগে রক্তের ছোপে রাঙা হয়ে গিয়েছিল পোড়া-দালানের সামনে দীঘির পাড়ের ঐখানটা। বাঁশপাতা সরিয়ে দেখ দিকি—তার কোন দাগ আছে কিনা? লোকের মনে একটু-আধটু হয়তো আছে, তা-ও মিলিয়ে যাবে আর ক-বছর পরে।

মীটিং সন্ধ্যাবেলা—কত মানুষ আসতে শুরু করেছে এখনই এই সকাল থেকে। একজন দু-জন করে আসছে, আবার এক একটা মিছিল জমিয়ে আসছে। দূর-দূরান্তর থেকে খেয়া পার হয়ে আসছে। অনেকগুলো চাষী মেয়ে-বউ ফুলঝুরি ষ্টেশনে এসে নেমেছে, সেখান থেকে গরুর গাড়িতে চাকার ধূলোয় ধূসর হয়ে আসছে—ঐ দেখ। পোড়া দালানে অনেকদিন পরে মানুষের সোরগোল। দরজা-জানলা পুড়ে গিয়ে ঘরগুলো হা-হা করছে—তারই একটায় বিজলী ডাক্তার খাবার জল আর তুলো-আইডিন নিয়ে অফিস সাজিয়ে বসেছে। ঐ ঘরেরই একপাশে একটুখানি বিছানা করা আছে, যদি বিশ্রামের দরকার মনে করেন লক্ষ্মণ মাইতি মশায় এসে পৌছবার পর। বুড়ো মানুষ, তার উপর শরীরের ঐ হাল—মানুষগুলো নেহাৎ নাছোড়বান্দা বলেই তাঁকে সভা করে বেড়াতে হয় এগ্রামে-সেগ্রামে। তিনি আসছেন শুনে পাঁচ ক্রোশ সাত ক্রোশ দূর থেকেও ভোরবেলা চাল-চিঁড়ে নিয়ে সব বেরিয়েছে। বক্তৃতা করতে পারেন না মাইতি মশায়—দুটো কথা একসঙ্গে গুছিয়ে বলতে কালঘাম ছুটে যায়, অ্যাঁ-অ্যাঁ করেন—সেই সময় পাশ থেকে কথা জুগিয়ে দিতে হয়। তবু তাঁর নাম শুনে, তিনি হাতে করে শহীদ-পদক পরিয়ে দেবেন সেই অনুষ্ঠান চোখে দেখবে বলে পিঁপড়ের সারির মতো মানুষ আসছে দেখ। মাইতি মশায়ের সঙ্গে একই দিনে জেল থেকে বেরুই আমি—গ্রামে এসে এদিক-ওদিক তিনি তাকাচ্ছেন, কোন জায়গায় ঘরবাড়ি ছিল চিনতে পারেন না। আর

আমার কিন্তু ঠিক উল্টো অবস্থা, কিছু নেই—তবু সমস্ত জীবন্ত দেখতে পাই চোখের সামনে; সব কেমন চলে ফিরে বেড়ায়। পাগল হয়েছিলাম, আমি নিজে যা একবিন্দু টের পাই নি। সেই তারা সব রাতদিন যেন ঘিরে বসে থাকত আমায়, বড় আরামে ছিলাম। বরং মনে হয়, পাগল বুড়ো মাইতি মশায়ই। হাসতে লাগলে মনে হবে অমন সুখী লোক ভূ-ভারতে নেই। জেল থেকে বেরিয়ে ঘর উনি আর নূতন করে বাঁধলেন না। বললে হাসতে থাকেন, দরকার কি ভাই? কথা মিথ্যা নয়, ঘরের আর ওঁর কি দরকার? নিজে তো আজ এখানে কাল সেখানে এই করে বেড়াচ্ছেন। বউ জলে ডুবে মরেছে। তিন ছেলের মধ্যে প্রভাস ফাঁসিতে গেছে, আর দুটি ছেলে—একটির নাকি এখন-তখন অবস্থা। কেন মিছে ঘর বাঁধার হাঙ্গামা করতে যাবেন বলো?

বাঁশবনের ভিতরে কোনদিন ঢুকেছ নিশিবাবু, ঢুকে কতদূর গিয়েছ? ইচ্ছে হলে ফুলঝুরি ষ্টেশনের লেভেল-ক্রসিং অবধি চলে যেতে পার বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ছায়ায়। মাঝে মাঝে খানিকটা করে ফাঁকা, লম্বা উলুঘাস জন্মে আছে সেখানে—আর অজস্র কাশফুল। খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় এই দিক দিয়ে ষ্টেশনে, পথ অনেক কম—কিন্তু গ্রামের মানুষ নিতান্ত দায়ে না পড়লে বাঁশবনে ঢোকে না, সহজে মাড়াতে চায় না এদিককার পথ।

একটা দিনের কথা বলি, বারো-তোরো বছর বয়স হবে তখন আমার। ঘোর হয়ে গেছে, গরু আসেনি গোয়ালে। দুধাল গরু—ঠাকুরমা উতলা হয়ে ঘর-বার করছেন। তখন বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই গরু খুঁজে আনবার মতো। আমি বললাম, ব্যস্ত হয়ো না ঠাকুরমা, পাড়ার মধ্যেই আছে কোনখানে। ননীদের খামার-বাড়ি হয়তো ঢুকে পড়েছে তাদের গরু-বাছুরের সঙ্গে, দেখে আসছি—। ঐ যে ফাঁকা জায়গাটা নিশিবাবু, ক'টা ছেলে নুন-দাড়ি খেলা করছে—ঐখানে ছিল ননীদের খামার-বাড়ি। গিয়ে শুনলাম, শুঁটকি আমাদের সত্যিই খামারে ঢুকে পোয়াল-গাদা থেকে পোয়াল টেনে টেনে খাচ্ছিল। ওরা দেখতে পেয়ে বেহদ্দ পিটুনি দিয়ে দিয়েছে। তারপর বাঁশতলার এদিক দিয়ে ফিরে যাচ্ছি, মনে হল—ঐতো

সাদা মতো…শুঁটকিই। বড্ড রাগ হল, শিঙে একবার দড়ি পরাতে পারলে হয়। ঘুরে ঘুরে আমরা হয়রান হচ্ছি, আর হতভাগা গরু শুয়ে পড়ে দিব্যি জাবর কাটছে ওখানে!

জায়গাটায় এসে দেখি, কিছু নয়—ঝাড়ের ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে, সেইটে গরুর মতো মনে হচ্ছে দূর থেকে। ডাকছি, শুঁটকি-ই-ই! সামনের দিকে কি-একটা নড়ে উঠল—শুঁটকি না হয়ে যায় না…ছায়া দেখে দেখে এমনি অনেকটা এগিয়ে গেছি নিশিবাবু, হঠাৎ জোরে বাতাস এল, ক্যাঁচ কোঁচ কটর-কট আওয়াজ উঠল বাঁশঝাড়ে। সর্বাঙ্গ শির-শির করে উঠল। ছেলেমানুষ পেয়ে যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে অশরীরী বহুজন, চেপে ধরবে বুঝি বাঁশের আগা দিয়ে। রাস্তার দিকে দৌড় দিই। ঝাড়ে ঝাড়ে যেন ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে, বাঁশ নুয়ে নুয়ে পড়ছে আমার পথ আটকে—এই একবার মাটি ছোঁবার উপক্রম, পরক্ষণে আবার সটান উপরে উঠে যাচ্ছে। চাবুকের মতো সপাৎ করে কঞ্চির বাড়ি লাগল মুখের উপর। বাঁশপাতা ঝরছে, মুঠো মুঠো বাঁশপাতা যেন আমার গায়ে ছুঁড়ে মারছে।

রাস্তায় পড়েও ছুটছি। বাঁশবনের আওয়াজ কানে আসছে। এক ঠাকুর ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের গল্প শুনছিলাম, তারাই শাসাচ্ছে যেন আমায়। ঠাকুরমাকে দেখতে পেয়ে সুস্থির হলাম, লণ্ঠন নিয়ে আমার খোঁজে আসছিলেন। বললেন, শুঁটকি এসে গেছেরে। হুড়কোর ধারে এসে শিং নাড়ছিল, তাকে গোয়ালে তুলে তোকে ডাকতে বেরিয়েছি।

রাতে শুয়ে পরে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পীতাম্বর ঠাকুরকে দেখেছ তুমি—সেই যিনি বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন?

কিন্তু ঠাকুরমা কেন—তাঁর শ্বশুর অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ শশিকান্ত নাকি হামাগুড়ি দিতেন সেই সময়। অথচ গল্পটা ঠাকুরমা এমন গড়গড় করে বলে যান যেন আগাগোড়া চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন তিনি।

পায়ে পায়ে নিশিবাবু চলো না এগিয়ে, পীতাম্বর ঠাকুরের আসন দেখিয়ে দেব। পাকুড়তলা—ভারি জাগ্রত স্থান ছিল ওটা, দেশ-দেশান্তরের মানুষ আসত—আজকে যেমন আসছে লক্ষ্মণ মাইতি মহাশয়ের মীটিঙে। বাঁশঝাড় চারিদিকে চেপে ধরেছে পাকুড়গাছটাকে—আসল গাছ অনেকদিন

মরে গেছে, খান দুই ডাল বেঁচে রয়েছে কোনপ্রকারে, আর ক'বছর পরে চিহ্ন থাকবে না এ গাছের। ঠাকুরমার গল্প শুনেছি, পীতাম্বর ঠাকুর স্নান-আহ্নিক সেরে দেড়প্রহর রাত্রে এই গাছতলায় এসে বসতেন, শিষ্য-সেবকেরা সেই সময় চারিদিকে ঘিরে এসে বসত।

কোম্পানির তখন প্রথম আমল। ঠাকুর তো আস্তানা গড়ে নিশ্চিন্ত আছেন। বাঁশবন নয় এটা তখন—নদীর প্রান্ত জুড়ে বিস্তীর্ণ মাঠ। দো-চালা খোড়ো-ঘর বেঁধে সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হল সকলের আগে। তার চারিদিকে সংখ্যাতীত কুঁড়ে উঠল আশ্রমবাসী ও অতিথ-অভ্যাগত সাধুসজ্জনের থাকবার জন্য। মাঠের মাঝখানে গ্রাম গড়ে উঠল দেখতে দেখতে। তালুকদার এল একটা নিরিখ সাব্যস্ত করে বন্দোবস্ত দিতে, পঞ্চায়েত চৌকিদারি ট্যাক্সর তাগাদায় এল। ঠাকুর বলে দিলেন, রাজার প্রজা নই, সাধুরও খাতক নই। দেবীর কিঙ্কর—খসে পড়ো বাপধনেরা।

গ্রাম আরও জেঁকে উঠছে, নানা অঞ্চল থেকে মানুষ এসে ঘর বাঁধছে। ঢেঁকি-ঢেঁকিশাল তাঁত-চরকা হাপর-নেহাই—যা কিছু মানুষের দরকারে পড়ে। বিলের মধ্যে বিস্তীর্ণ ঐ যে ধানবন দেখতে পাচ্ছ নিশিবাবু, ওর বেশির ভাগই সে আমলে কারকিত করত ঠাকুরের লোকজন! এক খোলাটে ধান এনে তুলত, ঝেড়ে উড়িয়ে তুলে দিত ধর্মগোলায়। ট্যাক্স-খাজনার ধার ধারত না, দিব্যি ছিল।

বাঁধাঘাটে সবে তখন চৌকি বসেছে। সে এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূর, দুর্গম পথ ঘাট। এক বিকালে ঘোড়ায় চেপে দারোগা এল। ছোট রেল না হওয়া অবধি ও-অঞ্চল থেকে আসা-যাওয়া বড্ড মুশকিল ছিল নিশিবাবু। রাত থাকতে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে, তা-ও প্রায় সন্ধ্যা লেগে গেল পৌছতে। গাঙে-খালে তিনটে পারাপার—ঘাটে এসে হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হয়। মানুষ পার হলেও ঘোড়া পার করে আনা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে।

দারোগা এসে গড় হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। ঠাকুর পূজার নির্মাল্য জবাফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পাথরের বাটিতে ঘোল আর রেকাবিতে

করে খানকয়েক বাতাসা দিয়ে গেল একজন। খেয়ে দারোগা ঠাণ্ডা হল। তারপর বলে, ট্যাক্স চাইতে এসেছিল—হাঁকিয়ে দিয়েছেন। কোম্পানির রাজ্য জানেন এটা?

না বাবা, সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরীর রাজ্য। কারো তিনি ইজারা দিয়ে দেন নি পৃথিবীর জায়গা-জমি। বাজে কথা রাখো, অতিথ এসেছ—খাও-দাও থাকো দু-চার দিন—মায়ের নাম করো, আরাম পাবে। আমরা কারো তোয়াক্কা রাখিনে, কারো সঙ্গে গোলমাল করতে যাইনে। আমাদের কেন এসে জ্বালাতন করছ বাবা?

দারোগা দিন পাঁচ ছয় রইল সেখানে! ঠাকুরমা বলেন, চর্বচোষ্য খেয়ে দিব্যি মজায় ছিল। গিয়ে কিন্তু সদরে রিপোর্ট পাঠাল, জবরদস্তি করে আটকে রেখেছিল তাকে। গ্রামে সোরগোল পড়েছে, চওড়া পরিখা কাটা হচ্ছে চারিদিক ঘিরে। আস্ত বাঁশ পুঁতে পুঁতে প্রাচীর তৈরি হল—পর পর তিনটে প্রাচীর—দস্তুরমতো এক কেল্লা। আর ওদিকে অনিবার্য্য ভাবে যা ঘটবার কথা—একদল গোরা সৈন্য এসে পড়ল।

লম্বা চওড়া ইয়া দশাসই জোয়ান, রক্তাম্বর-পরা—এই নাকি ছিল ঠাকুরের চেহারা। বুক ফুলিয়ে খালি গায়ে সৈন্যদের বন্দুকের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। তারা অবাক হল। ঠাকুর বলেন, কেন গণ্ডগোল করতে এসেছিস্? ঘরের ছেলেরা ঘরে চলে যা। আমরা তো বাছা থুতু ফেলতেও যাইনে তোদের দেশে ঘরে।

কিন্তু ফিরে যেতে আসে নি তারা। বন্দুক ছোঁড়ে—ফাঁকা আওয়াজ. ভয় দেখাবার জন্য। ফলে উল্টা উৎপত্তি হল। প্রথমটা সকলের ভয় হয়েছিল—ভেবেছিল, ঠাকুর মরে পড়ে আছেন বুঝি নূতন-কাটা পরিখার ভিতর। কিন্তু হাসতে হাসতে ঠাকুর কেল্লায় এসে ঢুকলেন। লোহার গুলিও তাঁর গায়ে লেগে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল। হবে না কেন—ধর্ম সহায়, কারও উপর অন্যায় করতে যান না তো তাঁরা—নিজের জায়গায় চুপচাপ নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে থাকেন।

বাঁশের কেল্লা দেখে খুব হাসছে গোরা সৈন্যরা। এগিয়ে এসে ধাক্কাধাক্কি করে তারা প্রাচীরের খানকয়েক বাঁশ খুলে ফেলল। সেই

সময় এক কাণ্ড—পাকা মন্দির হবে, তার জন্য পাঁজা ভেঙে ইট স্তূপীকৃত করে রেখেছে, ঠাকুরের লোক আক্রোশে দমাদম সেই ইটবৃষ্টি করতে লাগল সৈন্যদের উপর। মাথায় লেগে মুখ থুবড়ে পড়ল একটা, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

পরবর্তী ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ঠাকুর মরলেন বন্দুকের গুলিতে, আরও ষাট-সত্তর জন মারা গেল। কেল্লায় আগুন দিল, দাউ-দাউ করে সারা দিনরাত জ্বলল, ফট-ফট করে বাঁশের গিরা ফুটতে লাগল। বিয়াল্লিশ সনে দীঘির পাড়ের ঘরবাড়ি জ্বলতে দেখেছ নিশিবাবু? ওই থেকে সেকালের ছবি আন্দাজ করে নিই। ঠাকুরের অতদিনের অত আয়োজন নিশ্চিহ্ন হল দেখতে দেখতে। একটুখানি কেবল স্মৃতি আছে—এই বাঁশবন। প্রাচীরে কতকগুলো যে গোড়ার বাঁশ পোঁতা ছিল তাই থেকে নূতন নূতন বাঁশ জন্মেছে শতাব্দী কাল ধরে। কসাড় বাঁশঝাড় হয়ে পড়েছে এখন এই জায়গায়।

এত সব ব্যাপারের একটুখানি ইঙ্গিতও কিন্তু কোন ইতিহাসে নেই। ঠাকুরেব অসমাপ্ত মন্দির কিম্বা সাত সাতটা যে পাঁজা সাজানো হয়েছিল, তার এক টুকরা ইট দেখতে পাওয়া যায় না গ্রামের কোনখানে। পণ্ডিত-জনেরা ঘাড় নেড়ে বলেন, গাঁজাখুরি গল্প—সামান্য একটু গ্রাম্যঘটনা লোকে মুখে মুখে রঙ চড়িয়ে এই রকমটা দাঁড় করেছে। সে যাই হোক, ছোট-বেলায় ঠাকুরমার মুখে শোনা প্রতিটি কথা কিন্তু মনে গেঁথে গিয়েছিল আমাদের। ইট রয়েছে নিশ্চয়ই মাটির নিচে কোনখানে চাপা পড়ে, সেইসব মড়ার হাড় পাঁজরা ধুলো হয়ে বাতাসে উড়ে মিশে আছে মাটির সঙ্গে। অহরহ বাঁশবনে কটর-কট আওয়াজ ওঠে—ছেলেবেলায় আমার মনে হত, সেকালের সেই রক্তাক্ত শিষ্য-প্রশিষ্যরা বাঁশের আগায় আগায় পা ফেলে শূন্য মার্গে চলাচল করছে। ছেলেমানুষ বলে নয়—বুড়োরাও নিতান্ত দরকার ছাড়া ঢুকতে চায় না এখানে। কেউ আসে না নিশিবাবু। দিনদুপুরে শিয়াল চরে বেড়ায়। খরগোস ছোটে দু-কান উঁচু করে, বাদুড় ঘুমোয় নিচেমুখো মাথা ঝুলিয়ে। তলায় ন্যাড়াসেঁজি ও শেয়াকুলের ঝোপ। কে আসতে যাচ্ছে বলো এদিকে, কার কি দায় পড়েছে?

দায় পড়েছিল আমাদের—খুব মুশকিলে পড়েছিলাম সেবার ঐ বিয়াল্লিশ সনের শেষাশেষি সময়টায়। আজকে নিশিবাবু ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বেড়াচ্ছি—সেদিন ঝোপের আড়ালে পাকা বাঁশপাতার উপর আমাদের দিনরাতের কায়েমি বিছানা হয়েছিল। শান্তিবউদি তাকিয়া দিচ্ছিল মাথায় দেবার জন্ম। তাকিয়ার বদলে একটা পাশবালিশ নিয়ে এলাম—ঐ এক পাশবালিশে এদিক-ওদিক মাথা রেখে অনেক লোকের শোওয়া চলে। ছিলাম অবশ্য মন্দ নয় নিশিবাবু। রাতদুপুরে শিয়াল ডেকে ডেকে চুপ করত, তখনই উৎসব পড়ে যেতে গ্রামের ঘরে ঘরে। আলো নিভিয়ে দিয়ে উৎসব। ছায়ার মতো এক একজন আমরা ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, দুয়োর খুলে তাড়াতাড়ি আপনজনেরা বেরিয়ে আসছে। ফিসফিস কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া—আমার দু-বছরের খুকি দেড়টা মাসের মধ্যে কোনদিন আমায় দেখতে পায়নি নিশিবাবু, আমিই তার ঘুমন্ত দু'চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে আদর করে যেতাম। সকাল হবার অনেক আগেই ঢুকতাম গিয়ে আবার বাঁশবনে। দেড়মাস বরাবরই যে এখানে ছিলাম তা নয়। সময় সময় ছোটলাইন ধরে দূরের কোন ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ি চাপতাম, আবার ফিরে আসতাম। এদিককার কাজের ভার আমাদের উপর, অঞ্চল ছেড়ে পালাবার জো ছিল না। রোজই যে ঘরে এসে খেয়ে যেতে পারতাম তা নয়। এক একদিন অচেনা মানুষ দেখা যেত গ্রামে—শাঁক বেজে উঠত এবাড়ি-ওবাড়ি। সে রাতে নিরম্বু উপোস যেত। কাছাকাছি খেজুর-বনে ভাঁড় পেতে দিয়েছে, কিন্তু বেরিয়ে এসে খেজুর-রস নিয়ে যাবে তাতেও বড্ড কড়া রকমের মানা ছিল।

গোড়া থেকেই বলি শোন। বারটা মনে আছে—বিষ্যুৎবার। হাট বসেছিল সেদিন, হাটবার ছিল, তাই মনে আছে বারটা। সকালবেলা টিপ-টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রভাসকে ধরল, হাত বেঁধে নিয়ে চলল। হাঁটু অবধি খদ্দর-পরা, মুখে প্রশান্ত হাসি আমাদের প্রভাস মহারাজ—তার হাতে দড়ি না দিলেও চলত নিশিবাবু। থানা এখন আর তো বাঁধাঘাটে নয়—আসামি পালিয়ে যাবে তার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

পালাবার হলে অপেক্ষা করত কি সে বাড়ি বসে? কত জনে সে বুদ্ধি দিয়েছিল, সে যায় নি। ওরা এলে প্রভাস বেরিয়ে এসে হাত দু-খানা এগিয়েই দিল একরকম। হাতে হাতকড়ি পরাল, কোমরেও এই মোটা এক দড়ি বেঁধে হিড়-হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে চলল। ঐ পোড়া দালানটা তখন ছিল থানা—এখন ফুলঝুরির গঞ্জে নূতন দালানে থানা উঠে গিয়েছে। কিন্তু সোজাপথে না নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গ্রামের বাইরে হাটখোলা অবধি তাকে ঘুরিয়ে বেড়াল। তার মানে, সারা অঞ্চলের মানুষ দেখে নিক ওদের প্রতাপ। কাল হল এই প্রতাপ দেখাতে গিয়েই। বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে হাটুরে মানুষ জমতে লাগল, সকলের মুখে ঐ এক কথা। ভোরবেলা এরা যে যার ঘরের মধ্যে ছিল, থানার লোক যেন ফাঁক বুঝে সেইসময় জুতো মেরেছে একা প্রভাসকে নয় অঞ্চল-সুদ্ধ মানুষের মুখে। প্রভাসকে এমনি ভালবাসত সবাই। বাসবে না কেন নিশিবাবু, অত কে করেছে গ্রামের মানুষের জন্য? ফুলঝুরির চালের কলে হাজার দেড় হাজার মানুষ গিয়ে পড়ল বাইরের চালান বন্ধ করবার জন্য—তখন প্রভাসই ছিল সকলের আগে। বারাণ্ডায় ঐ যে আধ-পোড়া শাল-খুঁটি, ঐখানে ঠিক দুপুরে প্রভাসকে বসিয়ে রেখেছিল। মালসায় করে গুড়-মুড়ি খেতে দিয়েছে, তা সে খায় নি। প্রহরখানেক একটানা জেরা করে ক্লান্ত অশোকবাবু সবে মাত্র খেতে গেছেন, খেয়ে দেয়ে এসে নব উদ্যমে আবার এক দফা চেষ্টা চলবে, তারপর পাঁচটার গাড়ীতে সবসুদ্ধ মহকুমা সহরে রওনা হয়ে যাবেন, এই সাব্যস্ত হয়ে আছে। কাণ্ডটা ঘটল এই সময়। আশপাশ আট-দশখানা গ্রামের বিস্তর লোক দলে দলে মিছিল করে এসে পড়ল। শঙ্খ বাজছে, শত শত নিশান উড়ছে, ভাবতে গেলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে নিশিবাবু। খাওয়া হল না অশোক-বাবুর, এঁটো হাতে বন্দুক নিয়ে ছুটলেন। হাটুরে মানুষও যে যা পেয়েছে হাতে নিয়ে হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। তিনজন মারা পড়ল ঐ জায়গায় আর একজন পরে হাসপাতালে। প্রভাসের হাতকড়ি ভেঙে কোমরের দড়ি কেটে কাঁধে তুলে লাফাতে লাফাতে নিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল অশোকবাবুর—জনতার নজর এড়িয়ে এঁদোপুকুরে কচুবনের ভিতর গিয়ে

বসেছিলেন, চাঁদ ডুবে না যাওয়া পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকতে হয়েছিল নাকি তাঁকে। সত্যি, তাজ্জব ঘটে গেল নিশিবাবু—এক মুহূর্ত্ত আগে যা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। প্রভাসকে শুধু ছাড়িয়ে নিয়ে আসা নয়—জমাদার-কনেষ্টবল উর্দি-চাপরাস ফেলে 'বাপ' 'বাপ' বলে পালিয়েছে, তাদেরই ক'জনকে তালাবন্ধ করে রেখেছে গারদঘরে। তে-রঙা নিশান পতপত করে উড়ছে থানার মাথায়। পাঁচ রাত চার দিন উড়েছিল ঐ ভাবে।

রাত্রি প্রহরখানেক অবধি এই সমস্ত চলল তো নিশিবাবু, তারপর চারিদিক শুদ্ধ হলে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবছি, এ কি হয়ে গেল—ঠিক এমনটা চাই নি, আশাও করি নি এত সহজে এমন দখলে এসে যাবে এসমস্ত। কাগজে লড়াইয়ের খবর পড়ি—সে ব্যাপারও এইরকমটা নাকি? হঠাৎ বিজয় হয়ে যায়, যত মানুষ মরবে আর যত গোলাগুলি চলবে বলে আস্ফালন করা হয় আসলে তার সিকির সিকিও লাগে না। এর পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আঁচ করছি এ ব্যাপার অবশ্য এখানেই চুকবে না। আমরা—বয়স যাদের বেশি—সাব্যস্ত করতে পারিনে, কি করতে হবে অতঃপর আমাদের। কিন্তু জোয়ান ছেলেগুলো বেপরোয়া, তাদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে, হাসি-স্ফূর্তির অবধি নেই, খবর নিয়ে আসে শুধু এই একটা জায়গা নয়—সর্বত্র প্রায় এক অবস্থা। সাম্রাজ্যের হাজার ছিদ্র, সামলাবে ওরা আর ক'দিকে? কত মানুষ আছে শুনি, কত হাতিয়ার? আর হাতিয়ার হাতে পেয়ে কে কোনদিকে তাক করবে তারই বা ঠিক কি? ওদের নিজের ঘরের ছেলেরাই বিরক্ত হয়ে বেঁকে বসেছে ক্রমে। সদর থেকে ফিরে এসে একজন গল্প করছে, সাদাসৈন্যের ব্যারাকের সামনে কয়লা দিয়ে লিখে রেখেছিল, কুইট ইণ্ডিয়া—ভারত ছাড়ো। সৈন্যদেরই একজন নাকি তার পাশে বড় বড় অক্ষরে জবাব দিয়েছে, ফর গড্‌স্ সেক—ঈশ্বরের দোহাই, ভারত ছেড়ে দেশে ফিরতে দাও তাদের। ছেলেগুলো মুখ নেড়ে নেড়ে আমাদেরই উপদেশ দিতে আসে, অত ভাবছেন কি দাদা? চালাও হুকুম এবার, নেতার মুখ চেয়ে থাকতে হবে না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পোষ্ট-অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে, খবরের কাগজ বন্ধ। ছেলেরা বলে ভাল হয়েছে

—বানানো গল্প আর সুকৌশলে পিছু-হঠার বাহাদুরি পড়তে হবে না এখন আর। কাগজ আসছে না, তা বলে খবরের প্রচার কিন্তু বন্ধ নেই। গাছে গাছে অলক্ষ্যে এঁটে দিয়ে যাচ্ছে সাইক্লোস্টাইল করা খবর। হুলস্থুল কাণ্ড। বিদেশে ফৌজ গড়েছে আমাদের। আসছে, তারা এসে গেল বলে। পথ তৈরী করো তাদের জন্য।

রাস্তায় বড় বড় গাছ কেটে ফেলেছে, পগার কেটেছে দশ-বিশ হাত অন্তর। খেয়া-নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে। ছোট রেললাইনও একেবারে বেমালুম মাঠের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে পাঁচ-সাত জায়গায়। সদর থেকে সৈন্য নিয়ে আসা সহজ হবে না আর এখন। রোজই নূতন নূতন বাধা তৈরী করছে। আর দিন গুণছি নিশিবাবু, খবর নিচ্ছি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছে কি আগুন? আগা-পাস্তলায় আগুন লেগে গেলে জল ঢালবে তখন কোন দিকে?

কিন্তু আটকানো গেল না নিশিবাবু। রাস্তায় নূতন মাটি ফেলে গাছ সরিয়ে মেটে রঙের সারবন্দি ট্রাক হিংস্র জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল, আর কোন উপায় নেই। সমস্ত রাত্রি হেঁটে জন চারেক আমরা একবার রাণায়ের মোহনা অবধি গিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু দূরের জায়গায় বেশি বিপদ। সবদিকে ডামাডোল চলছে, অচেনা লোক দেখলে সবাই কেমন এক ভাবে তাকায়। মুশকিলের কথা বলব কি সারাদিনের মধ্যে একমুঠো ভাত কি চিঁড়ে জোটাতে পারলাম না, সকলে চোখ কটমট করে চায়, নূতন মানুষ দেখে সন্দেহ করেছে পুলিশের চর আমরা। অবস্থা দেখে আতঙ্ক হল, দিনের বেলা এই রকম—রাত্রে নিশ্চয় এরা ধরে পিটুনি দেবে। অথচ আত্মপরিচয় দেবার উপায় নেই—যত ঢাকাঢাকি করছি, সন্দেহ ততই বেড়ে যাচ্ছে সকলের।

চুপি-চুপি বলি তাহলে নিশিবাবু, জেলে গিয়ে যেন সোয়াস্তির শ্বাস ফেলেছিলাম ছ-সাতমাসের পর। নিশ্চিন্ত। মাথা খারাপ হল, শুনে তোমরা হায়-হায় করতে, আমার তার জন্য এতটুকু কষ্ট ছিল না। এক বিচিত্র অনুভূতি—স্বপ্নের মতো এখনো আবছা আবছা মনে পড়ে। মোটা মোটা গরাদে আর উঁচু পাঁচিলে যেন লোহার কেল্লা গড়ে রাজাধিরাজ হয়ে

নিঃশব্দে ছিলাম; পথের কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে আর ঘুরতে হবে না। রাতে ঘুম হত না, তারাই সব ভিড় করে আসত। কত আনন্দ জানাত, কত দুঃখ করত?

এখন সুস্থ হয়েছি, একটা ছেলের চেহারা বড্ড মনে পড়ে, এসে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। ফুটফুটে ছেলে, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বছর পাঁচেক বয়স, কথা সুস্পষ্ট হয়নি এখনো। শান্তি-বউদির ছেলে কাজলের মতো অনেকটা। মরবার সময় আমি কাজলের কাছে ছিলাম, গলার ঘড়ঘড়ানি আর অসহায়। এত বাতাস পৃথিবীতে, একটুখানি বাতাসের জন্ম বার বার হাঁ করছিল অবোধ শিশু। সেই কাজলই যেন গিয়ে কাঁদত আমার কাছে।

শোন খোকা, কাছে এসো—

না—

আরও সে সরে গিয়ে বসত।

এসো মাণিক আমার। সন্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে আজকে। খাবে?

খাই কেমন করে? দেখ, দেখ তো—

কান্নায় ভেঙে পড়ত। গলায় সিল্কের রুমাল জড়ানো। রুমাল খুলে দেখাত। গলা দিয়ে রক্তের ধারা ছুটল আবার, গলা ছেঁদা করে বুলেট বেরিয়ে গেছে।

খোকা বলে' আমি কত চেঁচিয়েছিলাম। শুনতে পাওনি?

না ভাই, পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। মানুষের মুখে তাকিয়ে দেখবার ফুরসৎ থাকে কি লড়ায়ের মধ্যে?

খোকা বলত, চেঁচামেচি শুনে রাস্তায় গিয়েছিলাম। সবাই ইট মারছে দেখলাম লরীতে! আমিও মারলাম। এই এতটুকু একখানা—বড় ইট তুলতে পারি কি আমি? আমার ইট পৌঁছয় নি লরী অবধি। সত্যি বলছি, আমি বুঝতে পারিনি। সবাই মারছে, আমিও তাই মারলাম। আর অমনি খটাখট আওয়াজ করে তেড়ে এল।

কে?

ফিরে দেখেছি নাকি? কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ছুটলাম। রোয়াকে

উঠেছি, দরজায় ঘা দিচ্ছি, ও মাগো—বলে ডাকছি মাকে! ফটফট আওয়াজ হল, গলা আমার ফাঁক হয়ে গেল। পড়ে গেলাম, মনে হল! বলো তো, বলো—গলার এ ছেঁদা কি কোন দিন?

আচ্ছা নিশিবাবু, সত্যি সত্যি ঘটেছিল এ রকম! শুনেছ তোমরা কেউ? না নির্জন সেলে বসে পাগলের উদ্ভট কল্পনা?

এমনি যে কত লোক আসত। কত লোকের কত রকম কাহিনী। মনেও নেই সমস্ত আর বলতে গেলে তোমার ধৈর্য্য থাকবে না। ব্যস্ত তুমি এখন মৌটিঙের ব্যাপারে।

প্রভাসকে শেষ দেখেছিলাম গরাদের ফাঁক দিয়ে। সে দেখেনি, অঘোরে ঘুমুচ্ছিল সে তখন। উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হয়ে সেলের ভিতরটা অবারিত। ওয়ার্ডার পাহারা দিচ্ছে দরজার সামনে। ফাঁসি কাঠে কালো বাণিশ লাগিয়েছে, চর্বি দিয়ে মেজেছে দড়ি। প্রভাসেরই ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে সকালবেলা। তারা তৈরি।

ঘুমুচ্ছিল, রাতের স্তব্ধতা চূর্ণিত করে ঘণ্টার আওয়াজ এল। শোনা কথা অবশ্য—ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে বলেছিল, দশটা মিনিট সময় চাই যে ভাই। একটু গীতা পড়ে নেব, প্রার্থনা করব একটুখানি।

উদাত্ত কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, শেষ রাত্রের নির্ম্মল আকাশে অজস্র হীরার কুচির মতো তারা দপদপ করছে—সেই সময় ঘুম ভেঙে উঠে বসে শুনতে পাচ্ছি, যার কাছে যে দোষ করেছি, মাপ চেয়ে যাচ্ছি ভাই। শুনতে পাও বা না পাও আমায় মাপ কোরো তোমরা—

চোখে দেখিনি কিন্তু ছবিটা আন্দাজ করতে পারি নিশিবাবু। পবিত্র আগুনের মতো প্রদীপ্ত মুখ, ফাঁসির মঞ্চে অচঞ্চল উঠে দাঁড়াল তেত্রিশ বছর বয়সের আমাদের প্রভাস মহারাজ।

যে সময় বিচার চলছিল, একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, মানুষ মারতে পার তুমি? সত্যি কি মেরেছিলে?

খানিক হাসিমুখে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, মানুষ কি মারা যায়? জানোয়ার মরেছিল কিনা খবর রাখিনে। তারপর একটু স্তব্ধ থেকে

বলল, একটা কাজ কোরো ভাই দয়া করে, মহাত্মাজি বেরিয়ে এলে তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।

প্রশান্ত হাসি হেসে আবার বলল, কি অত ভাবনা করছ? জন্মেছি যখন, মরবই। যিনি জীবন দিয়েছেন, ফিরিয়ে নিচ্ছেন তো তিনিই।

প্রভাসের পদকটা মীটিঙের মধ্যে কে নিচ্ছে হাত পেতে? লক্ষ্মণ মাইতি মশায় নিজেই হয়তো কম্পমান হাতে বুকের উপর ঝুলাতে যাবেন। আর ভাল এক বক্তৃতা ফেঁদে বসবেন, রাজপুত ও শিখের ইতিহাস থেকে নজীর তুলে তুলে তুলনা করবেন। সামলে থেকো কিন্তু নিশিবাবু, পাশ থেকে সেই সময় কথা জুগিয়ে জুগিয়ে দিও নইলে মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি অ্যাঁ-অ্যাঁ করবেন, কোটরগত চোখ বেয়ে জলের ধারা বইবে, যজ্ঞ পণ্ড হবে তোমাদের।

টিচার

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজমাতা হাই-স্কুলের সেক্রেটারী রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার ভেবে চিন্তে শেষ পর্য্যন্ত টিচারদের কিছু সদুপদেশ দেওয়া স্থির করলেন। বুড়ো বয়সে এমনিতেই তাঁর ঘুম হয় কম, তার ওপর এই সব যাচ্ছেতাই খাপছাড়া ব্যাপারে মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় ক'দিন আরও ঘুম হয়নি। টিচাররা ধর্ম্মঘট করবে বেতন কম বলে, বেতন বাকী থাকে বলে, এটা-সেটা হরেক রকম অসুবিধা আছে বলে চাকরী করতে! বাপের জন্মে রায় বাহাদুর এমন কথা শোনেননি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা কি মজুর না ধাঙড় যে ধর্মঘট করবে?

শুধু তাঁর স্কুলে এ সব গোলমালের সম্ভাবনা ঘটলে তিনি অবশ্য ব্যাপারটা গ্রাহ্য করতেন না। দুটো ধমক দিয়ে, একটা মিষ্টি কথা বলে, সকলকে খেপাচ্ছে কোন্ মাথা-পাগলা ইয়ং টিচারটি সন্ধান নিয়ে তাকে খেদিয়ে সব ঠিক করে দিতেন অনায়াসে। কিন্তু সারা বাংলা দেশের সব স্কুলের টিচাররা জোট বাঁধছে, সম্মেলন করছে। খেতে পায় না লেখা ব্যাজ পরছে। করুক, পরুক। যা খুসী করুক অন্য স্কুলের টিচাররা, তাঁর স্কুলে তিনি ও-সব বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে দেবেন না, ও-সব হীনতা স্বার্থপরতা স্বেচ্ছাচারিতা ঢুকতে পারবে না তাঁর পবিত্র শিক্ষায়তনে।

স্বার্থ ভুলে, বিলাসের লোভ জয় করে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে হাসি মুখে বহন করে, বিদ্যাদানের মহান আদর্শ যাঁরা গ্রহণ করেছেন, দেশের যারা ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড তাদের গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব পালন যাঁদের জীবনের ব্রত, বুনো রামনাথ যাঁদের গর্ব্ব ও গৌরব, তুচ্ছ দুটো পয়সার জন্য, সামান্য দুটো অসুবিধার জন্য, তাঁরা নিজেদের নামিয়ে আনবেন, আদর্শ চুলোয় দেবেন, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অসভ্য মজুর-ধাঙড়ের মত হাঙ্গামা করবেন, তা কখনো হতে পারে না, রায় বাহাদুর তা বিশ্বাস করেন না।

মোটামুটি এই ধরণের সদুপদেশ রায় বাহাদুর টিচারদের শোনালেন শনিবার স্কুল ছুটি হবার পর, অবশ্য অনেক ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে, দমক-গমক মূর্চ্ছনা আমদানী করে গুরু-গম্ভীর চালে।

আপনারা কি বলেন?

কে কি বলবেন? সকলে চুপ করে থাকেন। রায় বাহাদুরের ধৈর্য্য বড় কম, বিশেষত এখন এত লম্বা বক্তৃতা দেবার পর এই গরম অবস্থায় এক ফোঁটাও আছে কি না সন্দেহ, কেউ কিছু বলতে গেলে হয় তো গালাগালি দিয়ে বসবেন, গালে চড় বসিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য্য নয়। কিছু বলার দরকারও ছিল না। টিচারদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে এটা অফিসিয়াল মিটিং নয়, রায় বাহাদুরের নিজস্ব সদুপদেশ দানের সভা। চুপ-চাপ বসে শোনাই এখানে যথেষ্ট।

প্রৌঢ় হেড-মাষ্টার শশাঙ্ক বাবু কেবল একবার মাথা চুলকিয়ে বলেন, আজ্ঞে, তা বৈ কি। শিক্ষকজীবনের মহান্ আদর্শের কথা কি তাঁরা ভুলতে পারেন।

সভার শেষে শশাঙ্ক বাবুই একান্তে আবার বলেন, গত মাসের বাকী মাইনেটার জন্য একটু, যে-রকম দিন কাল, সংসার চালানোই—

—কে উস্‌কানি দিচ্ছে জানেন?

ক'বছর আগে হলে শশাঙ্ক বাবু হয় তো দু'-একটা নাম উচ্চারণ করে ফেলতেন। কিন্তু শশাঙ্ক বাবুও আর সে শশাঙ্ক বাবু নেই, অনেক বদলে গেছেন।

—আজ্ঞে, উস্কানি কে দেবে। একজন দু'জনের উস্কানির ব্যাপার নয়, আপনি তো জানেন, দেশ জুড়ে এ-রকম চলছে।

স্কুলের বাগানের দিকে চেয়ে থেকে রায় বাহাদুর বলেন, গিরীন খুব পলিটিক্‌স করে বেড়ায় না কি?

বুকটা ধড়াস করে ওঠে শশাঙ্ক বাবুর, গিরীন তার জামাই। মনে মনে আরেকবার গিরীনকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, পলিটিকস্ করে না। মিটিং-ফিটিং হলে হয় তো কখনো শুনতে যায়। আর স্কুলে পলিটিকস্ নিয়ে কিছুই হয় না।

—হয় না? সেদিন ষ্ট্রাইক করে ছেলেরা স্কুলের মাঠে যে মিটিং করল?

—আজ্ঞে সেটা ঠিক পলিটিক্যাল মিটিং নয়। প্রোটেষ্ট মিটিং মাত্র। কলকাতায় ষ্টুডেণ্টদের ওপর গুলী চালান হল, তারই প্রোটেষ্টে—

—কলার কাঁদিটা বাড়্‌তি হয়েছে না? এবার কেটে ঝুলিয়ে রাখলেই পেকে যাবে দু'-এক দিনের মধ্যে, কি বলেন?

—কাল মালীকে বলব।

—রাতারাতি যেন চুরি হয়ে যায় না, দেখবেন! রায় বাহাদুর হাসলেন।

সন্ধ্যার পর গিরীন বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে রায় বাহাদুর আশ্চর্য্য হন না। গিরীনের সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নে ভড়কে গিয়ে শশাঙ্ক নিশ্চয় তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন দোষ কাটাতে, কথায় কথায় তাঁকে জানিয়ে দিয়ে যেতে ভুলচুক যদি সে করেই থাকে তিনি যেন ক্ষমা করে নেন, এবার থেকে সে সাবধান হবে। তাই যদি হয়, তবে ভালই।

গিরীন কিন্তু ও-সব কথার ধার দিয়েও যায় না। খুব বিনীত ও নম্রভাবে পরদিন তার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন জানায়। রায় বাহাদুর অবশ্য বুঝতে পারেন, তার মানেও তাই। খানিকটা স্পষ্ট ভাবে জানানোর বদলে ইঙ্গিতে জানানো যে সে অনুগতই, রায় বাহাদুর যা অপছন্দ করেন তা থেকে সে তফাতে থাকবে, তাঁকে চটাবে না।

—অন্নপ্রাশন? ছোট ছেলের? তা বেশ। কিন্তু আমি নেমন্তন্নে যাই না, বুড়ো শরীরে সয় না ও-সব। রায় বাহাদুর অমায়িক ভাবে হাসেন।

—আপনাকে পায়ের ধূলো দিতেই হবে।—গিরীন বলে নাছোড়বান্দার জোরালো অনুনয়ের সুরে, সকাল সকাল গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসবেন শুধু, একটু ফলমূল মুখে দেবেন। সবাই আশা করছি, মনে বড়ই আঘাত পাব না গেলে।

রায় বাহাদুর যেতে রাজী হয়েছেন ধরে নিয়েই যেন একটু ইতস্ততঃ করে গিরীন আবার বলে, একটা কথা বলি আপনাকে, দোষ নেবেন না। খেলনা বা উপহার কিছু নিয়ে যাবেন না খোকার জন্য। আমাদের বংশের

রীতি আছে, কোন কাজে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া কারো কাছে সামান্য উপহারও নেওয়া চলবে না। ঠাকুরদা না তার বাবা অভিশাপ দিয়ে গিয়েছেন, একগাছি তৃণ নিলে পর্য্যন্ত বংশের সর্ব্বনাশ হবে।

—বলো কি হে?

অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে গেলে কিছু দিতে হবে এ চিন্তাটা ছিল রায় বাহাদুরের। এবার একটু ভেবে, গিরীনের একান্ত আগ্রহ দেখে, রাজী হয়ে বললেন, এত করে যখন বলছ—

তিনি কিছু খাবেন না, কিন্তু এই সুযোগে মিষ্টি প্রভৃতি তার সঙ্গে কি দেবে না গিরীন? রায় বাহাদুর ভাবেন। অনেকেই দেয়।

প্রায় দশটায় রায় বাহাদুর গিরীনের বাড়ী পৌঁছলেন। বাড়ী দেখে তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন উৎসবের চিহ্ন না দেখে আরও বেশী। এত ছোট এত পুরানো এমন দীনহীন চেহারার একতলা পাকা বাড়ী হয় রায় বাহাদুর জানতেন না, কারণ এর চেয়েও খারাপ বাড়ী চারি দিকে অসংখ্য ছড়ানো থাকলেও তিনি কোনটার দিকে কখনো তাকিয়ে দ্যাখেননি—এ ধরণের বাড়ীর কোন অধিবাসী কস্মিন্ কালেও তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পায়নি! ছেলের অন্নপ্রাশন রীতিমত একটা উৎসবের ব্যাপার। তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশনে ব্যাণ্ড বেজেছিল, মেয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে তিনি অন্তত শানাই বাজান। লোক গিজ-গিজ করে তাঁর বাড়ীতে, ছেলের বেলা বেশী হোক, মেয়ের ছেলের বেলা কম হোক, গিজ-গিজ করে। গিরীনের বাড়ীতে লোক আছে বলেই মনে হয় না, ভেতর থেকে শুধু ভেসে আসছে ছোট একটা ছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্না।

গাড়ীর আওয়াজে বেরিয়ে এসে গিরীন তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, যথাসাধ্য আয়োজন করেছি, দোষক্রুটি ক্ষমা করবেন।

যথাসাধ্য আয়োজন? বৈঠকখানার ভাঙ্গা তক্তপোষে বিছানো ছেঁড়া ময়লা সতরঞ্চির এক প্রান্তে কুণ্ডলী-পাকানো ঘেয়ো কুকুরের মত দলা পাকিয়ে বসে আছে খালি গায়ে জবু-থবু একটা মানুষ, মেঝেতে লোমওঠা

বিড়ালটা ছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণী নেই ঘরে। তক্তপোব ছাড়া বসবার আসন আছে আরেকটি, কেরাসিন কাঠের একটা টেবিলের সামনে কালিমাখা একটি কাঠের চেয়ার। দিনে বৈঠকখানা হলেও ঘরটি যে রাত্রে শোবার ঘরে পরিণত হয় তার প্রমাণ, গুটানো কাঁথা-মশারির বাণ্ডিলটা জানালায় তোলা রয়েছে, তক্তপোষের নীচে ঢুকিয়ে আড়াল করে গোপন করে ফেলবার বুদ্ধিটা বোধ হয় কারো মাথায় আসেনি।

—ইনি আমার বাবা, গিরীন পরিচয় করিয়ে দেয়, দু'বছর ভুগছেন। আর বছর ডাক্তার বলেছিলেন, কলকাতা নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেণ্ট করাতে, পেরে উঠিনি, সাত-আটশো টাকার ব্যাপার।

জবুথবু বৃদ্ধ কষ্টে চোখ মেলে তাকান। দুটি হাত একত্র করে নমস্কার জানাবার মতই যেন চেষ্টা করেন মনে হয়। ক্ষীণকণ্ঠে কি বলেন ভাল বোঝা যায় না।

—আসুন। ভেতরে চলুন।

রায় বাহাদুরকে গিরীন বাড়ীর মধ্যে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। উঠান পেরিয়ে যাবার সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে রায় বাহাদুর যথাসাধ্য আয়োজনের কোন চিহ্নই দেখতে পান না। রোয়াকে একজন অল্প একটু হলুদ বাটছে, তাঁর বাড়ীতে দৈনিক রান্নার জন্য যতটা হলুদ বাটা হয় তার সিকিও হবে না। যে বাটছে তার বেশটা তাঁর বাড়ীর ঝিয়ের মতই, তবে রায় বাহাদুর অনুমান করতে পারেন মেয়েটি ঝি নয়, বাড়ীরই কোন বৌ-ঝি। ওপাশে রান্নাঘরে খুন্তি দিয়ে কড়ায়ে ব্যাহ্নন নাড়ায় রত বৌটির শাঁখা-পরা হাতটি শুধু চোখের এক পলকে দেখেই কি করে যেন রায় বাহাদুর টের পেয়ে যান যে সে গিরীনের বৌ।

যত ছোট হোক চার-কোণা উঠান হলেও, চার ভিটেয় চারখানা ঘর তোলার সুযোগ থাকলেও, বৈঠকখানাটি বাদ দিলে ভেতরে ঘর মোটে দু'খানা—রান্নাঘরের চালাটি ছাড়া। গিরীনের শোবার ঘরখানার নমুনা দেখেই রায় বাহাদুর বুঝতে পারেন অন্য ঘরখানাও কেমন, নড়া-চড়ার স্থান কতটা, কি রকম আলো-বাতাস আসে।

জলচৌকিতে পাতা পুরানো কার্পেটের আসনে বসে রায় বাহাদুরের দম আটকে আসে। ছোট ছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্নাটা এখন খুব কাছে মনে হয়।

—কে কাঁদে?

—ছেলেটা কাঁদছে, ছোট ছেলেটা। যার মুখে ভাত। জ্বর আসবার সময় এমনি করে কাঁদে। জ্বর এসে গেলে চুপ করে যাবে।

রায় বাহাদুর অস্বস্তি বোধ করেন, এদিক ওদিক তাকান, একটা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন মনে হয় তাঁর। গিরীন নীরবে তাঁকে লক্ষ্য করে, ফাঁদে পড়া সিংহ জন্তুর দিকে শিকারী ব্যাধের মত শান্ত নির্ব্বিকার ভাবে, মুখ তার থম-থম করে মনের আপোষহীন মনোভাবে।

—আপনি তো ভাল হোমিওপ্যাথি জানেন। সবাই বলে যে ডাক্তারি পাশ করেননি বটে, কিন্তু আপনার ওষুধ একেবারে অব্যর্থ।—সে বলে ব্যঙ্গ ও তোষামোদের সুরে। ছেলেটাকে দেখে দিন না একটু ওষুধ? বিনা চিকিৎসায় মরতে যাচ্ছে ছেলেটা।

রায় বাহাদুর যেন রাজী হয়েছেন তার ছেলেকে দেখে ওষুধ দিতে এমনি ভাবে দরজার কাছে গিয়ে গিরীন ডাকে, শুনছো? খোকাকে নিয়ে এসো শীগ্‌গির। আঃ এসো না নিয়ে? দেরী করছো কেন?

নিজের অতিরিক্ত অধৈর্য্যের কৈফিয়ৎ দেবার জন্যই যেন রায় বাহাদুরের কাছে গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে, আর পারি না এদের সঙ্গে। আপনার সামনে আসবে যা পরে আছে তাই পরে, তাতেও লজ্জা। সম্বল তো সেই বিয়ের একখানা শাড়ী, এক ঘণ্টা লাগবে এখন সেখানা বার করে পরতে। আর পারি না সত্যি।

সে এসে কৈফিয়তের বিরক্তি জানানো সুরু করতে না করতেই ছোট একটি কঙ্কাল বুকের কাছে ধরে পাঁশুটে রঙের রোগা একটি মেয়ে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, এক-নজর তাকিয়েই রায় বাহাদুর টের পান পরনের কাপড় বদলে বিয়ের সময়কার একমাত্র শাড়ীটি সে পরে আসেনি। এটাও তিনি টের পান যে, ওকে আসতে দেখেই গিরীন তাঁর কাছে এসে শোনাচ্ছে তার বৌয়ের মানুষের সামনে বার হবার উপযুক্ত কাপড়ের

অভাবের কথা! তার প্রায় পিছু-পিছুই বৌটি ঘরে ঢুকেছে। মাথা ঝিম-ঝিম করে ওঠে রায় বাহাদুরের। তাঁর ভয় করে!

—ও, তুমি এসেছ, গিরীন বলে নির্ব্বিকার ভাবে, এইখানে শুইয়ে দাও।

রায় বাহাদুরের উলের মোজা আর পালিশ-করা দামী চকচকে জুতো-পরা পায়ের কাছে মেঝেটা সে দেখিয়ে দেয়। বৌ তার ইতস্ততঃ করে, বড় বড় জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকায় তার মুখের দিকে। এত শীর্ণ বৌটি, এমন শুকনো বিবর্ণ তার রক্তশূন্য মুখ, কিন্তু তার রূপ দেখে ভেতরে ভেতরে মুষড়ে যান রায় বাহাদুর। তার বাড়ীর মেয়েরা, ফুলি ঝিটা পর্য্যন্ত, যেন শুধু মেদ আর মাংস। গিন্নীর কথা ধর্ত্তব্য নয়, তিনি প্রায় গোলাকার। তার মেজ মেয়ে আর মেজ ছেলের বৌ রোগা ছিপছিপে, বড় ছেলের বৌটাও ছিপছিপে ছিল বিয়ের সময়, আজ কাল মুটোচ্ছে। গিরীনের ক্ষীণাঙ্গী বৌটির সঙ্গে মিলিয়ে রায় বাহাদুর বুঝতে পারেন, তার মেয়ে বৌদের গড়নটাই শুধু ছিপছিপে, অতি বেশী মেদ-মাংসেই তারা গড়া, প্রত্যেকে তারা তাঁর গিন্নীরই সূচনা। সত্যিকারের রোগা ক্যাংটা তরুণীকে চেয়ে চেয়ে দেখতে এত ভাল লাগে রায় বাহাদুরের, এত তাঁর ইচ্ছা করে টিপে-টুপে ছেনে-ছুনে দেখতে সত্যিকারের কঙ্কালসার তরুণীকে!

—কি করছ?—গিরীন বলে বৌকে অনুযোগ দিয়ে, ওখানে শুইয়ে দাও। উনি পায়ের ধূলো ছোঁয়াবেন, আশীর্ব্বাদ করবেন, ওষুধ দেবেন।

—না! না! রায় বাহাদুর প্রায় আর্ত্তনাদ করে ওঠেন, আমি ওষুধ দিতে পারব না। ওর ভাল চিকিৎসা দরকার। ওকে তুমি ডাক্তার দেখাও, ভাল ডাক্তার দেখাও।

—বিনা ফি-তে কোন্ ডাক্তার দেখবে বলুন? গিরীন যেন আমোদ পেয়ে মুচকে মুচকে হাসে।

ভয় করে রায় বাহাদুরের। মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে ওঠে। কতক্ষণ খেলা করবে গিরীন তাঁর সঙ্গে কে জানে, তার পর এই বর্ব্বর নিষ্ঠুর খেলার শেষে কি করবে তাই বা কে জানে। এরা বিপ্লবী, এরা খুনে, এরা সব পারে। শশাঙ্কর জামাই বলে, তার স্কুলের একজন টিচার বলে

বিশ্বাস করে একা একা এই ছদ্মবেশী ভালুকের খপ্পরে এসে পড়ে কি বোকামিটাই তিনি করেছেন।

—মা, খোকাকে শুইয়ে দাওগে। কিছু তুমি ভেবো না মা। বৌমাই বলি তোমাকে, গিরীন আমার ছেলের মত। তোমার কোন ভাবনা নেই বৌমা, ছেলে তোমার ভাল হয়ে যাবে, আমি তোমার ছেলের চিকিৎসার ভার নিলাম। আমি এখুনি গিয়ে বোস ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

—এখুনি যাবেন? তা হবে না, ফল টল একটু মুখে না দিয়ে গেলে বড় কষ্ট হবে আমাদের মনে। অকল্যাণ হবে আমাদের। আপনার মত মানুষ বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—

গিরীনের বিনয়ে বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে রায় বাহাদুরের। অসহায় দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন পায়ের চকচকে জুতার দিকে। অতি কষ্টে বলেন, বেলা মন্দ হয়নি। নিমন্ত্রিতেরা আর কেউ—?

—আজ্ঞে বলিনি আর কাউকে। ইচ্ছা ছিল বলবার, ভেবেছিলাম ওনার হাতের যে দু'গাছা চুড়ি আছে তার একটা বেচে দিয়ে কয়েক জনকে বলব, স্কুল-মাষ্টারের স্ত্রীর হাতে শাঁখা থাকলেই ঢের। তার পর ভাবলাম, ছেলের মুখে ভাতে শেষ-সম্বলটুকু খোয়াবো, তার চেয়ে বরং সম্বলটা থাক, ও-মাসেও পুরো মাইনে না পেয়ে উপোসটা ঠেকানো যাবে!

বুড়ো হলেও বুদ্ধির ধার একেবারে পড়ে যায়নি রায় বাহাদুরের। জীবনে উঠতে গিয়ে মুস্কিলে পড়তে হয়েছে অনেক বার, নিজে বুদ্ধি খাটিয়েই নিজের মুস্কিল আসান করেছেন। আজকের বিপদের ধরণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না এটাই হয়েছে ফ্যাসাদ। উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছেন না গিরীনের। নিজের দুর্দশা চোখে দেখিয়ে তাঁর দয়া জাগাবার সাধ থাকলে চোখে এভাবে আঙুলের খোঁচা দিয়ে কি কেউ তা দেখায় পাগল ছাড়া? তাঁকে বিরক্ত করে, চটিয়ে, এমনি টিট্‌কারি দেওয়ার ভঙ্গিতে দেখায়, এমন উদ্ধত বিনয়ের সঙ্গে? কাল টিচারদের সভায় কিছু না বলে গিরীন যেন ঘাড় ধরে তাঁকে বাড়ী টেনে এনে বাস্তব প্রতিবাদ জানাচ্ছে তাঁর বক্তৃতার, ব্যঙ্গ করছে তাঁকে। কিন্তু কেন করছে সেটা

তো কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না রায় বাহাদুরের! তাঁর স্কুলের একজন টিচার, সে কি এত বড় গাধা যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে না এভাবে তাঁর কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ আদায় করা যায় না, এতে বরং তারই বিপদ, সমূহ বিপদ?

মুখের ভাবে গলার স্বরে সহানুভূতি আনবার চেষ্টা করে রায় বাহাদুর বলেন, তোমার অবস্থা এত খারাপ তা তো জানতাম না গিরীন। অ্যাপ্লিকেশন দিও, ও-মাস থেকে দশ টাকা বাড়িয়ে দেব। তুমি ভাল পড়াও শুনেছি। আর বাকী মাইনেটাও বরং পাইয়ে দেব তোমায় সোমবার।

গিরীন ভয় পেয়ে হাত জোড় করে বলে, তা করবেন না স্যার। লোকে বলবে ছেলের মুখে ভাতের ছলে আপনাকে বাড়ীতে ডেকে খাতির করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি, বাকী মাইনে আদায় করেছি। আমার সর্ব্বনাশ করবেন না স্যার।

চোখের পলক পড়া আটকে যায় বাহাদুরের, ঢোক গিলতে গিয়ে দেখেন সেটাও আটকে গেছে। ঘরের যে অসীম দৈন্য ভিখারীর সকরুণ আবেদনের মত এতক্ষণ তাঁকে পীড়ন করছিল হঠাৎ যেন সেটা দাবীদারের শাসানির মত ফুলে উঠেছে। উঠানে তিনটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে খেলা করছে ধুলামাটি নিয়ে, খেলা যেন ছল ওদের, রায় বাহাদুরকে ওরা অবজ্ঞা জানাচ্ছে। ও-ঘরে জ্বরো ছেলেটার কান্না ঝিমিয়ে এসেছে কিন্তু সেও যেন ভয় দেখালো রায় বাহাদুরকে, কান্না নিস্তেজ হয়ে আসা যেন ঘোষণা বাচ্চাটার কান্না সে চিরতরে থামিয়ে দেবে, সে মরবে, মরে দায়ী করে রেখে যাবে তাঁকে।

তাঁকে আরও শাসানো দরকার বলেই যেন গিরীনের পরিবারের আরও দু'জন এবার আসরে নামে। প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোক তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে একটি কুমারী মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে আসেন।

—ছাখ গিরীন ছাখ, ধেড়ে মেয়ের কাণ্ড দ্যাখ, ডাল ধুতে দিয়েছি, লুকিয়ে কাঁচা ডাল চিবোচ্ছে—গিরীনের মা থেমে যান, জিভ কাটেন।

মেয়েটি পালিয়ে যায় হাত ছিনিয়ে নিয়ে। এক মুহূর্ত্ত হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে মা-ও সরে যান।

—আমি এবার উঠি গিরীন।

—একটু বসুন।

গিরীন বেরিয়ে যায়। গিরীন ফিরে আসবার একটু পরে সেই চুপি-চুপি ভাল-খাওয়া মেয়েটি একটি রেকাবিতে দুটি দামী সন্দেশ, একটি কলা, কয়েক টুকরা আপেল ও শশা নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরে আসে। বাঙ্গালী গেরস্ত ঘরের হিসাবে বিয়ের বয়স তার পেরিয়ে গেছে অনেক দিন। মেয়েটি রোগা, পুষ্টির অভাব সত্যিকারের। সত্যিকারের রোগা মেয়ের দিকে তাকাবার মোহ কিন্তু তখনকার মত বিগড়ে গিয়েছিল রায় বাহাদুরের। নীরবে তিনি দু'-এক টুকরা ফল মুখে দিতে থাকেন।

বৈঠকখানা দিয়ে যাবার সময় চৌকীর প্রান্তের জরাজীর্ণ মানুষটি কষ্টে চোখ মেলে তাকান। রায় বাহাদুর এক নজর দেখেই তাড়াতাড়ি চলে যান বাইরে।

সোমবার গিরীন নোটিশ পায় বরখাস্তের। নোটিশ সে প্রত্যাশা করছিল। ক্ষমতা থাকলে ফাঁসির হুকুম দিতেন রায় বাহাদুর। কিন্তু একটা কথা জানে গিরীন। রায় বাহাদুর ভুলতে পারবেন না, তাঁর ভয় করবে। শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে আটকে যাবে কথাগুলি, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা। দয়া-মায়া-সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।

ভাসান

সুশীল জানা

মৌসুমী তখনও নামেনি। শুধু তার জানানি হিসাবে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে কয়েকদিন আগে। তাতেই বৈশাখের ঘাসপোড়া ফাটা মাঠের রিক্ততার চেহারা যেন বদলে যায় হঠাৎ। একটা ফিকে সবুজ রং মাঠের পর মাঠ জুড়ে হেসে ওঠে ঝিলমিল ক'রে—আর গ্রামের কিসানদের মধ্যে আসে একটা কাজের জোয়ার। বিশীর্ণ মানুষের কাঠামগুলো অন্তিম গ্রীষ্মের কড়া রোদ্দুর মাথায় ক'রে কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে এক হাতে, আর এক হাতে চেপে ধরে লাঙল।

দিনের এই চষা মাঠে পায়ের দাগ পড়ে রাত্রিতে—অসংখ্য মানুষের পথচলার দাগ। ছোট ছোট দল রাত্রির ঠাণ্ডায় পথ চলে। স্ত্রী আর পুরুষের সারি, পিঠে বোঁচকা একটি ক'রে অথবা কচি ছেলে। বহু দূর থেকে হেঁটে হেঁটে আসে তারা—বহু দূরের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে। যতো ভূমিহীন নিঃস্ব কৃষি-মজুরের দল—সুন্দরবনের নতুন আবাদী জমির জোতদার আর মাঝারি কৃষকেরা এসে নিয়ে যায় তাদের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে যোগাড় ক'রে। পথে দেখা হয় নতুন নতুন দলের সঙ্গে। মিশে যায়, আলাপ করে, আত্মীয়তা খোঁজে কয়েক ঘণ্টার জন্যে। আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলা চালাক-চতুর মানুষগুলি আলাপ করে ডাক দিয়ে দিয়ে:

কুন লাটের লোক গো?

সুন্দরবনকে বলে এরা লাট। উত্তর আসে:

মন্দিরতলা। তুমরা?

আই পালট।

তারপর মন্দিরতলা আর আই প্লট মিশে যায় ফিকে অন্ধকারে। মাথার ওপরে আধখানা মলিন চাঁদ বার বার ঢাকা পড়ে যায় আসন্ন বর্ষার

খণ্ড খণ্ড মেঘে। পাশাপাশি অনেকগুলি স্ত্রী আর পুরুষ নিঃশব্দে হাঁটে আর কান খাড়া ক'রে শোনে আগে চলা চালাক মানুষগুলির কথা। জোরে জোরে কথা কইছে তারা—জমির বন্দোবস্ত, সেলামী, খাজনা, ফসল।......

মাটি তো নয়—সোনা। এত ধানও ফলে সে দেশে! অভাব নেই, দুঃখ নেই। গ্রামের মানুষ তবু কেন যেতে চায় না সে দেশে? নিন্দে করে। বলে—জঙ্গল জালপাই। গ্রাম ছেড়ে এ পথে যে যায় সে কৃপার পাত্র। তবু সেই যে সোনার দেশ—শুধু ধান ধান ধান। কেমন দেশ সে!

নিঃশব্দ মূর্তিগুলি হাঁটে রিক্ত মাঠের ওপর দিয়ে ভূতের মতো—আর মনে মনে কাঁপে ধান ভরা এক অচেনা দেশের মাঠে। পেছনে—বহু দূর কোন্ গ্রামে যেন একটা কুকুর ডাকছে টেনে টেনে।

হঠাৎ পেছনের লোকগুলির মধ্যে একটা আলোড়ন ওঠে। থমকে দাঁড়ায় আগের হুঁসিয়ার লোকগুলি।

একটি নারীকণ্ঠ ফুটে উঠলো পেছনের লোকগুলির ভেতর থেকে—আ মর, চোখ নাই না-কি।

আঁধারে দিশেনি—ঠাউর পাইনি। একটি মোলায়েম পুরুষ কণ্ঠ।

মেয়েটি মুখ ভেঙিয়ে ব'ললো আহাহা—ঠাউর পাইনি।

আই প্লটের দলপতি জিজ্ঞেস ক'রলো, কে রে কামিনী?

কে জানে কে!

মন্দিরতলার দলপতি চিনেছে পুরুষটির গলা। ডাক দিল, কি হ'ল রে সদা?

কিছু না বাবু। আগাও তুমরা—আগাও।

এবারে হুঁসিয়ার হয়ে চলে মেয়েটির পেছনে সদানন্দ। পাশের পুরুষ সঙ্গীটিকে অস্ফুট কণ্ঠে ব'ললো খুব তেজি। গেরামের মেয়েমানুষ নয় বোধ হয়—লাট ঘাঁটা।

কান খাড়া করে শোনে মেয়েটি আর পথ চলে আগে আগে।

সদানন্দ পাশের সঙ্গীটিকে আবার ব'ললো বছর আঠারো বয়স হবে বোধ হয়।

খুশি হয় আগে চলা মেয়েটি। কিন্তু সদানন্দের পাশের লোকটি যেন বোবা। এক গাল দাড়ি লোকটার, মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল উড়ছে বাতাসে—কত দিন যেন খেউরি হয় নি। বিরাট চওড়া কাঁধের ওপরে একটা কচি ছেলে—পিঠে একটি বোঁচকা। সদানন্দের কোনো কথাতেই যেন তার উৎসাহ নেই—ভয়ে ভয়ে সব কথাতেই শুধু হুঁ দিয়ে যায়।

সদানন্দ ব'লে চলে, কত দেখলি—লাট-বেলাট আমার পুকুর ঘাট।

তারপর বকে বকে থেমে যায় সদানন্দ।

নিঃশব্দে দীর্ঘ একটি নরনারীর বাহিনী মুখ নীচু ক'রে অনুসরণ করে আগের লোকগুলিকে। বহুদূর থেকে হেঁটে আসছে তারা—ভারী হ'য়ে আসছে পা। ভারী হ'য়ে আসে মন। অসংখ্য খুঁটিনাটি কথা—গ্রামের কথা, প্রতিবেশীর কথা—হঠাৎ যেন সব মনে পড়ে যায়। অনেক দিনের অনেক কথা যেন পেছনে টান মারে অদৃশ্য দুই হাতে। তবু এগোয় তারা পায়ে পায়ে—সুমুখের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে কোন এক অচেনা স্বর্ণভূমির ধানে ভরা মাঠের পর মাঠ হেমন্তের হাওয়ায় যেন ঝিলমিল করে।

আগের লোক হুঁশিয়ারী দেয়: পা চালা—পা চালা ভাই সব। আর আধক্রোশ আগে ঘোলপুকুরের হাট—সেইখানে তামুক খাব।

মন্দিরতলার দলপতি নীচু গলায় বৌকে বোঝায়—হাটে গিয়েই কেশবকে যেন তামাক দেয়, খোঁজ নেয় যেন তার ছেলেটার। ভারী কাজের লোক কেশব—গতরের জোরে জমি জায়গা, ঘর দোর, গরু বাছুর সব ক'রেছিল একা, তারপর সব হারিয়েছে আকালের টানে। লোকটাকে হাতে রাখতে পারলে ভাবনা নেই আর নব হাজরার। মনে মনে হাজরা ভয়ানক খুশি।

এর ওপরে আছে সদানন্দ। লোকটা কাজ করে যেন মাতালের মতো। মন্দিরতলায় জুড়ি তার নেই। কেশব আর সদানন্দ। পায় পায় পথ হাঁটে হাজরা—পরিতৃপ্তির একটা হাসি নিঃশব্দে ঝকমক ক'রছে পাণ্ডুর চোখে।

ক্লান্ত পা ফেলে মুখ নীচু ক'রে আধক্রোশ পথ পার হ'য়ে এলো দীর্ঘ বাহিনীটি—তারপর এক ক্রোশ······দেড় ক্রোশ। দু-ক্রোশের

শেষে ঘোলপুকুরের হাট। বোঁচকা-বুঁচকি মাটিতে নামিয়ে ধপ্ ধপ্ ব'সে পড়ে সকলে, কেউ কেউ সোজা শুয়ে পড়ে মাটিতে। মেয়েরা ছেলে নামিয়ে কোমর সোজা করে।

সদানন্দ তার বোবা সঙ্গীটিকে চুপি চুপি ব'ললো, গ্যাঁজা খাবে—চল একটু তফাতে যাই।

গোঁফদাড়ি ভরা মুখে হাঁ ক'রে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে লোকটা সদানন্দের দিকে। তারপর বলে, ও আমি খাইনি কুনোদিন।

খাওনি তাতে কি! একটান খাও - হাঁটা মানিবেনি। এখনও অনেক পথ।

না ভাই তুমি খাও।

ছেলেটা তার কাঁধের ওপরে ঢুলছে। কাঁধ থেকে নামিয়ে কোলে নিতেই ছেলেটা একেবারে ঘুমে ঢুলে পড়ে। জবুথবু হ'য়ে বসে রইলো লোকটি। ফিরে ফিরে দেখে চার পাশের অচেনা হাটখোলা —ভাঙ্গা চালা। আকাশে আধখানা চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে মেঘের সারি। ভয়ানক ক্লান্ত মনে হয়—হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায় ঘরের কথা: কোথায় কোন্ গ্রামে এক বাঁশবনের ধারে একটা সুন্দর ঘর ছিল। একটা রোগা কালো মেয়ে পিঠে চুল এলিয়ে দিয়ে ছেলের কান্না থামাতো—

আয় চাঁদ আ—

ফটিকের কপালে আমার

টিপে দিয়ে যা।

তারপর এলোমেলো হয়ে যায় সবটা। কে যেন ডাকছে তাকে: কেশব—কেশব কোথায় রে!

এই যে কর্ত্তা।

কেশব সাড়া দিল। মন্দিরতলার দলপতি তামাক নিয়ে নিজে এসে দাঁড়াল কেশবের সামনে। বললো তামুক খা। সদা কুথা গেল—সদা? মুশকিল হইল এই শালাকে লিয়ে।

এই যে কর্ত্তা—ইদিকে। দূর থেকে সাড়া দিল সদানন্দ। একরাশ ধোঁয়া গেলা কণ্ঠস্বর। আই প্লটের এইটি লোকের সঙ্গে কথা কইছে ফিস

ফিস করে। মন্দিরতলার দলপতি এগিয়ে গেল সেই দিকে—গিয়ে বসল সদানন্দের গা ঘেঁসে।

তামাকের গন্ধকে ছাপিয়ে ওঠে উৎকট গাঁজার গন্ধ।

ওপাশে কে একটি মাটিতে শোয়া লোক উঠে বসে হাই তুলে ব'ললো, ঘুম পায়।—আরও কত রাস্তা বাকি?

কেউ কথা বলে না—কিন্তু কান খাড়া ক'রে থাকে সবাই। কেশব তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখে—যেন ধোঁয়াটে একটা ঘর। কত লোক ঘুমুচ্ছে এমন রাতে—সারা জগৎ। ধোঁয়াটে ঘরটা ঘুরতে থাকে ধোঁয়ায়।

ঢুলুনি আসে।

তারপর হঠাৎ এক সময় চোখ মেলে দেখলো—ফিকে চাঁদের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে কে একটি মেয়ে—চাপা গলায় জিজ্ঞেস ক'রছে তাকেই—ছেলেটা কি তার ঘুমিয়েছে? ভালো লাগে মেয়েটিকে। হঠাৎ কোন কথা জোগায় না মুখে, কেশব চেয়ে রইলো। হাতে অনেকগুলি মাদুলি বাঁধা নব হাজরার তৃতীয় পক্ষের বৌ। স্বামীর সঙ্গে এসেছিল কয়েক দিনের জন্যে বাপের বাড়িতে, ফিরে যাচ্ছে আবার। মেয়েটা দাঁড়িয়েই থাকে কেশবের সুমুখে।

এমন রাতে এই মেয়েটার দিকে চেয়ে আর একটা মেয়েকে মনে পড়ে যায় কেশবের—রোগা কালো মেয়ে একটা। এমন রাতে কত কাছে মনে হয় তাকে। হঠাৎ সাধ হয়, কত লোকেই তো বেঁচে গেছে, বেঁচে আছে অভাবে, ক্ষুধায়, রোগে—সে মেয়েটা না মরলে বড় যেন ভাল হ'তো।

আর একটি দল এল হাটে।

কুন লাটের লোক গো। হাঁক দিল আই প্লট।

মরিচখালি!

মরিচখালির গা ঘেঁসে বসে মন্দিরতলা আর আই প্লটের।

কিছুক্ষণের বিশ্রাম।

এখনো সুমুখে পড়ে আছে অনেকখানি পথ। তবু সুদীর্ঘ এই পথের ধারে পরিশ্রান্ত বিশ্রামের সময়টুকুতে পরিচয় হয় মুখোমুখি, মনে মনে।

গ্রাম ছাড়া, ঘরহারা হৃতসর্ব্বস্ব নারী আর পুরুষগুলি রূপহীন একটা অদৃশ্য পারিবারিক আত্মীয়তায় কথা কয়—আলাপ করে। নারী পুরুষে মেশামেশি বিরাট একটি পরিবার যেন বসে আছে হাটখোলা ভরে।

এদের মাঝখানে সদানন্দ ঘুরে ঘুরে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজে বেড়ায় সে রুখে দাঁড়ানো সেই তেজি মেয়েটিকে—কামিনী যার নাম। খুঁজে খুঁজে বের করলো সদানন্দ। এক পাশে বসে আছে কামিনী অশথ গাছের গুঁড়িটায় মাথা ঠুকে। যেন একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে সে।

সদানন্দ গিয়ে ধপ্ ক'রে বসে পড়ল তার পাশে।

চমকে উঠলো কামিনী—চেয়ে দেখলো, গায়ে পড়া সেই লোকটি। নিঃশব্দে হাসছে তার দিকে চেয়ে—জিজ্ঞেস ক'রছে :

কুন গেরামে ঘর তোমার গো ?

আলাপ কোথাও বাধে না সদানন্দর—মেয়েটিরও না। নতুন গ্রাম থেকে আসা এই এত গুলি নারী আর পুরুষের মত, হাতে এক গোছা মাদুলি বাঁধা নব হাজরার তৃতীয় পক্ষের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকা কেশরের মতো থমকে যায় না, সঙ্কুচিত হ'য়ে যায় না আড়ষ্টতায় কেউই। তারা আস্তে আস্তে কথা বলে—যেন এমনি জীবনে অনেক ব'লেছে তারা, অনেক দেখেছে।

সদানন্দ আস্তে আস্তে ব'লো, যাবো না মন্দিরতলায়। হাজরাকে ছাখলে এমন গা জ্বলে আমার—শালা অনেক ঠকাইছে। ইচ্ছা হয়—চলিয়া যাই তুমাদের সাথে আইপালটে।

কামিনী কোনো কথা বলে না—চুপ ক'রে বসে থাকে।

তুমাদের সাথেই যাব।

সদানন্দকে খুঁজতে এসে ফিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানখাড়া ক'রে শোনে নব হাজরা। চলে যাবে সদানন্দ ?—অসম্ভব। হঠাৎ যেন চটে গেল হাজরা—চটে সে সদানন্দের ওপরেই কিন্তু রাগটা গিয়ে পড়ে তার বৌয়ের ওপর। কেশবের ঘুমে ঢুলে পড়া ছেলেটাকে কোলে ক'রে বসে আছে মানকুমারী।

হাজরা দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো, ওই পরের ছেলে একটা কোলে ক'রে

বসে থাকলেই চলবে? এদিকে আমাদের লোকজন কে কুথা গেল—তামুক টামুক পাইল কি না কেউ, দেখতে হবে না?

কোলের ঘুমন্ত ছেলেটাকে দেখিয়ে ব'ললো, এর বাপতো তামুক খাইছে!

হাজরা খেঁকিয়ে উঠে ব'ললো, সদা—সদানন্দ তামুক খাইছে?

মানকুমারী সভয়ে নব হাজরার কুৎসিত বিরক্ত মুখটার দিকে চেয়ে রইলো—যে মুখটাকে সে বহু দিন ধরে ঘৃণা করে এসেছে মনে মনে, ভয়ে ভয়ে।

হাজরা চাপা গলায় আদেশ দিল—যা খুঁজে দেখ কুথায় গেল সদানন্দ।

কোলে ছেলেটাকে চেপে চুপ ক'রে বসে রইলো মানকুমারী। সদানন্দের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না আজ মানকুমারীর—একটা বাউণ্ডুলে খেয়ালী লোক। আজ হঠাৎ তার মনে হয়—সেই লোকটা জীবনে যেন অনেক মিথ্যে কথা বলেছে—মিথ্যে কথা বলেছে কোন একটা ঘর সংসারের, অন্য কোনো একটা জীবনের। একটা মিথ্যাবাদীকে সে ঘৃণা করে। কেশবের ঘুমন্ত ছেলেটার দিকে চেয়ে রইল সে চুপ ক'রে—হঠাৎ মনে পড়ে যায় গোঁফদাড়ি ভরা একটা বোকা ভাল মানুষকে। সেই লোকটি ভাল—তার একটি ছেলে আছে। ছেলেটাকে তার কোলে তুলে দেওয়ার সময় কেমন করে সেই লোকটা ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে?

বসেই রইলো মানকুমারী। হাজরা বিরক্ত হ'য়ে ডাকাডাকি শুরু করলো সদানন্দকে। সদানন্দ—একটা ভালো খাটুনে লোক, যেন গেল হাত ছাড়া হয়ে। মানকুমারীকে লাথি মারতে ইচ্ছে হয় হাজরার, মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয় হঠাৎ গলা টিপে।

ডাকাডাকিতে সুমুখে এসে দাঁড়ালো সদানন্দ।

নব হাজরা এক গাল হেসে বললো, এসেছিস? বস, তামুক খা। খেয়ে নে—এবার উঠবো। দেখি, আর কে কোথায় গেল।

নব হাজরা যেন ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে সবঠিক ক'রে ফেলতে হবে। এসে সে দাঁড়ালো

কামিনীর সামনে। পাশ ঘেঁসে বসে ফিস্ ফিস্ ক'রে শুধালো, কুন গেরামে ঘর তুমার গো।

মুখ টিপে হাসলো কামিনী।

হঠাৎ আই প্লটের দলপতির ডাক শুনে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো মেয়েটি।

সময় হ'লো না গুছিয়ে বলবার—তবু হাজরা ব'ললো, যাবে মন্দিরতলা, ঘর ডুবো—জমি ডুবো।...

আই প্লটের দলপতি ডাকছে: কামিনী—অ কামিনী।

কামিনী নিঃশব্দে উঠে চলে গেল।

চোয়ালটা ঝুলে পড়ে হঠাৎ হাজরার, শাণিত শিকারী দৃষ্টি মুহূর্তে যেন ঘোলাটে হ'য়ে যায়। বহু কষ্টে জড়ো করা শক্তির দৃঢ় গ্রন্থি একটা যেন খুলে আলগা আলগা হ'য়ে যায়।

তারপর আবার যাত্রা শুরু। তিনটি দল হেঁটে চলে নিঃশব্দে। ফিকে জ্যোৎস্নায় তখন সুমুখে এসে দাঁড়ানো মেয়েটি এবারে চলেছে কেশবের আগে আগে। সদানন্দ চলেছে কেশবের পাশাপাশি। নিচু গলায় আলাপ করে কামিনীকে নিয়ে। সব খবর জোগাড় ক'রে ফেলেছে সদানন্দ। মেয়েটির বয়স সতের আঠারো নয়—বছর পঁচিশ, বিধবা, এক ছেলের মা। ছেলেটি গত বছর সাপকাটায় মারা গেছে লাটে। আই প্লটের দলপতি মনোহর দাস জোগাড় ক'রেছে কোত্থেকে। বেশ মেয়েটি।—আঁটসাট।

কেশব কিছু বলে না। ক্ষুব্ধ সদানন্দ কেশবের পাশ ছেড়ে হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে গিয়ে পড়ে আবার কার ঘাড়ের ওপরে।

কে লোক গো। একটি মেয়ে হাউমাউ ক'রে ওঠে।

আহা-হা বুড়া মানুষ।

ঠাউর নাই ভাই—ঠাউর নাই। সদানন্দের আবার কাতরোক্তি শোনা যায়।

হাজরা আর রাগ চেপে রাখতে পারে না। ব'লে উঠলো, তোকে নিয়ে মহা মুস্কিলে সদা।

খেয়া ছাড়লো ভোরে।

সদা—সদা গেল কোথায়? মন্দিরতলায় নৌকোয় খোঁজ করে নব হাজরা।

সদানন্দ নেই। সে বসেছে শেষ পর্যন্ত আই প্লটের নৌকোয়—রাত্রির সেই রুখে দাঁড়ানো বিধবা মেয়েটির পাশ ঘেঁষে। নির্বিকার সদানন্দ। ডাকলেও সাড়া দেয় না।

অশ্লীলভাবে নব হাজরা গালাগালি করে। মন্দিরতলায় যাবে ব'লে এতখানি পথ এসে শেষকালে উঠে বসলো আই প্লটের নৌকোয়। নব হাজরার বুড়ো টোলখাওয়া মুখখানা কয়েক মুহূর্তের জন্য বীভৎসতম হ'য়ে ওঠে আক্রোশে।

মানকুমারীর হাসি পায় সে মুখের দিকে চেয়ে—কোন বিতৃষ্ণা আসে না আজ আর। কেন যেন আজ তার সব কিছু ভাল লাগছে। হঠাৎ পথ-চেনা একটি মেয়ের পাশ ঘেঁষে বসা মিথ্যাবাদী সদানন্দ, স্বামীর বুড়ো বীভৎস মুখখানা, বিরাট কাঠামো কেশব লোকটা—যে না-কি জোয়ান জোয়ান বলদগুলোকে হিম-সিম খাইয়ে দেয়, মাথায় বোঝা নেওয়ার জুড়ি যার নেই, ধান কাটার সময় হাত চলে যার যন্ত্রের মতো—সেই লোকটার বোকা বোকা ভীরু চাহনি, সব ভালো লাগে মানকুমারীর। কেশবের কচি ছেলেটা তখনও ঘুমুচ্ছে তার কোলে, কোমর জড়িয়ে ধরেছে সরু দুটো হাতে।—ভালো লাগছে আজ সব। কেশব হাঁ ক'রে চেয়ে আছে তীরের দিকে। কী দেখছে কি জানি। হাসি পায় মানকুমারীর।

কেশবের ভালো লাগে না সে হাসি। ভোরের আলোয় হাতে এক গাদা মাদুলি বাঁধা আঁটসাট এই বাইশ বছরের মেয়েটিকে এতটুকু আর ভালো লাগে না কেশবের। হঠাৎ যেন তার চোখ জ্বালা ক'রে জল আসে। ওপারে ফিরবে না সে আর কোনো দিন—কোনো দিনই না। একটা গ্রাম, একটা মরে যাওয়া মেয়ে অনেক দূরে রয়ে গেল এ জীবনে। মনে পড়ে সদানন্দের হুঁশিয়ারী। কিন্তু এতগুলি লোক—এতগুলি লোক কি তবে ভেসে যাবে?

নোঙর উঠলো। শেষ পর্যন্ত নৌকো তিনটি ভাসলো।